

নিবেদিত

নরসুন্দর মানুষ



নির্মিত

আমার না বলা কিছু কথা

আকাশ মালিক

আমার না বলা কিছু কথা

আকাশ মালিক

একটি ইস্টিশন ইবুক
www.istishon.com

আমার না বলা কিছু কথা

আকাশ মালিক

প্রথম প্রকাশ: অক্টোবর ২০১৬

ইস্টিশন ইবুক



প্রকাশক

ইস্টিশন

ঢাকা,

বাংলাদেশ।

প্রচ্ছদ

কবি

ইবুক তৈরি

নরসুন্দর মানুষ

মূল্য: ইবুকটি বিনামূল্যে বন্টন করা যাবে।

Amar Na Bola Kisu Kotha, by Akash Malik

First Edition: October 2016

Published by: Istishon eBook

Dhaka, Bangladesh.

eBook by: NoroSundor Manush

উৎসর্গ

যাকে কোনোদিন দেখিনি, আর কোনোদিন
দেখা হবেওনা, আমার না দেখা সব চেয়ে
প্রিয় সেই মানুষটিকে।

সূচিপত্র

{সূচিপত্র ইন্টারঅ্যাকটিভ লিংক যুক্ত; **পর্ব নম্বর** লেখায় মাউস পয়েন্টার দিয়ে সরাসরি পর্ব-পৃষ্ঠায় চলে যাওয়া যাবে, সেই সাথে **পর্ব-পৃষ্ঠার টাইটেলে** মাউস পয়েন্টার দিয়ে সরাসরি সূচিপত্রে আসা যাবে}

লেখকের কথা

জন্মের পর একটি মানব শিশু প্রথমে তার আশে পাশের পরিবেশ থেকে জ্ঞান লাভ করে। ক্রমে সে বড় হতে থাকে সে বাহিরের পানে তাকায়, জগত ও জীবন নিয়ে তার ধারণা ক্রমেই বাড়তে থাকে আর জ্ঞানের থলেতে সঞ্চিত হতে থাকে অভিজ্ঞতা আর আপন চিন্তা ভাবনা। অপরের সাথে তার এই ভাবনা বা ভাবের লেন দেন শুরু হয় সেই শিশুকাল থেকেই। যা কিছু নতুন দেখে, শুনে, জানে তা সে অন্যের সাথে ভাগাভাগি করতে চায়, তার অংশিদার অন্যকেও বানাতে চায় । এই অপরের সাথে ভাবনা চিন্তা আদান প্রদানের বা অব্যক্ত কথা ব্যক্ত করার আকুতি বা সাধ সকল মানুষের মাঝেই থাকে। কবি তাই বলেছিলেন –

“ওলো সই, ওলো সই,
আমার ইচ্ছা করে তোদের মতন মনের কথা কই।
তোদের আছে মনের কথা, আমার আছে কই।
আমি কী বলিব, কার কথা, কোন্ সুখ, কোন্ ব্যথা--
নাই কথা, তবু সাধ কত কথা কই”।

জগত সংসারকে পর্যবেক্ষণ ও অব্যক্ত কথা ব্যক্ত করার শক্তি সামর্থ সকলের সমান হয়না। তাই ঘটনা পর্যবেক্ষণে, বিচার বিশ্লেষণে ভিন্নতা থাকে। এখান থেকে আমরা মানুষকে জগতকে আরো নিবিড়ভাবে চিনতে জানতে শিখি। মানুষ যদি একে অপরের সাথে মত বিনিময়, ভাবের আদান প্রদান করতে না পারতো পৃথিবী স্থবির এক জায়গায় ঠাঁই দাঁড়িয়ে থাকতো। আদিকাল থকে অন্যান্য জীবেরা ঠিক একই অবস্থানে রয়েছে কিন্তু মানুষ পৃথিবীটাকেই বদলে দিয়েছে।

অনেকেরই প্রতিকুল পরিবেশ ও পরিস্থিতির কারণে সাধ থাকলেও সাধ্য হয়না নিজের মতামত ব্যক্ত করার, আবার অনেকেই ভাব প্রকাশের কৌশল বা পদ্ধতি না জানার কারণে অন্তরের সুখ দুঃখের কথা, মনের চিন্তা ভাবনা প্রকাশ করতে পারেন না। মানবজীবনের অনেক খবর তাই অজানাই রয়ে যায়। আজ বিজ্ঞান মানুষকে তার ভাব প্রকাশের অনুকুল বিকল্প এক পরিবেশ সৃষ্টি করে দিয়েছে। ইন্টারনেট অসাধ্য দূর্লভ্য তথ্য-উপাত্ত্ব নিয়ে হাজির হলো, যুগ যুগান্তরের চাপা দেয়া সত্য প্রকাশ করে দিল। আর এই সুযোগটা নিয়ে একদল তরুণ সমাজ এগিয়ে আসলেন আলোকিত পৃথিবী গড়ার লক্ষ্যে জগত ও জীবন নিয়ে তাদের চিন্তা ধারণা প্রকাশের মাধ্যমে। এমনি জীবন চলার পথে পথে আমার পারিপার্শিক পরিবেশ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণলব্ধ অভিজ্ঞতা, আমার একান্ত চিন্তা ভাবনা প্রকাশের অভিপ্রায় থেকে কিছু লেখা মুক্তমনা ব্লগে লিখেছিলাম। মুক্তমনা ব্লগের এবং পাঠকদের সমর্থন সহযোগীতা না পেলে এ লেখাগুলো লেখা সম্ভব হতোনা। আর সেই লেখাগুলো দিয়ে এই ই-বুকটি সাজাতে ও প্রকাশে যারা সাহায্য সহযোগীতা করেছেন আপনাদের সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আপনাদের এ ঋণ কোনোদিন শোধ হবার নয়।

আকাশ মালিক

ইংল্যান্ড ২০১৬।

আমার না বলা কিছু কথা।

যে কথা বলবো বলে আজ লিখতে বসেছি তা কোনো ঘটনাই নয়। তাই কোথায়, কীভাবে, কোথা হতে, কখন এর শুরু, সঠিকভাবে বলা যাবেনা। স্মৃতির পাতা তন্নতন্ন করেও খুঁজে পাইনা আমি অবিশ্বাসী হলাম কোন্ দিন থেকে? কোনো খনিজ দ্রব্যের সজ্ঘর্ষের ফলে বিস্ফোরণ, বা বিগ ব্যাং এর মত ঘটনা হলে সময় কাল নির্ধারণ করা যেতো। বেঙ, মাছি বা প্রজাপতিরা কি বুঝতে পারে তারা আগে কী ছিল, ঠিক কোন্ শুভক্ষণে তাদের রূপান্তর ঘটে? ব্যাপারটা বোধ হয় এ রকম কিছু। এ প্রশ্নটি অনেকেই আমাকে করেছেন যে, আমি অবিশ্বাসী হলাম কীভাবে কোন্ দিন থেকে? ‘কোন্ দিন থেকে’ এ প্রশ্নের যেহেতু সঠিক উত্তর জানা নেই, তাই ‘কীভাবে অবিশ্বাসী হলাম’ তা'ই বলা ভাল। স্মৃতির পাতার অনেক কিছুই আজ অস্পষ্ট, আর কিছু বিলীন হয়ে গেছে চিরতরে। জীবনে চলার পথে বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকা যা কিছু আজও স্পষ্ট দেখতে পাই তা থেকে কুড়িয়ে কুড়িয়ে এনে আজ কিছু ঘটনা বর্ণনা করবো।

একটি রক্ষণশীল ধার্মিক পরিবারে আমার জন্ম। ঠিক কতো বয়সে বাবা আমাকে মাদ্রাসায় ভর্তি করেছিলেন আজ আর মনে নেই। ছোটবেলা থেকেই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতাম মহা-পরাক্রম, প্রতাপশালী বিরাট শক্তিশালী আল্লাহ একজন সাত আসমানের ওপরে বসে আছেন, তিনি আকাশে পাতালে যা কিছু দৃশ্য অদৃশ্য সবকিছুর স্রস্টা, রক্ষক ও নিয়ন্ত্রক। বিশ্বাস করতাম সত্য, কিন্তু তাকে অন্যান্য মানুষের মতো বা যেভাবে মানা উচিৎ সেভাবে কোনোদিনই মেনেছি বলে মনে পড়েনা। ছোটবেলায় আল্লাহকে যত গালি দিয়েছি (অবশ্যই মনে মনে) সারা জীবনেও মানুষকে এতো গালি দেইনি। অকথ্য অশ্লীল ভাষায়ও গালি দিয়েছি, এমন কি একদিন পূর্ণিমার চাঁদনী রাতে, ভরা গাঙ্গের জলে নৌকা ভাসিয়ে দিয়ে গলুইয়ের উপর চিৎ হয়ে শুয়ে আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে প্রস্রাব

করেছি এই আশায় যে, আল্লাহ যদি কোনো প্রতিক্রিয়া দেখায়। আল্লাহ কিছুই করেনা। তখন ভাবতাম আল্লাহ তো বিরাট বড় মহান, এই সীমাহীন আকাশ, বিশাল পৃথিবীর দায়িত্ব তার হাতে, তাই আমার মত পিচ্চি বালকের দুষ্টুমিতে তার সাড়া দেয়া ইজ্জতে ধরে, অথবা তিনি আমাকে সুযোগ দেন বা পরীক্ষা করেন। আল্লাহকে এমনিতে বকাবকি করতাম না, এর পেছনে কারণও ছিল। কোনো খেলায় বা প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বিকে হারাতে না পারার ক্ষোভে, অথবা আমি যা চাই তা না পেলে আল্লাহকে অভিশাপ দিতাম- তুমি বেটা অন্ধ, বোবা, কিছু করতে পারোনা তো মরো না কেন? শবে বরাতের রাতে সারা রাত গাছের দিকে তাকিয়ে কাটিয়েছি, কোনো গাছ-বৃক্ষ আল্লাহকে সেজদা করতে দেখলাম না। বড়দেরকে কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা বলেন, ‘গাছের সেজদা বড়বড় আউলিয়াগণ ছাড়া কেউ দেখতে পায়না’।

যখন দিন তারিখ ঠিক করা হলো আমার মুসলমানী (Circumcision) হবে, মানত করলাম একটা রোজা রাখবো, রেখেছিও। শাহ পরাণের মাজারে গিয়ে মোমবাতি, আগরবাতি দিলাম, শিন্নী দিলাম, দোয়াও করলাম- ‘আল্লাহ, যে আজম বেটা আমার মুসলমানী করবে তাকে ফেরাও, একটা রোগ দাও, না হয় তাকে মেরে ফেলো, সে যেন আমাদের বাড়িতে আসতে না পারে’। আল্লাহ আমার কথা শুনলেন না, তাই আমি তাকে গালি দিয়েছি।

গ্রামে রাস্তায় চলার পথে প্রশস্ত পরিষ্কার রাস্তা ছেড়ে, বন-বাদাড় জংগলের বাঁকা সংকীর্ণ দুর্গম পথে চলা, আর নিষিদ্ধ এলাকায় প্রবেশ করা আমার একটা নেশা ছিল। কেন ছিল জানিনা। তবে ভাবতাম, নিত্যদিনের পরিচিত সোজা পথে সবাই তো হাটে, অন্য পথে গেলে নতুন কিছু দেখা বা পাওয়া যেতেও পারে। হিজল গাছের মরা শাখার গর্তে দোয়েলের বাচ্চা, বা কালাকচুর পাতায় টুনটুনির বাসা পেলে মন্দ কী? আমাকে বলা হতো, মাদ্রাসায় যাওয়া আসার পথে কালণী বুড়ির জঙ্গল দিয়ে কোনোদিন যাবেনা কারণ ঐ জঙ্গলের বিশাল উঁচু চৈতা গাছের মাথায় নারায়ণ সিং দানবের বাসা। শুনতে অবশ্যই

ভয় লাগে, কিন্তু সত্য কথা বলতে কি ঐ চৈতা গাছের নিকটে আসলেই আমার কেন জানি প্রস্রাবের বেগটা বেড়ে যেতো। আবুল (আমার সহপাটি) বলতো, দেখবে একদিন তোর ওটা পঁচে গলে নিঃশেষ হয়ে যাবে আর খুঁজেও পাবিনা। আমি বলতাম তা হউক, তুই শুধু হুজুরকে বলবিনা আমি পেশাব করে পানি লই নাই। জীবনে ভাল মতে একদিনও অজু করে নামাজ পড়ি নাই। আর রোজা? ঐ একদিনই রেখেছিলাম। তারপর তওবা করেছি আর না। তবে রোজা রেখে বিড়ি যদি খাওয়া যেতো তাহলে হয়তো আরো দু একটা রাখতাম। মাদ্রাসায় মাঝে মাঝে নামাজের আজান দিতাম, নামাজ পড়তাম না। আবুলকে একটা বিড়ি ঘুষ দিয়ে বলতাম- তুই আকামত দিবি, আমি মাদ্রাসার পেছনে তেঁতুল গাছের গুড়িতে বসে মনের সুখে বিড়ি টানব। আমার এই বিশ্বস্ত সহপাটি বন্ধু আবুল একদিন আমাকে ভীষণ দুঃখ দিয়ে দিল। আমরা তখন মক্তব পাঞ্জমে (পঞ্চম শ্রেণী) পড়ি। বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ছাত্রদেরকে দুই মাস মাদ্রাসায় রেখে পড়ানো হতো। একদম গরুর খোয়াড়ে বন্দী অবস্থা। একদিন ‘তারিখুল ইসলাম’ (ইসলামী ইতিহাস) এর হুজুর বললেন- ‘তিন মাইল দূরে এক গ্রামে বিরাট ওয়াজ মাহফিল আছে আমাদেরকে রাতে সেখানে যেতে হবে’। হুজুর আরো বললেন যে, দেশের সেরা আলেমগণ সেখানে আসবেন। তম্মধ্যে একজন আউলিয়া আসছেন, যাকে একই সাথে দুই জায়গায় অবস্থান করতে লোকে দেখেছে। আবুল বললো সেও কার কাছ থেকে শুনেছে ঐ মৌলানাকে কেউ নাকি একই দিনের একই সময়ে ঢাকায় এবং সিলেটে ওয়াজ করতে দেখেছে। আমি মনে মনে আল্লাহর কাছে একটা লম্বা দোয়া করলাম- ‘হে মাবুদ, আমি যদি ছহি-সালামতে ঐ আউলিয়ার জুতা মুবারক চুরি করতে পারি, কসম তোমার, আমি বিড়ি খাওয়া ছেড়ে দেবো’। আল্লাহ আমার দোয়া কবুল করলেন, কিন্তু আমি বিড়ি ছাড়ি নাই। ওয়াজ মাহফিলের শেষে ফজরের নামাজের আগে জিকির শুরু হলো। সবাই হেলেদুলে চোখ বুঁজে জিকিরে মত্ত। আমার কাজটা সেরে নিতে কোনোই অসুবিধা হলোনা। ঐ দিনই জোহরের নামাজের পরে হুজুর আমাকে ডেকে তার রুমে নিলেন। তার চেহারার দিকে তাকিয়ে আমি ভয় পেয়ে গেলাম। রক্তবর্ণ

গাল, ঠোঁট কাঁপছে, হাতে একটি এবং পাশে আরো চারটি মুড়ালী বাঁশের কাঁচা পাকা বেত। হুজুর জিজ্ঞেস করলেন- 'জুতা কই'? আমি বললাম, 'আসার পথে কাছিম বাড়ির ডরে (গভীর জলের কুয়ো) ফেলে দিয়েছি'। হুজুর জানেন এই ডরের নিচে শুধু বিশালাকারের কাছিমই (কচ্ছপ) নয় আরো ভয়ংকর জন্তুরাও বাস করে। এই ডরে পা রাখার সাহস সাত গ্রামে কারো নেই। সুতরাং জুতা উদ্ধার করা আর সম্ভব নয়। হুজুর আমার গায়ে বেত্রাঘাত করার আগেই আমি ডান হাত বাড়িয়ে দিলাম। তিনি দরজা বন্ধ করে দিলেন। যতটুকু শক্তি তার গায়ে ছিল সব উজাড় করে বেত্রাঘাত শুরু করলেন। আমি চোখ বন্ধ করে নিলাম। প্রথম চার পাঁচটা বাড়ির পরপর আমি হাতের মুষ্টি শক্ত করে বন্ধ করে আবার খুলে দিয়েছিলাম। এই ট্রিকসটাও শিখেছিলাম আবুলের কাছ থেকে। সে প্রায়ই পড়ার জন্যে পিটুনি খেতো। বলতো, হাতের মুষ্টি শক্ত করে বন্ধ রাখলে হাতে রক্ত চলাচল কম হয়, আঘাত বেশি টের পাওয়া যায়না। একটি বেত আগা থেকে ভেংগে ভেংগে যখন গোড়ায় আসলো হুজুর তখন ক্লান্ত আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছেন না, আমারও মুষ্টি বন্ধ করার শক্তি আর হাতে নেই। তিনি চারটি বেত একসাথে নিয়ে কয়েকটি আঘাত করলেন, আমি আর কিছুই টের পেলাম না। হুজুর বসে পড়লেন, হাত দিয়ে ইশারা করলেন বেড়িয়ে যেতে। এখান থেকে আবুলের সাথে আমার বন্ধুত্বের সমাপ্তি আর হুজুরের শাস্তির প্রতিশোধ নেয়ার শুরু।

দুই মাস মাদ্রাসায় থেকে পড়ার সময় প্রায় শেষ। বৃত্তি পরীক্ষায় যাওয়ার দু দিন আগের কথা। মাটির বেড়া টিনের ছাউনীর মাদ্রাসার দক্ষিণ বেড়া ঘিরে দুটো পেঁপে গাছ ছিল। একটা পাঁকা পেঁপে হুজুরের দৃস্টিতে পড়লো। তিনি একজন ছাত্রকে হুকুম করলেন ফলটি নিয়ে আসতে। এবার আর আল্লাহর কাছে দোয়া করলাম না। আগের বার আল্লাহ দোয়া কবুল করেছিলেন সত্য, কিন্তু পরে আমাকে শাস্তি ভোগ করতে হয়েছে। ফলটি তৈরি করতে করতে আজানের সময় হয়ে গেলো। টিনের বরতনে (প্লেইট) কাটা পেঁপে রেখে হুজুর নামাজে চলে গেলেন। নামাজ শেষে তার রুমে ফিরে আসলেন। আমি

পাশেই টিউব-ওয়েলের (নলকূপ) নিচে বসে টুপি ধোয়ার ভান করছিলাম। বিসমিল্লাহ বলে হুজুর এক টুকরো পেঁপে মুখে দিলেন। পরক্ষণেই থুথু করে বের করে ফেলে দিলেন। একজন ছাত্রকে ডেকে এনে বললেন- 'দেখতো ফলটা কি পঁচা নাকি, কি যেন একটা গন্ধ লাগে, পাঁকা পেঁপে নুনটা হয় কী করে'? আমি মনে মনে বললাম, খাও বাবাজী খাও, মনের সুখে পেট ভরে খাও, আমার হাতের দাগ এখনও শুকায়নি, তুমি খাও। হুজুরের বেত্রাঘাতে সেদিন মোটেই চোখে জল আসেনি, আমি কেঁদেছি তার বিদায়ের দিনে। আমার অজান্তে মাদ্রাসার ভেতরে গত দুই মাসে একটা ঘটনা ঘটে গেছে যার কিছুই আমি ভালভাবে বুঝতাম না। ছাফেলা আউয়ালে (ষষ্ঠ শ্রেনী) উঠে শুনলাম ঐ হুজুরকে সমকামিতার অভিযোগে মাদ্রাসা থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। বিদায়ের দিন হুজুর গোপনে আমাকে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন- 'তুই আমাকে বদ-দোয়া (অভিশাপ) দিয়েছিলে'? আমার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেলো। কী উত্তর দেবো ভেবে পাইনা। হুজুরের চোখের উপর চোখ ফেলে অপলক নির্বাক নিরুত্তর ঠাই দাঁড়িয়ে আছি। ঐ দিনের কথা মনে পড়লো। হঠাৎ আমার ডান হাতের পাঁচটা আঙ্গুল মুষ্টিবদ্ধ হয়ে গেল আর ঠিক তখনই অঝোরে দু চোখ বেয়ে নেমে আসলো অশ্রুধারা। বুকটা বারবার ফুপিয়ে ফুপিয়ে উঠছিল। দেয়ালে হেলান দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে কাঁপা ভগ্নকণ্ঠে অস্পষ্ট স্বরে বলেছিলাম- 'হুজুর সেদিন আপনি আমাকে এভাবে না মারলেও পারতেন'।

এ ছিল আমার দশ থেকে বারো বৎসর বয়সের কাহিনি। পরের বৎসর আমার মা মারা যান। আমার জগৎটা যেন উলট পালট হয়ে গেল। পাড়ার ছেলেদের সাথে লুকিয়ে লুকিয়ে মারবেল খেলতে, ফুটবল খেলতে গিয়ে মাঝে মাঝে ধরা পড়ে হুজুরদের হাতে কতো মার খেয়েছি। এখন আর সেদিকে মন যায়না। সেই চঞ্চলতা, দুরন্তপনা ভাব আর নেই। নিজের অজান্তেই শান্ত হয়ে গেলাম। ওদিকে ছাফেলা আউয়াল থেকে ফার্সি ও ছাফেলা দুওম (সপ্তম শ্রেণী) থেকে আরবি গ্রামার শুরু হয়। হুজুররা বলতেন এই

দুই বিশেষ জামাতের ছাত্রদের কুত্তার মগজ হওয়া চাই। আসলেই আমাদের পড়ার অবস্থা দেখলে কুকুরও অবাক হতো যে, এই ছাত্রগুলো রাতদিন এত বকবক করে কীভাবে? এ ভাবে আরো চার বছর অতিবাহিত হলো। ৯টি বছর মাদ্রাসার শিক্ষা জীবনে যা পড়লাম, তা শুধুই মৃত্যুর পরে কবরের জীবন নিয়ে। কোরান হাদিস চষে এতোদিনে যা জেনেছি তা এক আরব্য উপন্যাস ছাড়া আর কিছু নয়। তবে ওমর খৈয়্যাম, শেখ সা'দী ও জালালুদ্দীন রুমীর মতো বেশ কয়েকজন বিখ্যাত পার্সিয়ান কবি, সাহিত্যিক দার্শনিক এর লেখা পড়ার সুযোগ পেয়েছিলাম। এ মহাবিশ্ব, এ সুন্দর পৃথিবী নিয়ে মাদ্রাসার কোনো ভাবনা চিন্তা নেই।

ছোটবেলায় বিশেষ কয়েকটি জিনিস নিয়ে আমি খুবই ভাবতাম। যেমন,জোয়ার ভাটা, সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ, চাঁদের বুড়ীর সুতা কাটা, ভুমিকম্প, রংধনু, যাদু-টোনা, জীন-ভুত, ভুতের আগুন, সাপের মন্ত্র আর তাবিজ। এ ছাড়াও মানুষের দাঁত থেকে বাইদানীরা কীভাবে পোকা বের করে, সিলেটের হাসান মার্কেটের চৌরাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে গোড়া কৃমির ঔষধ বিক্রেতা, বালকের গলা কেটে কেমনে জোড়া লাগায়, টিয়া পাখি কীভাবে ভবিষ্যত বলে দেয় ইত্যাদি জানার তীব্র আগ্রহ আমার সব সময়ই ছিল। মাদ্রাসা থেকে হাইস্কুলে ভর্তি হওয়ার মধ্যবর্তী এক বৎসর অবসর সময়টা এ সমস্ত বিষয়ের সমাধানে, আর স্কুলের ছাত্রদের সাথে আড্ডা দিয়ে কাটিয়েছি। প্রতি বৎসর আষাঢ় জৈষ্ঠ মাসে ঝাঁকে ঝাঁকে বাইদানীরা আমাদের গ্রামে আসতো। সাপ ধরার মন্ত্র শেখার জন্যে এক বাইদানীকে খালা ডাকা শুরু করলাম। মাঝে মাঝে বাড়িবাড়ি গিয়ে তার কাষ্টমার যোগাড় করে দিতাম। প্রথমে অসম্মতি জানালেও নাছোড় ভগ্নীপো'কে শেষ পর্যন্ত খালা বাধ্য হলেন মন্ত্র শেখাতে। এখান থেকে দাঁতের পোকা বের করার পীরাকি, আর ওঝা কীভাবে সাপের বিষ নামায় তাও শিখলাম। যেহেতু বাইদানী খালা কসম কীড়া দিয়েছিলেন কাউকে না বলতে তাই আজ তা আর বলতে পারলাম না। যাদু-টোনা, জীন-ভুত আর তাবিজ কবজের অলৌকিক বিদ্যা মাদ্রাসায় থাকতেই জেনে নিয়েছিলাম। তাবিজের

ভেতরে আল্লাহর নাম লিখে দিলে রোগী যে ফল পায়, শয়তানের নাম লিখলেও একই ফল পায়। আরবিতে লিখলেও যা হয় বাংলায় লিখলেও তা হয়। ভুতগ্রস্থ যুবতীর মাথা থেকে ভুত তাড়িয়েছি, লোহার জিঞ্জিরে বাঁধা যুবকের জীনও বোতলে ভরে গাঙ্গের জলে ভাসিয়ে দিয়েছি, কোনো প্রকারের কোরান, পুরাণের একটি বাক্য-আয়াত বা কামরূপ-কামাইখ্যার তন্ত্র মন্ত্রও উচ্চারণ করিনি। মন্ত্রের নামে আরবি, উর্দু, ফার্সি, সংস্কৃত ও বাংলা মিশায়ে যে পঞ্চরূপী ভাষা উচ্চারণ করতাম, তা ছাগলের ভাষার চেয়েও দূর্বোধ্য। এই অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হতে হলে, বিশ্বস্ত একজন সাথী আর বুদ্ধিমান একজন গুপ্তচরই যথেষ্ট।

একদিনের ঘটনা- প্রায় একসপ্তাহ রিহার্সেল দিয়ে অমাবশ্যার এক মেঘলা দুপুর রাতে একজন মহিলাকে আমার বুজুর্গী দেখালাম। মহিলা মুগ্ধ হয়ে শ্রদ্ধা ও ভক্তির নিদর্শন স্বরূপ আমাকে তার গলার স্বর্ণালংকার খুলে দিতে চাইলেন। আমি বিকট গুংগানীর মত শব্দ করে, লম্বা চুলের মাথায় একটা ঝাকুনি তুলে বিরক্তি প্রকাশ করলাম। আমার গুনধর শিষ্য গুংগানী আওয়াজ ও বিরক্তির বাংলা তরজমা করে দিল। বললো, ‘এই দরবেশ খাসিয়া- জৈন্তা পাহাড়ের ফলমূল আহার করে জীবন কাটান, মাছ মাংস ভক্ষন করেন না। তিনি বাংলা জানেন না, কোনো প্রকার দান খয়রাত, উপহার গ্রহণ করেন না। তিনি দুনিয়ায় শুধু দিতে এসেছেন, নিতে আসেন নি’। মহিলা আমার পা ছুঁয়ে সালাম করতে চাইলেন, আমি পা সরিয়ে নিলাম। তিনি আমার নাভী তক লম্বা শুভ্র দাড়ি আর পিঠ পর্যন্ত দীর্ঘ চুল দেখে কল্পনাই করতে পারেন নি, বিগত কয়দিন আমি আর আমার গুপ্তচর তার কতো কাছে ছিলাম। এই আইডিয়াটা মাথায় ঢুকেছিল, দুই সপ্তাহ পূর্বে ঢাকার জোনাকী সিনেমা হলে শাবানা অভিনীত ‘দস্যু রাণী’ ছবি দেখার পর।

মাদ্রাসায় থাকতে ছুটি পেলে, কিংবা একটু ফুরসত পেলেই প্রতিবেশী পাঠশালা ও হাইস্কুলের ছাত্রদের পড়ার ঘরে যেতাম। মাঝে মাঝে তাদের প্রাইভেট টিউশন-

মাস্টারের পাশে চুপ করে বসে তাদের পড়া শুনতাম। কিছুটা তাদের কাছ থেকে শুনে আর কিছুটা তাদের বই থেকে পড়ে জোয়ার ভাটা, সূর্য গ্রহণ, চন্দ্র গ্রহণ, চাঁদের বুড়ীর সুতা কাটা, ভুমিকম্প, রংধনু, ভুতের আগুন এসব ব্যাপারে মোটামুটি একটা ধারনা পেয়ে যাই, যার কোন কিছুই মাদ্রাসায় পড়ানো হয়না। সব চেয়ে বেশি আশ্চর্য হয়েছি পৃথিবী গোল জেনে। হাইস্কুলে নবম শ্রেণীতে বিজ্ঞানের স্যার গ্লোবের উপর টর্চলাইট ফেলে দেখালেন কীভাবে রাত-দিন হয়, কীভাবে সূর্য গ্রহণ, চন্দ্র গ্রহণ, শীত ও গ্রীষ্ম মৌসুম হয়। পাড়া গাঁয়ের হাইস্কুল, সায়েন্স ল্যাবরেটরিতে উন্নতমানের যন্ত্রপাতি ছিলনা। তবুও দশম শ্রেণীতে কেমিষ্ট্রি ও ফিজিক্সের স্যারের সাহায্যে অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, হিলিয়াম, কার্বন ডাইওক্সাইড, কার্বন মনক্সাডাইড ইত্যাদির উপর বাস্তব পরীক্ষার মাধ্যমে পরিচয় হয়েছিল। একদিন স্যার, শুধুমাত্র আগুন ঝরা প্রখর রৌদ্রের ফাল্গুন চৈত্র মাসের সন্ধাবেলা কেন বিলের ধারে ভুতের আগুন দেখা যায়, তাও পরীক্ষা করে দেখালেন। এই বিজ্ঞানের স্যারই একদিন ল্যাবরেটরিতে বসে আলাপকালে বিজ্ঞানীদের নতুন আবিষ্কৃত কোনো একটি উপগ্রহের কথা জানাতে গিয়ে বললেন, ‘এ পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা আল্লাহর সৃষ্টির যা কিছু আবিষ্কার করতে পেরেছেন তা কোরানের মাত্র এক পৃষ্ঠা’। তখনো আমি এ নিয়ে কোনো প্রকারের প্রশ্ন করার বা সন্দেহের কারণ বোধ করিনি। আমার মনেই পড়েনি আমিও যে মাদ্রাসায় পড়েছি বা কোরানের অর্থ বুঝি। স্কুলে এসে এতোসব বিস্ময়কর নতুন নতুন বস্তুর সাথে পরিচয় হলো, অনেক অজানা সত্য জানা হলো, কিন্তু কোনোদিন প্রশ্ন করিনি, মাদ্রাসায় এ সমস্ত কেন পড়ানো হয়না? আসলে স্কুলে এসে আমি জীবনের অন্য একটা রূপ দেখতে পাই। মাদ্রাসার জীবনটাকে ভুলে যাওয়াতেই ছিল যেন আমার সুখ, আমার আনন্দ। খুবই সুখী, বর্ণালী, ও সুন্দরতম দিনগুলো ছিল হাই স্কুলের ঐ ক'টি বছর।

ইংল্যান্ড আসার পর, বছর খানেকের মধ্যে ম্যারিয়া নামের এক সমবয়সী ইংরেজ যুবতীর সাথে ঘনিষ্ট সম্পর্ক গড়ে উঠে। নতুন পরিবেশে, নতুন এক ভিন্নধর্মী জীবনে

প্রবেশ করে আমার মনেই হয়নি যে আমি এমন একটি দেশে এসেছি,যে দেশে জন্ম গ্রহন করেছিলেন, William Shakespeare, আর Isaac Newton এর মত মনীষীগণ। Shakespeare আর Newton সম্মন্ধে স্কুলে পড়েছি, এখানে এসে আরো নতুন তিনজন বিজ্ঞানীর নাম শুনলাম, Charles Robert Darwin, Thomas Henry Huxley ও Edmond Halley। আমরা যে এলাকায় থাকতাম, সেখানে, দু একটা বাঙ্গালী পরিবার ছিল তাদের কাউকে কোনোদিন ধর্ম-কর্ম করতে দেখিনি। রোজা ঈদের চাঁদ কবে আসে কবে যায় কেউ খোঁজ নিতোনা। বান্ধবী ম্যারিয়া Patrick Moore এর The Sky at Night আর David Attenborough এর উপস্থাপনায় Life on Earth দুটো টিভি সিরিজ দেখার উৎসাহ দেখে বুঝতে পারলেন যে, বিজ্ঞানে আমার আগ্রহ আছে। নিজের পকেট থেকে পয়সা খরছ করে, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞানের উপর এক গাদা বই নিয়ে আসলেন। বইগুলো পড়তে পারলাম কিন্তু এর অনেক কিছুই বুঝতে পারলাম না, যদিও ম্যারিয়া মাঝে মাঝে নিজেও ইংরেজি থেকে ইংরেজি তরজমা করে আমাকে বুঝাতে চেষ্টার ত্রুটি করেন নি। একদিন সন্ধায় আমরা বসে টিভিতে Wild Life প্রোগ্রাম দেখছিলাম। একটি হরিণী বাচ্চা প্রসব করবে। নিকটেই ঝোপের আড়ালে বসে কয়েকটি Hyena তা দেখছে। বাচ্চাটি মাটিতে পড়ার সাথে সাথে Hyena রা তার মায়ের চোখের সামনে থেকে বাচ্চাটিকে কেড়ে নিল। মা ফ্যালফ্যাল করে শুধু তাকিয়ে দেখলো, একবার বাচ্চাটিকে ছুঁয়েও দেখতে পারলোনা। আমি ম্যারিয়াকে বলি, 'এটা অসম্ভব, এ হতেই পারেনা'। ম্যারিয়া অবাক হন। জিজ্ঞেস করেন, ব্যাপার কী'? আমি বিরক্ত চোখে বললাম, 'ছবির ক্যামেরা ম্যান, প্রডিউসার, ডাইরেক্টর এরা এতো নিষ্ঠুর কেন, বাচ্চাটিকে তারা ইচ্ছে করলে বাঁচাতে পারতো'। ম্যারিয়া শান্তস্বরে বলেন, 'পরের সিনটায় দেখোনা কী হয়'। ওদিকে Hyena র ক্ষুধার্ত ছোট্ট বাচ্চারা মায়ের পথের পানে চেয়ে আছে। গর্তের বাইরে উঁকিবাকি দিচ্ছে কিন্তু সম্পূর্ণ বেরিয়ে আসছেনা, যদি অন্য কোনো জীব তাদেরকে আক্রমন করে বসে। আমার কাছে ব্যাপারটা অদ্ভুত লাগে। এমন দৃশ্য আমি আগে কোনোদিন দেখিনি। কী অবাক কান্ড, এসব হচ্ছেটা কী?

প্রত্যেকটা জীব অপর একটি জীবের উপর নির্ভরশীল। একজনের বিলুপ্তিতেই আরেকজনের উৎপত্তি! একজনের মৃত্যুই আরেকজনের বাঁচার উপায়। আমার মাঝে এক অস্থিরতা দেখা দেয়, আমি হতবাক। ম্যারিয়াকে বললাম, 'বাঘেরা নিষ্ঠুরভাবে হরিণ শাবক মেরে খাচ্ছে, নতুন জলে আনন্দে উল্লসিত নির্দোষ Salmon Fish ভল্লুকেরা ধরে ধরে খাচ্ছে, আর আমরা মানুষ'? ম্যারিয়া বলেন, 'আমরাও তাই,আজকের ডিনারে তো Salmon Fish তুমিও খাবে'। আমার অস্বস্তি দেখে ম্যারিয়া তার নারীসুলভ উৎফুল্লতা প্রকাশ করে বললেন, 'তোমাকে কিছু আফ্রিকান ট্রাইবদের খাদ্য সংক্রান্ত কিছু ভিডিও চিত্র দেখাবো, দেখবে তাদের ডিনারের লিষ্টে জীবন্ত কীট-পতঙ্গ,টাটকা জীবের রক্ত, আর কুমীর, ইঁদুর, বানর এমনকি সাপও আছে'। ছবিগুলো দেখে আমার বমি হওয়ার উপক্রম। ম্যারিয়া তার রক্তজবা ঠোঁটে হাসি তোলে বলেন, আমরাও এসেছি ওখান থেকে। আমি একবার শ্যাম বর্ণের আমার দেহ, টিভিতে কৃষ্ণাঙ্গ দেহের আফ্রিকান ঐ মানুষগুলো আর একবার শ্বেত বর্ণের ম্যারিয়ার দিকে তাকাই। ম্যারিয়া বলেন, 'কী ভাবছো'? আমি বলি, 'কিছু না'।

ম্যারিয়ার হাত ধরে আমার প্রথমে কলেজ তারপর ইউনিভার্সিটিতে আসা। অবিশ্বাসের ধারনাটা মূলত ম্যারিয়ার কাছ থেকে পেয়েছিলাম। তবে শুধু ধারনাই। প্রথমে মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছিল যে, কীভাবে এত সহজে নির্দ্বিধায় মানুষ বলতে পারে, 'আমি আল্লাহ বিশ্বাস করিনা'। ম্যারিয়ার অবিশ্বাস আর আমার বিশ্বাসে কার্যত কোনো পার্থক্য ছিলনা। যেখানে পাপের বা কোন ঐশ্বরিক শক্তির কাছে জবাবদিহিতার কোনো ভয় নেই, সেখানে বিশ্বাস থাকায় আর না থাকায় কী আসে যায়? ইউনিভার্সিটিতে সাবজেক্ট নিলাম, সোসিয়েল সায়েন্স। পরিচয় হলো, Karl Marx, Max Weber, Bertrand Russell এর মত সমাজ বিজ্ঞানীদের লেখার সাথে। ধর্ম বিষয়ে তাদের বক্তব্য বা চিন্তা ধারনার সাথে আগে আমার কোনো পরিচয় ছিলনা। আমার মনে প্রশ্ন জাগে, আমি তো কতো আকুতি মিনতি, গালিগালাজ করেও কোনোদিন আল্লাহর সাড়া পেলাম না, জগতের

সেরা জ্যোতির্বিজ্ঞানী, জীববিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী মনীষীগনও আল্লাহর কোনো সন্ধান পেলেন না, বিষয়টা কী? আমি ভাবতে থাকি, তাহলে আসলেই কি আল্লাহ আছেন? আল্লাহর অস্তিত্বের উপর আমার সন্দেহ জেগে উঠে। তবে আমার বিশ্বাসের প্রদীপ তখনও নিভু নিভু হয়ে জ্বলছিল।

ইউনিভার্সিটিতে আসার দু বছরের মাথায় চোখের সামনে এক আশ্চর্য এবং মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে যায়। ২৫ বৎসর বয়সে ম্যারিয়া তার মায়ের মত ক্যান্সারে মারা যান। মৃত্যুর একমাস আগেও (সম্ভবত ১৯৮৫/৮৬ সালে) ম্যারিয়া আমার জন্যে হিলের-ধুমকেতু সংক্রান্ত, সেই সময়ে টিভিতে প্রচারিত সকল সংবাদ ডুকুমেন্টারি, রেকর্ড করে রাখতে ভুলেন নি। সাগর পারে বেঞ্চের উপর বসে আমরা দুজনে হাতে হাত রেখে হিলের-ধুমকেতু আর কোনোদিন দেখতে পারবোনা জানতাম, কিন্তু একমাস পরে একসাথে বসে আর কোনোদিন পূর্ণিমার চাঁদও দেখতে পারবোনা তা কল্পনাও করিনি। ম্যারিয়ার মত একজন সত্যবাদী, স্পষ্টবাদী, নৈতিক চরিত্রের মানুষ আমি জীবনে খুব কমই দেখেছি।

কয়েক বছর পরের কথা-একদিন রাস্তায় দেখা হলো ঢাকা থেকে আগত চারজন ছাত্রের সাথে, তারা ভাড়াটিয়া ঘর খুঁজছেন। পরের সপ্তাহে কুশলাদি জিজ্ঞেস করতে তাদের বাসায় গিয়ে উপস্থিত হলাম। ঘরটির মালিক একজন ইরাণী ভদ্রলোক। আলাপকালে তাদের টেবিলের উপর রাখা একটি বইয়ের উপর আমার দৃষ্টি পড়লো। "নির্বাচিত কলাম"। প্রথম পৃষ্ঠা পড়েই আমি তাদের কাছে আবদার করলাম, বইটি আমাকে ধার দিতে হবে। একজন বললেন, এই লেখিকার বই ভাল লাগলে আরো দু একটা বই আছে আপনি নিতে পারেন। তারা আমাকে তাসলিমা নাসরিনের "নির্বাচিত কলাম" "অপর পক্ষ" ও "যাবো না কেন যাবো" বই তিনটি দিলেন। একটি বইয়ের (সম্ভবত 'অপর পক্ষ' বইগুলো এখন আর আমার কাছে নেই) এক জায়গায় এসে আমার চক্ষু স্থির আটকে গেল। তাতে লেখা আছে (বাক্যটা বোধ হয় এ রকমই ছিল) 'রাস্তার বখাটে

ছেলেরা নারীদের দেখে যেমন 'মাল' বলে, ইসলামের নবি মুহাম্মদও নারীকে 'মাল' বলেছেন'। বইটিতে হাদিসের রেফারেন্স উল্লেখ করা। অন্য একটি জায়গায় লেখিকা কোরানের সুরা ও আয়াত নম্বর উল্লেখ করে ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর মর্যাদা বর্ণনা করেছেন। সংশ্লিষ্ট হাদিস ও কোরানের আয়াত দুটো আমি আগে মাদ্রাসায় থাকতে ওয়াজিনদের মুখ থেকে শুনেছি, নিজেও পড়েছি। সেই বয়সে, তখন মনে করতাম, এটাই নিয়ম, এভাবেই হওয়া উচিৎ যেভাবে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুল চান, তারা যা বলেন, তাতেই সকল মানুষের ইহকাল ও পরকালের মঙ্গল। আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুলের বাণী ও নির্দেশের উপর সন্দেহ বা প্রশ্ন করা নিজেকে কাফির ঘোষণা দেয়ার শামিল। পরের মাসে ঐ ছাত্রদের একজন সাথী বাংলাদেশ থেকে আসার সময় আমার জন্যে নিয়ে এলেন আরজ আলী মাতুব্বরের "সত্যের সন্ধানে" বইটি। সম্পূর্ণ বইটি পড়ে আমি নিশ্চিত হয়ে গেলাম, এতোদিন বৃথাই আমি আল্লাহর সন্ধান করেছি, তার কাছে প্রার্থনা করেছি, তাকে অভিশাপ দিয়েছি, সে তো আসলেই নেই।

এবার আমার মনে প্রশ্ন জাগে, কে সেই ধূর্ত-বাটপার যে সর্বপ্রথম ধর্মের বা আল্লাহর কন্সেপ্ট তৈরি করেছিল? এই ঢাহা মিথ্যা, বিশ্বজুড়ে প্রচার ও বিস্তারই বা হলো কী করে? গ্রীক, মিশরীয় ও পারস্য সভ্যতার আলোয় উদ্ভাসিত পৃথিবীতে, মাত্র দেড় হাজার বছর পূর্বে মুহাম্মদ কীভাবে এতোবড় প্রতারণা করতে পারলেন, তার সফলতার চাবিকাঠিটা কী? সোজাভাবে উত্তরটা পেয়েছি Karl Marx, আর Bertrand Russell এর কাছে। Capital আর Power, অর্থ এবং শক্তি। জগতের সকল মঙ্গল-অমঙ্গল, ঝগড়া-বিবাদ, ব্যর্থতা-সফলতা, 'অর্থকে না শক্তিকে কেন্দ্র করে' এ নিয়ে উইনিভার্সিটিতে টিম ওয়ার্ক বা গ্রুপ ওয়ার্কে তর্ক বিতর্ক করেছি, আমি সব সময়েই অর্থের পক্ষে ছিলাম। প্রমাণটা পেয়েছি মুহাম্মদের ইসলাম বিস্তারের ইতিহাস পর্যালোচনা করে। ঢাকার ছাত্রদের ল্যান্ডলর্ড ইরাণী ভদ্রলোকের কাছ থেকে জানতে পেরেছিলাম, আরবেরা (খলিফা আবু বকর (রাঃ), ওমর (রাঃ) ও উসমান (রাঃ) এর শাসনামলে)

কীভাবে পার্সিয়ানদের হাজার বছরের সনাতন কৃষ্টি ধ্বংস করেছিল। তিনি বলেন, শিয়ারা বিশ্বাস করেন, কিয়ামতের দিনে ব্যভিচারিণী আয়েশার (রাঃ) বিচার অবশ্যই হবে। এবার আমি ধর্মের উল্টো পৃষ্ঠা দেখার লক্ষ্যে, লাইব্রেরি আর ইন্টারনেটে অনেক দৌড়াদৌড়ি করে যা পেলাম, তা কারো কাছে বলার মানুষ খুঁজছিলাম। একজনকে পেয়েও গেলাম। একদিন হঠাৎ আমার এই বন্ধু, 'মুক্তমনা' ওয়েব সাইটের ঠিকানা দিলেন। এখানে এসে দেখি, আমার কথা সারা বিশ্বকে শুনানোর জন্যে তারা ব্যবস্থা করে রেখেছেন। সেখানেও পেলাম অনেক অজানা তথ্য। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এলেন বেশ কয়েকজন মুক্তমনা। লেখা হলো একটি বই, 'যে সত্য বলা হয়নি'। সে বইটি লেখার, আর আমার অবিশ্বাসের সুত্রপাত কীভাবে হয়েছিল, সেই 'না বলা কিছু কথা' আজ বলে দিলাম।

ইন্টারভিউ

আজ থেকে প্রায় আটত্রিশ বৎসর পূর্বে প্রথম ইংল্যান্ড এসেছিলাম। তখনকার ইংল্যান্ড আর আজকের ইংল্যান্ডের মধ্যে অনেক তফাৎ। তখন দিনের সুর্য্য সাড়া বছরই ঘন কুয়াশার আড়ালে লুকিয়ে থাকতো। সকাল-সন্ধ্যা, রাত-দিন টাহর করা মুশকিল হতো। রমজান ছিলনা সুতরাং ঈদের বা কোরবানির চাঁদও উঠতোনা। মক্তব মাদ্রাসা নেই, কোনো মসজিদও নেই। পরিবার পরিজন ছিলনা বললেই চলে। জীবিকার জন্যে প্রবীণরা চাকরি করতেন কার্পেট ফ্যাক্টোরি, গ্লাস ফ্যাক্টোরি এবং গার্মেন্টস ফ্যাক্টোরিতে, আর যুবকেরা রেষ্টুরেন্টে। মিডল্যান্ডের বার্মিংহাম শহরে একটি সুতা ফ্যাক্টোরিতে আমার জীবনের প্রথম কাজ। ফ্যাক্টোরির কাজে সকাল আটটার বাস ধরে নয়টার আগে কর্মস্থলে হাজির হতে হয়। ঘড়ির এল্যার্ম শুনে ঘুম থেকে জেগে উঠার অভ্যেস নেই। ঘুম পূর্ণ হওয়ার আগেই রুমের সহকর্মীর ঘড়িতে যখন এল্যার্ম বাজতো, মনে হতো যেন কেয়ামত আসন্ন। তখনকার দিনে এ দেশে অসহ্য ঠান্ডা পড়তো। কাজের লোক যারা ভোর রাতে বাস স্টপে দাঁড়িয়েছে তারা জানে বিলেতের ঠান্ডা কী জিনিস। আমি যুবক মানুষ, ফ্যাক্টোরির কাজ ভাল লাগলোনা। চলে এলাম ডরসেট এরিয়ার বর্নমাউথ শহরে। তাজমহল নামক একটি রেষ্টুরেন্টে কিচেন পৌর্টারের কাজ হলো। থাকা খাওয়া রেষ্টুরেন্টের উপরে, মোট এগারোজন কর্মচারী, প্রধান শেফ ছাড়া সকলেই ব্যাচলার অবিবাহিত। শেফ মুরুব্বি মানুষ, মাথার চুল, মুখের দাড়ি পাটের মত সাদা। এক কালে এক ইংরেজ বণিকদলের জাহাজের বাবুর্চি ছিলেন। তিনি এই রেষ্টুরেন্টের সকলের নানা। ম্যানেজার ফরিদ ভাই আর প্রধান শেফ নানার কথায় আমাদের বস (রেষ্টুরেন্টের মালিক) উঠেন আর বসেন। পুরো পনেরো বছর যাবত এরা দুজন এই রেষ্টুরেন্টে আছেন, কাষ্টমাররা তাদেরকেই রেষ্টুরেন্টের মালিক মনে করে।

সকাল এগারোটা থেকে বেলা তিনটা, আবার বিকেল পাঁচটা থেকে রাত একটা পর্যন্ত কাজ। সাঙ্ঘাতিক বিজি রেষ্টুরেন্ট। সপ্তাহে দশ হাজার পাউন্ডের টেইকিং। তখনকার সময়ের দশ হাজার পাউন্ড অনেক টাকা। আহ হারে বিলেতের কাজ, হায়রে কষ্ট। রেষ্টুরেন্ট খোলার পর থেকে বন্ধ হওয়ার পরেও আমার মাথার উপর দিয়ে শেফের বড় বড় হাড়ি বাসন, ওয়েটারের চা-কফির কাপ, মদের গ্লাস, ছেড়া তাসবিহর গুটার মত সিংকে এসে পড়তো। ওগুলো সব ধুয়া মুছা করা, ফ্লোর ঝাড়ু দেওয়া, মপ মারা, ডাস্টবিন সাফ করা আমার কাজ। গামলা-বাথের মতো বড় সিংকের ওয়াশিং পাউডারযুক্ত ময়লা পানিতে সকাল বিকেল হাত দুটো কনুই পর্যন্ত ডুবে থাকতো। কাজ শেষে হাতের দিকে তাকালে ভয় হতো, যেন মরা মানুষের দুটো হাত। সপ্তাহে আমার বেতন একুশ পাউন্ড পঞ্চাশ পেনি। শহরের পাবলিক বাথে পয়সা দিয়ে গোসল, নিজের পয়সা দিয়ে লন্ড্রি, নিজের পয়সা দিয়ে রুমের হিটার জ্বালাতে হতো। বাংলাদেশি গ্রোসারি দোকান ছিলনা, কেউ হালাল মাছ মাংসের চিন্তাও করতোনা। রেষ্টুরেন্টের যুবকদের জীবন, ফ্যাক্টোরির প্রবীণদের জীবনের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা ছিল। এখানে সবাই এক একজন এলভিস, জন ট্রাভাল্টা। চুলের ফ্যাশন ঠিক রাখার জন্যে নিজ নিজ ছুটির দিনে সেলুন বুক করা থাকতো। প্রত্যেকেরই হাই হিল জুতা, বাগি ট্রাউজার, টাইট শার্ট। প্রায় সকলেরই গার্লফ্রেন্ড আছে, এমন কি নানারও। নানার গার্লফ্রেন্ড সুজানা, তার পঞ্চাশোর্ধ বয়স প্রসাধনির কুদরতে ত্রিশে নামিয়ে রাখতেন।

রাতের বেলা সময় সুযোগে কর্মচারীদের কেউ নাইট ক্লাবে, কেউ ক্যাসিনো, কেউ গার্লফ্রেন্ডের ঘরে চলে যান। আবার যাদের কেউ নেই তারা একরুমে বসে তাস খেলা জুড়ে দেন। ব্রে, টুয়েন্টি নাইন, কল ব্রিজ, রাশিয়ান ব্রিজ, ইন্টারন্যাশনেল ব্রিজ সকল প্রকার খেলাই চলে। মাঝে মাঝে বসে তিন তাসের জুয়া, মিনিমাম বেট পাঁচ পেনি। এদের এই খেলায় আমার খুব একটা ইন্টারেষ্ট ছিলনা। আমাকে যে কোনো অবস্থায়ই হউক সিংক থেকে উঠতে হবে। কিচেন পৌর্টার থেকে কুক, কুক থেকে তান্দুরি শেফ,

তারপর মেইন শেফ, এই হলো আমার টার্গেট। ম্যানেজার ফরিদ ভাই শিক্ষিত এবং খুব ভাল মানুষ। তার কাছে আমার টার্গেটটা গোপনে ব্যক্ত করলাম। তিনি একটা তদবির বাতলে দিলেন, বললেন- নানার গার্লফ্রেন্ডকে দেখলে ইয়ং লেডি বলে সম্বোধন করতে হবে। কয়েক মাসের মধ্যেই নানার বিশ্বস্ত মানুষ হয়ে গেলাম। সিংক থেকে মুক্তি পেলাম, হাতে উঠলো হাতির কান মার্কা বড় চামচ আর কুকিং-প্যান। বেতনও কিছুটা বাড়লো, এবার তান্দুরি শেফ হবার পালা। কিন্তু মরার আগে দোজখের আগুনে হাত ঢুকাই কীভাবে? নানার ধমক আর পয়সার লোভে বিসমিল্লাহ বলে ওভেনে হাত ঢুকালাম। ছ্যাত ছ্যাত করে হাতের বেশ কিছু লোম ও কিছু জায়গার চামড়া পুড়ে গেল। মনকে সান্তনা দিলাম যাক, মরার পরেও তো কত চামড়া জ্বলবে আবার নতুন চামড়া উঠবে। এই দশা তো সকলেরই হয়।

দিনের বেলা ষ্টাফের সকল ঘুম থেকে জেগে উঠার আগেই নানাকে দেখতাম একটা ইংরেজি পত্রিকা নিয়ে নিচে বসে আছেন। ডেইলি সান অথবা ডেইলি মিরর। কী যে পড়তেন আমি বুঝতাম না। শেষে আবিষ্কার করলাম, নানার দৌড় পত্রিকার পেইজ থ্রি আর স্পোর্স সেকশন পর্যন্ত। আফটারনুন দুই ঘন্টার ব্রেইক টাইমেও নানা নিচে বসে থাকেন, বাকিরা কেউ টেলিভিশন দেখেন আর কেউ ঘুমিয়ে পড়েন। নানা মাঝে মাঝে কোথায় যেন উধাও হয়ে যান। একদিন তাকে ফলো করলাম। তিনি লাডব্রুক নামের জুয়ার ঘরে ঢুকলেন। আমি বললাম-

- নানা, আমি এসেছি।

- শুস, কথা বলবিনা। দেখ, ফাইন্যাল ফারলং। কাম অন সন, কাম অন। হেহ, হে, উইনিং বাই ক্লিয়ার টু লেন্ত।

- কী হচ্ছে নানা?

- আমার ঘোড়া উইন করলো। পুরো টু লেন্ত ক্লিয়ার।

- আপনার ঘোড়া?

- দূর বে আক্কেল তুই বুঝবিনা। শোন, কাউকে বলিস না আমাকে এখানে দেখেছিস।

- কিন্তু হলোটা কী তা তো বুঝলাম না।

- আমার সাথে কাউন্টারে চল।

- এ কী নানা, পুরো পঞ্চাশ পাউন্ড! আমার এক সপ্তাহের বেতন এক মিনিটে উপার্জন?

- শুস, কাউকে বলবিনা।

- নানা, আমি জুয়া খেলবো।

- তুমি ঘোড়া কুত্তার কী বুঝবে?

- কুত্তারও দৌড় আছে নাকি?

- আছে।

- নানা, আমি কুত্তা খেলবো।

- তো চয়েস করো একটা কুত্তা, এই দেখো এখানে ছয়টা কুত্তার নাম আছে।

- কুত্তি নাই?

- আছে।

- একটা সুন্দর নাম পেয়েছি নানা।

- কি?

- এঞ্জ্যাল অফ দ্যা সাউথ। নানা, এটা কুত্তা না কুত্তি?

- কথা কম বলো। কতো ধরবি?

- দুই পাউন্ড।

- প্রাইস কত?

- তা তো বুঝিনা।

- ধুর শালা, এটা উইন করবে না।

- কেন?

- টেন টু ওয়ান কুত্তি, দৌড়ের সময় পেশাব করতে বসে যাবে।

- আমি এটাই ধরবো, কী করতে হবে বলুন।

- ট্রাপ নাম্বার লেখো, রেইসের টাইম লেখো, দুই পাউন্ড উইন লিখে কাউন্টারে নিয়ে যাও।

দুই মিনিট যেতে না যেতে নানা উত্তেজিত হয়ে বললেন, ‘কাম বানাইছো নাতি। প্রথম বেটেই টুয়েন্টি পাউন্ড উইন’। জীবনের প্রথম উইনিং ম্যানি নিয়ে বার্টন শপে গিয়ে একটা লেদার জ্যাকেট কিনলাম। পরের কয়েক সপ্তাহে নানার কাছ থেকে ঘোড়া কুত্তার পূর্ণ সবক নিলাম। পত্রিকা পড়তে নানার চশমা লাগে। এক নীরব আফটারনুন ব্রেইক টাইমে নানা আমাকে ডাক দিলেন- ‘নাতি এই দেখো, এই কলামে ঘোড়ার নাম, এখানে ঘোড়ার মালিক, এখানে ট্রেইনার আর এখানে জকির (সোয়ার) নাম থাকে। এই হলো ঘোড়ার বয়স আর এখানে জকির ওজন। এবার বলো-

- এই ঘোড়াটার নাম কি?

- সাইফুল্লাহ (আল্লাহর তারবারি)

- ট্রেইনার?

- হেনরি সেসিল।

- মালিক?

- সায়্যিদ বিন আল মাখতুম।

- জকি?

- লেষ্টার পিগট।

- আর এই ঘোড়াটার মালিক?

- খালিদ আব্দুল্লাহ।

- নাতি, এই দুই ঘোড়া দিয়ে আর এই কুত্তা দিয়ে দুই পাউন্ডের একটা ডাবল-ট্রাবল লাগা। তুই এক পাউন্ড, আমি এক পাউন্ড। তুই লাকি মানুষ, কাম হতেও পারে।

- উইন করলে কত পাবো নানা?

- পাঁচ শো পাউন্ড।

হর্স দুটো উইন করলো, কিন্তু হট ফেভারেট ডগ সেকেন্ড হলো, আমাদের বেট মারা গেল। এর পর থেকে গাম্বলিং এর যাবতীয় বিদ্যার্জনে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করলাম। পত্রিকার লটারি থেকে এমিউজমেন্টের ফ্রুট মেশিন, সাপ্তাহিক ফুটবল, ডেইলি ফুটবল, ক্যাসিনো, প্রাইভেট তাসের জুয়া সব জায়গায় আমার বিচরণ। যে চক্রবর্তি মাল্টিপোল বেটের হিসেব করতে লাডব্রুকের কাউন্টারের কর্মচারির সময় লাগে পাঁচ মিনিট, আমার লাগে দুই মিনিট। 'সিঙ্গল 'ডাবল' 'ট্রাবল' 'ইয়াঙ্কি' 'ফোরকাষ্ট' 'ট্রাইকাষ্ট' 'রাউন্ড-রবিন' 'হিঞ্জ' সব আমার নখদর্পণে। টাইবেরিয়াস ক্যাসিনোর রাশিয়ান রোলেট, ফাইভকার্ড পোকার, সেভেন কার্ড স্টাড, ত্রি কার্ড ব্রাগ, ব্লাকজ্যাক সব মুখস্ত হয়ে গেছে। এখন মোটামুটি আমি একজন দক্ষ জুয়াড়ি। কিন্তু রাত দিন কাগজ কলম, ক্যালকুলেটার দিয়ে হিসেব করেও ক্যাসিনোর ডিলারকে ১০০% বিট করার সমাধান পেলাম না। যত রকমের বেট করিনা কেন, তার একটা এক্সট্রা উইনিং চান্স থেকেই যায়।

নানা আমার সকল সুখ দুঃখের সাথী। একদিন তাকে বললাম- 'নানা,আপনাদের সকলের গার্লফ্রেন্ড আছে, আমার তো কেউ নেই'। নানা একটা এড্রেস দিলেন, সাথে বাস নাম্বার। বললেন- 'রেষ্টুরেন্টের পেছনের বাস ষ্টপে সাউথাম্পটন-গামী ৩৪ নং বাস থামে। সাউথাম্পটন বাস ষ্টেশন থেকে ট্যাক্সি ধরবে। ট্যাক্সিওয়ালাকে এই ঠিকানা দেখালে তোমাকে সোজা রেড-লাইট এলাকায় নিয়ে যাবে। লাল-বাতি জ্বালানো যে কোনো ঘরে নক করবে'। বেশ কয়েক সপ্তাহ ছুটির দিনে সাউথাম্পটন আপ এন্ড ডাউন করার পর মনে হলো, পয়সা দিয়ে এভাবে দুধের স্বাদ জল দিয়ে আর কতোদিন মেটাবো? এবার ফরিদ ভাইকে ধরতে হবে। ফরিদ ভাইয়ের ওয়াইফ, মানুষ নয় এক জীবন্ত দেবী। দিলীপ কুমার তাকে দেখলে সায়েরা ভানু বলে ভুল করতেন। সাদা চেহারা কৃষ্ণ-কালো চুল। কথা বলেন স্প্যানিশ ভাষায়, আমি তার আগা-মাথা কিছু বুঝিনা। সে ই আমাকে একদিন শিখিয়েছিল- gracias (গ্রাসিয়াস) ধন্যবাদ, Te quiero

(টি কুয়াইরো) আমি তোমাকে ভালবাসি, ¿Cuál es tu nombre? (কুয়ালিস তু নমরে) তুমার নাম কী ইত্যাদি। সব শুনে ফরিদ ভাই দিন তারিখ ঠিক করে একদিন আমাকে একটি নাইট ক্লাবে নিয়ে গেলেন। ক্লাবের নাম ইনকগনিটো। ফরিদ ভাইয়ের শেখানো তদবির কাজে লাগলো। একদিন এক শ্বেতাঙ্গিনী যুবতিকে ড্রিংক ওফার করলাম- 'ক্যান আই বাই ইউ এ ড্রিংক'? সে রাজি হলো। মেয়েটির নাম চেলসি। রাতের শেষ স্লো-মোশনের গানের সময়, ডান্সফ্লোরে সে আমাকে আহবান করলো- 'উড ইউ লাইক টু ডান্স উইথ মি'? গানের প্রথম কলিটা এখনও ভুলি নাই- 'লাভ মি টেন্ডার লাভ মি ট্রু, ও মাই ডার্লিং–-। জীবনে প্রথম বারের মত এক নারীকে জড়িয়ে ধরে ডান্স করলাম। সে কানে কানে বললো- 'আই লাইক ইউর আফটার শেইভ'। এর পর আর কোনোদিন সাউথাম্পটন যেতে হয়নি। ডায়মন্ড রিং দেইনি, সোনার অলংকারও নয়, এক বছরের মাথায় চেলসি সে নিজেই প্রস্তাব করলো- 'উড ইউ ম্যারি মি'?

একদিন নানা দেশে চলে গেলেন, এখন আমার উপর শেফের দায়ীত্ব। দিনের কাজ শেষে ঘোড়ার ঘর (লাডব্রুক) রাতের কাজ শেষে টাইবেরিয়াস (ক্যাসিনো) ছুটির দিন গার্লফ্রেন্ড। কাজ, জুয়া, মদ, নাইট-ক্লাব এই হলো সাপ্তাহিক রুটিন। পুরো দশটি বৎসর এভাবেই কাটলো। জুয়ায় শুধু যে হেরেছি তা নয়, মাঝে মাঝে বড় বড় এমাউন্টের টাকা জিতেছি কিন্তু ধরে রাখতে পারি নাই। ক্যাসিনোতে আমার ফেভারেইট নাম্বার ছিল দশ আর উনত্রিশ। এই নাম্বার দুটো আমার ডেইট অফ বার্থের দুটো সংখ্যা। এই দুই নাম্বারের উপর বেট করে এক রাতে এগারো হাজার পাউন্ড উইন করেও শুন্য হাতে ঘরে ফিরেছি। একবার ছয়টা ঘোড়া দিয়ে সুপার ইয়াংকি খেলেছিলাম। শেষ রেইসের ফেভারেইট ঘোড়াটা ফটো ফিনিশে সেকেন্ড হলো আর আট হাজার পাউন্ড হাতের ফাঁক দিয়ে হাওয়া হয়ে গেল। আরেকবার বিশটা ফুটবল টিম দিয়ে একিউমিলেটার লাগিয়েছিলাম। দুইটা টিম ড্রো করার কারণে তিরিশ হাজার পাউন্ডের চান্স মারা গেল।

দশ বছর পর মনে পড়লো, সর্পও গর্তে ঢুকার সময় সোজা হয়ে ঢুকে। এভাবে জীবন নষ্ট করা ঠিক নয়। জুয়া খেলা ছেড়ে দিলাম। এক বছর রুজী করে পাঁচ হাজার পাউন্ড সেইভ করলাম। হঠাৎ একদিন মনে চিন্তা জাগলো, জুয়া খেলে জীবনটা তো প্রায় শেষ করে দিলাম। গাম্বলিং করে লক্ষ লক্ষ পাউন্ড খোয়ালাম, লাস্ট একটা চান্স নিয়ে দেখলে কেমন হয়, কিছুটা টাকা উদ্ধার করা যায় কি না। জুয়ার ঘরে যাই নাই সত্য, কিন্তু একটা ঘোড়াকে ফলো করছি বিগত এক বছর যাবৎ। ঘোড়াটির নাম- শেরগার (Shergar), কপালে তার লম্বা চন্দ্রটিকা। মুসলমান মালিক, দুনিয়া বিখ্যাত বিলিওনেয়ার প্রিন্স করিম আগা খান। নিজাম উদ্দীন আউলিয়া ১০০টা খুন করার পর একটা খুনের কারণে আউলিয়া হয়েছিলেন। সিদ্ধান্ত নিলাম, আমি জীবনের শেষ জুয়া খেলবো।

১৯৮১ সালের ঘটনা। সানডাউন পার্কে (Sandown Park) গার্ডিয়ান ক্লাসিক ট্রায়েল (Guardian Classic Trial) রেইসে শেরগার পুরো দশ লেন্তের ব্যবধানে জয়ী হলো। তখনও এপসম ডার্বিতে (Epsom Derby) শেরগারের উপর বেটিং প্রাইস ছিল এইট টু ওয়ান (এক পাউন্ডে আট পাউন্ড)। পাঁচ হাজার পাউন্ড ব্যাংক থেকে তুলে ঐ দিনই আল্লাহর নাম নিয়ে শেরগারের উপর রেখে দিলাম। এর পরপরই ডার্বি রেইসের জন্যে শেরগার হট ফেভারেইট হয়ে যায়। টপ ওউনার আগা খান, টপ ট্রেইনার স্যার মাইকেল স্টাউট, টপ জকি ওয়াল্টার সুইনবার্ণ, চাঁদ-কপালি ঘোড়া শেরগার। আমি ১০০% নিশ্চিত হয়ে গেলাম এই বেট মারা যেতে পারেনা। ঘোড়-দৌড়ের ২২৬ বৎসরের ফ্লাট রেইসের ইতিহাসের রেকর্ড ভঙ্গ করে শেরগার ১০ লেন্ত ডিস্টেন্সে উইন করলো। বুকির ঘর ক্যাশ টাকা দিতে পারলোনা, তারা ৪৫ হাজার পাউন্ডের একটা চেক দিল। সেদিন ছিল আমার জীবনের শেষ জুয়া খেলা। তারপর বেশিদিন আর মানুষের কাজ করতে হয়নি। একটা রেষ্টুরেন্ট করলাম, খুব ভাল ব্যবসা হলো। এর থেকে আল্লাহর মর্জি ইংল্যান্ডে তিনটা রেস্টুরেন্টের মালিক হলাম, দেশে হার্ট অফ সিটিতে একটি মার্কেট তৈরি করলাম। শহরে কোনোদিন গেলে দেখবেন, বহু দূর থেকে বিশাল সাইন-বোর্ডে বড়বড়

ইংরেজি হরফে লেখা আছে- 'হাজী কুতুব মার্কেট'। সিটির পশ্চিম প্রান্তে চার কেদার জমিনের উপর আছে, আমার ওয়াইফের নামে আটতলা বিশিষ্ট 'জুবেদা রেষ্ট হাউস'। গ্রামের বাড়িতে ঢুকার পথে পুকুরের পূর্বপারের তোরণে বাংলায় লেখা আছে 'মদীনা মঞ্জীল' প্রোপ্রাইটার, আলহাজ মুহাম্মদ কুতুবুদ্দীন।

এই পর্যায়ে এসে আমাদের গল্পের নায়ক কুতুবুদ্দীন থামলেন। একনাগাড়ে দীর্ঘ সময় ক্যামেরা লেন্সের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে, 'বিলেতের বাঙ্গালি' নামক একটি টিভি প্রোগ্রামের জন্যে ইন্টারভিউ দিচ্ছিলেন। ক্যামেরার পেছনে এবং ডানে বামে পাওয়ারফুল স্পটলাইটের আলোর তাপে ঘরের তাপমাত্রাই শুধু বাড়েনি, কুতুবুদ্দীনের ব্লাড-প্রেশারটাও বেড়ে যায়। ক্যামেরা তখনও রোলিং করছিল। কুতুবুদ্দীন ইঙ্গিত করলেন, তিনি অস্বস্তি বোধ করছেন। ডাইরেক্টর বললেন- কাট। ক্যামেরার পেছনের এবং রুমের দুই কর্ণারে রাখা সকল লাইট অফ করা হলো। রুমের ভিতর হঠাৎ করে আবছা একটা অন্ধকার নেমে এলো। কুতুবুদ্দীন চোখ মেলে চেয়ে দেখলেন, ক্যামেরার পেছেনে কালো সিল্কের কাপড় পরিহিতা এক রমণী দাঁড়িয়ে। ভাবলেন, অপটিক ইল্যুশন। বাম দিকে তাকিয়ে দেখেন তার অতি নিকটে মাইক্রোফোন হাতে শুভ্রবস্ত্রাদিত ঘোমটা পরা আরেক নারী। কুতুবুদ্দীন ভয় পেলে গেলেন। দুই হাজার পাউন্ড দামে কেনা শান্ডালিয়ারের আলোটা বাড়িয়ে দিতে দাঁড়াতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। রুমের ভিতর অনেক্ষণ চুপচাপ নিস্তব্ধ, পিন পতন নীরবতা। প্রথম মুখ খুললেন ক্যামেরার পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা রমণী-

- মিষ্টার কুতুবুদ্দীন, জীবনের পুরো একটা অধ্যায়ই তো গোপন করে গেলেন।
- কে তুমি?
- ইনকগনিটো ক্লাবে যাকে বলেছিলে- 'তুমি আমার জীবনের প্রথম নারী'।
- হু আর ইউ?
- তোমার তিন সন্তানের জননী, চেলসি উদ্দীন। চিনতে পেরেছো?

- হু দ্যা হেল আর ইউ?

-খুলে দেখো, তোমার বৃটিশ সিটিজেনশিপ ডকুমেন্টে আমার নাম আজও আছে।

ইনটারভিউয়ার মহিলা সজোরে হাতের মাইক্রোফোনটা ফ্লোরে ছুঁড়ে মেরে, হু হু করে কেঁদে উঠলেন। বললেন- 'সাউথাম্পটনের ভিকটোরিয়া রোডের কোনো মহিলা নয়, ইনকগনিটো ক্লাবের তুমিও নও গো, আমি হতভাগিনী এই শয়তানের জীবনের প্রথম নারী'। কুতুবুদ্দীন কিছু বলতে চাইছিলেন, পারলেন না। জিহবায় লালা নেই, কণ্ঠ তার আড়ষ্ট। মহিলা বললেন- 'একটিবার চোখ মেলে ভাল করে তাকিয়ে দেখো, আমি কে'? কুতুবুদ্দীন বাকরুদ্ধ। মহিলা ধমক দিয়ে জিজ্ঞেস করেন-

- চিনেছো?

- না।

- কৃষ্ণ পুরের মোতিলাল দাসের মেয়ে বিপাশা দাস। তুমি আপাদমস্তক সাদা আল-খেল্লা পরেছো, মস্তকে দশ হাত লম্বা পাগড়ি লাগিয়েছো, মেহদি দিয়ে দাড়ি রাঙ্গিয়েছো, কিন্তু কোনো কিছুতেই তোমার চোখ দুটোকে মুখোশ পরাতে পারোনি। আমি তোমাকে চিনতে মোটেই ভুল করিনি। তুমি মসজিদে আজান দাও, ছোট্ট ছোট্ট শিশু কিশোরদের ওয়াজ শুনাও, আরবি পড়াও, তোমার লজ্বা করেনা, তোমার অতীত মনে পড়েনা? মনে আছে গো ৭১ সালের সেই অন্ধকার তুমুল বৃষ্টিঝরা রাতের কথা? ১১ বছরের বালিকার দেহটা, করাতিয়া যেমন করাত দিয়ে সজীব বৃক্ষাদি কেটে পুলকিত হয়, তুমিও তেমনি আমার বুকটা চিড়ে টুকরো টুকরো করেছিলে। দুই হাতে দুমড়ে মোচড়ে, দলিত মথিত করেও তুমার তৃষ্ণা মেটেনি, তুমি আমার ছোট্ট দুটো স্তন দাঁত দিয়ে চিবিয়ে ক্ষত বিক্ষত করেছিলে। আমার সর্ব অঙ্গে আজও তোমার বিষাক্ত দাঁতের দাগ রয়ে গেছে।

মহিলা তার গায়ের বস্ত্র খুলতে উদ্দ্যত হলেন। কুতুবুদ্দীন তার শরীরের সকল শক্তি দিয়ে, দু-পা একত্রিত করে সজোরে একটি লাথি মারেন। লাথিটা তার পাশে ঘুমন্ত স্ত্রী জুবেদা খাতুনের উরুতে ভীষণ আঘাত করলো। জুবেদা খাতুন চিৎকার দিয়ে ধরফড়

করে বিছানা ছেড়ে উঠেন। স্ত্রীর চিৎকারে কুতুবুদ্দীনের ঘুম ভেঙ্গে যায়। জুবেদা স্বামীর গায়ে হাত দিয়ে দেখেন, তার সমস্ত শরীর ঘামে শাওয়ার ভেজা হয়ে গেছে। তার সন্দেহ হলো স্বামীর হার্ট এট্যাক হয়েছে। জিজ্ঞেস করেন- 'তোমার কী হয়েছে গো, এম্বুলেন্স ডাকবো'? কুতুবুদ্দীন বলেন- 'কিছু না, তুমি ঘুমাও আমি একটা দুঃসপ্ন দেখছিলাম'। কিছুক্ষণ পর জুবেদা খাতুন ঘুমিয়ে পড়লেন, কুতুবুদ্দীন ধীরে ধীরে নিচে এসে সোজা লিভিং রুমে চলে গেলেন। আস্তে করে শান্ডালিয়ারের সুইচ অন করলেন, দেখলেন পূর্ণ দ্বীপ্তিতে বাল্বগুলো সব ঠিকই জ্বলছে। কুতুবুদ্দীন খৃষ্টাল পাথর বেষ্টিত বাতিগুলোর দিকে উদাস নয়নে তাকিয়ে রইলেন।

পুরনো দিনের কাহিনি

আজ ০৪-১২-২০১০ তারিখে প্রথম আলো পত্রিকার একটি সংবাদ ছিল 'পীরের উদ্ভট চিকিৎসা কেড়ে নিল ছাত্রীর প্রাণ'। সদ্য এইচ এস সি পাশ, পীরের হাতের ঔষধ খেয়ে, জীনে ধরা সিলেটের এক কিশোর তরুণীর মৃত্যুর খবর পড়ে, বহু দিনের পুরনো একটি ঘটনা মনে পড়ে গেল। তখন ছোট ছিলাম, মাদ্রাসায় পড়তাম। টুকটাক যাদু-টোনা, মন্ত্র-তন্ত্র শিখেছি, দু এক জায়গায় সাক্সেসফুল তায়-তদবিরও করেছি। ইংল্যান্ড থেকে আমার এক চাচাতো ভাই হারুন রশিদ পাঁচ বৎসর পর আজ বাড়ি এসেছেন। তার চোখে ঘরের ভিতরে দিনের বেলাও ঝাপসা অন্ধকার লাগে, মানুষগুলো দেখতে ছোটছোট লাগে, খানা পিনায় সব বালিবালি লাগে, গ্লাস-বাটি ময়লা ময়লা লাগে, রাস্তাঘাট ভুলে গেছেন, বিশেষ করে নৌকায় উঠলে মাথা ঘুরায়, সুতরাং আমি তার সার্বক্ষণিক বডিগার্ড। গায়ে শ্যামবর্ণের কোনো লক্ষণই নেই, একেবারে ছায়ায় ঢাকা ঘাসের মত সাদা দবদবে চেহারা। কাপড়ে চোপড়ে স্বর্গীয় সুবাস, স্পেশিয়েলি তার আফটারশেইভ আর সিগারেটে। বাপরে বাপ, এমন বড় সোনালী আর লাল রঙে মিশেল করা সিগারেটের প্যাকেট আমি জীবনেও দেখি নাই। এমনিতেই লম্বা সিগারেট, এর মাঝে তার পাছায় তুলা লাগানো। রশিদ ভাই লম্বা সিগারেটের অর্ধেকটা খেয়ে বাকিটুকু ফেলে দিতেন। এই ফেলে দেয়ারও আলাদা একটা স্টাইল ছিল। ক্যারম খেলার স্ট্রাইক মারার মত বুড়ি আঙ্গুল আর শাহাদত আঙ্গুলের মাঝখানে সিগারেট রেখে এমন ভাবে ছোঁড়ে মারতেন যে, সিগারেট বিশ হাত দূরে গিয়ে পড়তো। মনে মনে ভাবতাম, বিলেত বোধ হয় বেহেস্তের কাছাকাছি কোথাও অবস্থিত। রশিদ ভাই আই এ পাশ, উচ্চতায় সাত ফুট না হলেও সাড়ে ছয় ফুট অবশ্যই হবেন। সদাহাস্য, বলিষ্ঠ দেহের আর সুন্দর চেহারার মানুষ। দু একটা সিগারেট যে তার চুরি করি নাই, এ কথা বললে ভুল হবে।

একমাস পরে আজ রশিদ ভাইয়ের বিবাহের দিন। ভাবী হাজেরা খাতুন আমার এক সময়ের পুতুল খেলা, এক্কা-দুক্কা খেলা, চীনা বরতনের ভাঙ্গা টুকরা দিয়ে খেলা, ছনের খড়ে, বাঁশ ঝাড়ের আড়ালে লুকোচুরি খেলার সাথী। আমাদের বাড়ি থেকে তিন বাড়ি উত্তরে তাদের বাড়ি। বিয়ের সময় হাজেরার বয়স ছিল নয় বৎসর আর ভাইয়ের বয়স ২৫। ভাবী, ভাইয়ের আপন মামাতো বোন। গত একমাস যাবত হাজেরা কেন তার ফুফুর বাড়ি আসলোনা, তা বুঝতে পারলাম তার বিয়ের পরে। আকদের আসরে আমি মৌলভী সাহেবের পাশেই ছিলাম। একসময় তিনি যখন প্রশ্ন করলেন, 'মোছাম্মাত হাজেরা খাতুন সা'বালেগা না লা'বালেগা'? একজন উত্তর দিলেন, 'কন্যা লা-বালেগা'। আমার কাছে ব্যাপারটা খুব একটা স্পষ্ট ছিলনা। মাদ্রাসায়ও এই বালেগ-না'বালেগ, হায়েজ-নেফাস, বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মাঝে মাঝে আমাকে নিয়ে হুজুর বড় বিপদে পড়ে যেতেন। বিয়ের আসরে মৌলভি সাহেব রশিদ ভাইকে লক্ষ্য করে দুইবার বললেন, জোরে কবুল বলুন, আমরা শুনছিনা। তৃতীয়বারে বরের সমবয়সী তার এক বন্ধু বললেন 'দামান্দ কবুল বলেছেন, আপনারা সবাই বলুন আলহামদুলিল্লাহ'। কেউ শুনেছিল কি না জানিনা, অন্তত আমি কিছু শুনি নাই। সবাই হাত উঠালেন, মৌলভি সাহেব লম্বা একটা দোয়া করলেন। আল্লাহ যেন এই স্বামী-স্ত্রীকে আদম-হাওয়া, ইউসুফ-জুলেখা, আইয়ুব নবি-রহিমা বিবি, ইব্রাহিম নবি-বিবি হাজেরার জুড়ি বানায়। হাজেরা খাতুনের ঘরে যেন ইসমাইলের মত ঈমানদার সন্তান হয় ইত্যাদি। সবাই আমিন বললেন, বিয়ে সম্পন্ন হয়ে গেল।

বাসর ঘরে ঘোমটাপরা, পালংকের উপর চোখ বুঁজে বসা হাজেরাকে দেখলাম। বড় অপরিচিত মনে হল। রশিদ ভাই ঘরে ঢুকলেন, ভাবীকে নিচে নামানো হলো, স্বামীর সামনে মাথা নত করে পা ছুঁয়ে সালাম করতে হবে। দাঁড়ানো অবস্থায় হাজেরাকে দেখে মনে হল, নয় বৎসরে হাজেরা যত লম্বা হয়নি, একমাসে তার চেয়ে বেশি হয়েছে। রশিদ ভাই এই বিয়েতে মোটেই রাজি ছিলেন না। প্রথম থেকেই তার আপত্তি ছিল

কন্যার বয়সের উপর। তারপর তিনি বলতেন, আপন মামাতো, খালাতো, চাচাতো ভাই-বোন, নিজের সহোদর ভাই বোনের মত, এবং নিকটতম সম্পর্কের সাথে বিয়ে, আগন্তক শিশুর সাস্থ্যের জন্যে ক্ষতিকর। কে শুনে, কে বিশ্বাস করে তার কথা? বড় চাচা, মেজো চাচা, চাচী, মামী বাড়িশুদ্ধ মানুষ জড়ো হলেন, লম্বা লম্বা ওয়াজ নসিহত করা হলো। মা-বাবার পছন্দের উলটা গেলে, অবাধ্য হয়ে মরলে বেহেস্ত নসিব হয়না, সংসারে বরকত আসেনা, আরো কত কী বলা হল, ছোটরা তার অনেক কিছুই বুঝলোনা। রশিদ ভাই নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত বিয়ে করতে বাধ্য হলেন। বাড়িতে পাঞ্জেগানা মসজিদ আছে। সাধারণত নামাজের জামাত শুরু হওয়ার আগে রশিদ ভাইয়ের জন্যে অপেক্ষা করা হয়, তিনি নামাজী মানুষ। বিয়ের পরের দিন আজ ফজরের জামাতে কেউ তার জন্যে অপেক্ষা করলোনা। মুরুব্বি একজন বললেন, তার নাকি শরীর ভাল নয়। নামাজ শেষে আমি রশিদ ভাইয়ের উঠোনে পায়চারি করছি। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম, ভোর বেলা নাইটগাউন পরা অবস্থায় রশিদ ভাই ঘর থেকে বেরিয়ে দেয়ালে হেলান দিয়ে একা বসে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদছেন। আমাকে দেখেই হঠাৎ হু-হু করে কান্না শুরু করে দেন। আমি ভয়ে ভয়ে পাশে গিয়ে জিজ্ঞেস করি- 'কী হয়েছে, আপনি কাঁদছেন কেন'? তিনি আমার হাতে ধরে অবুঝ অসহায় বালকের মত হাউমাউ করে বলতে থাকেন, 'আমি কেন দেশে আসলাম, আমি কেন দেশে আসলাম, হায় আল্লাহ, এ আমার কোন পাপের শাস্তি'। আওয়াজ শুনে চাচী বেরিয়ে আসলেন। ধীরে ধীরে বাড়ির নারী-পুরুষ প্রায় সবাই উঠোনে এসে জড়ো হলেন। রশিদ ভাই বলতে থাকেন- 'আমার মেয়ের বয়সি একটা বাচ্ছাকে আমার কাছে বিয়ে দিয়ে তোমাদের স্বার্থটা কী হলো? কী অপরাধ করেছে এই বাচ্ছা মেয়েটা, কী ক্ষতি করেছি আমি তোমাদের'? সবাই অবাক, বাকরুদ্ধ, কারো মুখে কোনো কথা নেই। বড়দের মুখ থেকে হুশ-হুশ, ফিশ-ফিশ শব্দ শুনা গেল, উপস্থিত ছোটদেরকে সরিয়ে দেয়া হল। অল্পক্ষণ পরে পাশের গ্রামের মহিলা বিশেষজ্ঞ ডাক্তার শুক্লা রাণীকে ডেকে আনা হলো। কার কী রোগ হলো, কার জন্যে ডাক্তার ডাকা হলো বুঝা গেলোনা।

পরের দিন বড়িতে একটা থমথমে ভাব দেখা গেলো। হঠাৎ করেই যেন অসময়ে বিয়ে বাড়ির সকল কোলাহল স্তব্ধ হয়ে গে্লো। হাজেরা ভাবীর ঘরে ছোটদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেয়া হলো। এখন পর্যন্ত ভাবীর সাথে আমার কোনো কথা হয়নি, চোখের দিকে তাকিয়ে সরাসরি তাকে দেখার সুযোগও হয়নি। তৃতীয় দিনে ভাবী প্রথম নাইওর গেলেন তার বাপের বাড়ী। রশিদ ভাই আগের মত আমাকে ডেকে নেন না, আসলে কারো সাথে কোনো কথাই বলেন না। প্রায়ই পুকুর পাড়ে পাকা ঘাটের সিড়িতে উদাস মনে আকাশের দিকে তাকিয়ে বসে থাকেন। মাঝে মাঝে তার সাথে বাড়ির বড়দের জরুরী মিটিং হয়। কিছুদিন পরে এক সন্ধ্যায় হাজেরা ভাবীকে তার স্বামীর বাড়ি নিয়ে আসা হল,কিছুদিন আগেও যে বাড়িটি ছিল তার ফুফুর বাড়ি। ভাবীর আসার সংবাদ শুনে আমি মনে মনে বললাম, হে আল্লাহ জীবনে তো আমার দোয়া কোনোদিন কবুল করোনি, আমার নয়, বিয়ের আসরে তোমার ঐ নেককার বান্দাদের দোয়া তুমি ফেলে দিতে পারোনা, তাদের খাতিরে এই নবদম্পতি এই দুটো মানুষকে তুমি চির সুখী করে দাও। ভাবী বাড়ি আসলেন, সব কিছু যেন স্বাভাবিক, কারো চেহারায় কোন উৎকণ্ঠার আলামত নেই।

এই বাড়ির সবকিছু, এই গাছ-বিছালি, পুকুর, এই রান্নাঘর, এই বারান্দা হাজেরার খুবই পরিচিত। হাজেরার স্বামীর ঘরের পেছনে খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছোট্ট এক টুকরো উঠোন। উঠোনের প্রান্তে কয়েকটা সুপারি গাছ, বড় বড় দুটো নারিকেল গাছ। বাড়ির প্রবীণ মহিলারা প্রায় সন্ধ্যায়ই এখানে জড়ো হয়ে, পৃথিবীর যাবতীয় সমস্যা, বিষয়াদী নিয়ে গভীর আলোচনা করেন। ঠিক মাঝখানে আছে এঁটেল মাটির তৈরি বড় একটি উনুন। নিপুণ কারিগরি দক্ষতায় তৈরি উনুনে একসাথে দুটো হাঁড়ি বসে। তিনটা সুপারি গাছে ঝুলে আছে আরেক সুনিপুণ কারিগর বাবুই পাখিদের কমপক্ষে পনরোটা বাসা। নারিকেল গাছে কয়েকটা সাড়স পাখির ঘন ঘন আনাগোনায় অনুমান করা যায়, তাদের মাথায় বাসা বুনার পরিকল্পনা আছে।

চাচী ভাবীর আপন ফুফু হলেও এখন তিনি শাশুরি। একমাস আগের বালিকা হাজেরা আর বালিকা নয়, রিতিমত এক গৃহবধু। আজ মাদ্রাসা থেকে এসেই আমি মনে মনে প্লান করে রেখেছি, আছরের নামাজের পরে হাজেরাকে দেখতে যাবো। চিন্তা করছি ভাবী ডাকবো, না হাজেরাই ডাকবো। যা'ই ডাকিনা কেন, কানে কানে বলে আসব যে, আমি রশিদ ভাইয়ের কিছু সিগারেট চুরি করেছি। সেখানে গিয়ে দেখি ঘরে কেউ নেই। রশিদ ভাই বাজারে গেছেন এখনও ফিরেন নি। পেছনে গিয়ে দেখি চাচী সেই ছোট্ট উঠোনে রোমেনা আপা আর হাজেরাকে নিয়ে বসেছেন, রান্না বান্নার সকল সরঞ্জাম সামনে নিয়ে। চাচী আজ সন্ধ্যায় নতুন বৌমাকে রান্না শেখাবেন। রোমেনা আপা রশিদ ভাইয়ের ছোট বোন হলেও বয়সে আমার কিছুটা বড়। আমাকে দেখেই বললেন-

- মোল্লা মানুষ, এখানে কী?

- হাজেরাকে তো ভালভাবে দেখা হয়নি আপা।

- হাজেরা কী, ভাবী বলো, ভাবী। আর এমনিতে দেখা যাবেনা, পয়সা লাগবে, সালামি।

- আচ্ছা, ঠিক আছে ভাবীই ডাকবো। কিন্তু মোল্লা মানুষ পয়সা পাবো কই, সালামি তো আনি নাই।

- আচ্ছা ঠিক আছে, এক কাজ করো। খুব তো পীরাকি শিখেছ, এখানে দাঁড়িয়ে এবার তুমি জোরে-জোরে সুরে-সুরে একটা কেরাত শুনাও। তোমার কেরাত শুনে এই গ্রামে কো্নো জীন-ভুত থাকলে তারা যেন গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যায়। আর আমার ভাবীকে দেখে তুমি নজর দিতে পারবেনা।

- আমি নজর দেবো কি আপা? হাজেরা ভাবীর উপর যদি কারো নজর পড়ে তো পড়বে আল্লাহর। আল্লাহ এমন সুন্দর করে আরো একটা মানুষ সৃষ্টি হয়তো করেতেই পারবেনা।

আশ্চর্য! আমরা এতক্ষণ কথা বলছি হাজেরা ভাবী কোনো কথা বলেন না। তার কোনো সাড়াশব্দ, নড়াচড়া নেই। লক্ষ্য করলাম, সেই নারিকেল গাছের উপরে তার চক্ষু

নিষ্পলক স্থির আটকে আছে। চাচী বললেন- বৌমা, সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসলো, মাগরিবের সময় হয়ে গেছে মাথায় কাপড় তোল। হাজেরা আপন মনে হাসছে, বড় বড় চক্ষুদ্বয় ঠিক আগেরই মতো নারিকেল গাছের উপরে। রোমেনা আপা বললেন- 'ও ভাবী তুমি শুনছো, মা কী বললেন'? হাজেরা বিকট এক অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে, হাসি আর বন্ধ করেনা। নারিকেল গাছের আগা থেকে চক্ষুও ফেরায়না। চাচী মারাত্বক একটা কিছু টের পেলেন। তিনি যেইমাত্র হাজেরার মাথায় ঘোমটা টানতে উদ্যত হলেন, অমনি সে দুই হাতে ঝাপ্টা মেরে নিজের বুকের কাপড় ছিড়ে ফেলতে চাইলো। চাচী বললেন- 'তোমরা ধরাধরি করে তাড়াতাড়ি বৌমাকে ঘরে নিয়ে এসো, আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে'। কোরবানির গরু যেমন গলায় ছুরি লাগানোর মুহুর্তে শরীরের সকল শক্তি দিয়ে পালাবার চেষ্টা করে, হাজেরা ঠিক সেভাবেই হাত-পা ছুঁড়তে থাকলো। অনেক ধস্তাধস্তি করে আমরা তাকে বিছানায় নিয়ে আসতে সক্ষম হলাম। হাজেরা তখনো হাসছে আর হাত পা শক্ত করে লাথি ঘুসি মারছে। চাচী বারবার আমাকে বলছেন- 'ও বাবা কিছু একটা করো,তোমার কিছু জানা থাকলে পড়ো'। ভয়ে আমার সর্বাঙ্গ থরথর করে কাঁপছে। রোমেনা আপা বিরক্তির চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন- 'কোন্ ঘোড়ার ডিম এতদিন মাদ্রাসায় পড়লে, কিছুই করতে পারছোনা'? সেদিন থেকে প্রতিজ্ঞা করেছি জীবনে আর কোনোদিন পীরাকির নামে ভন্ডামী করবো না। কিছুক্ষণ পর হাজেরা শান্ত হয়ে গেল। এবার তার মুখ দিয়ে ফেনা বেরুচ্ছে। চাচী ভেজা তোয়াল দিয়ে তার মুখ, মাথা মুছে দিচ্ছেন। ধীরে ধীরে হাজেরার হাত-পা নরম হয়ে আসলো, আস্তে আস্তে সে ঘুমিয়ে পড়লো। অল্পক্ষণ পরেই চোখ মেলে তাকিয়ে আমাদেরকে দেখে মাথায় ঘোমটা টানার চেষ্টা করলো, কিন্তু পারলোনা। রোমেনা আপাকে লক্ষ্য করে বললো- 'আপা আমার হাত-পা নাড়াতে কষ্ট হচ্ছে, আমার শরীরে এত ব্যথা হচ্ছে কেন'। আমার বুক ফেটে কান্না আসার উপক্রম। আমি ঘর থেকে বেরিয়ে যাই। এশার নামাজের সময় রশিদ ভাই বাড়ি এসে সব শুনলেন। তার সামনেই মধ্যরাতে আবার হুলুস্থুল শুরু হলো। সবাই নিশ্চিত হয়ে গেলেন হাজেরা আর স্বাভাবিক নয়, সে জীনের কন্ট্রোলে চলে গেছে।

পুরো তিন সপ্তাহ ধরে দেশের নামীদামী বড়বড় পীর-ফকির আসলেন। কেউ বললেন বাটিচালান, কেউ বলেলেন যাদু কেউ বললেন বাণ। আলেম-ওলামা আসলেন, হিসার করলেন, ইস্তেখারা করলেন, সপ্নযোগে জীনের সন্ধান নিলেন, বিচিত্র ধরণের হাজার প্রকার তথ্য-তত্ত্ব, তাবিজ-কবচ, ঔষধ-পথ্য দিলেন, হাজেরার কোনো পরিবর্তন নেই। দিনদিন হাজেরার অবস্থার অবনতি হতে থাকলো। একদিন তার বাবা এসে হাজেরাকে তাদের বাড়ি নিয়ে গেলেন। এর পর হাজেরা আমাদের বাড়িতে আর কোনোদিন ফিরে আসেনি।

হাজেরা চলে যাওয়ার পরের দিন রশিদ ভাই তার আত্মীয়দের ডেকে জড় করলেন, হাতে একটুকরো কাগজ। বললেন- ‘এভাবে একটা কচি মেয়েকে শাস্তি দেয়ার কোনো মা'নে হয়না, আমি হাজেরাকে মুক্তি দিতে চাই। যেহেতু এখানে হাজেরার কোনো দোষ নেই, আমি তার কাবিনের ৬ কেদার জমি (বর্তমান মূল্য ৬ কোটি টাকা) ১০ ভরি সোনা, সকল প্রকার অলংকার ও বস্ত্রাদি এবং ডাক্তারি ঔষধ-পথ্য করানোর জন্যে ৫০ হাজার টাকা দিয়ে এই তালাক নামায় দস্তখত করলাম’। বাড়ি ভরা মানুষ কেউ একটু টু শব্দও করলেন না। মসজিদের ইমাম সাহেব বিড়বিড় করে বলেছিলেন- ‘পাগল অবস্তায় বিবি তালাক হয়না’। কেউ তার কথায় কর্ণপাত করলোনা, মাথা নিচু করে, মলিন চেহারায়, সবাই ধীরে ধীরে স্থান ত্যাগ করে চলে গেলেন।

এক সপ্তাহ পরে হাজেরার বাবা আমাদের বাড়ি আসলেন, বোনকে দেখার জন্যে নয়, ভাগিনাকে দু কথা শুনানোর জন্যে। বললেন- ‘আমি তো বাবা তোমার ধনের কাঙ্গাল ছিলাম না, আমার নিরপরাধ মেয়েটাকে তুমি ছেড়ে দিলে। তালাকের সংবাদ শুনে মেয়েটি প্রচুর কেঁদেছে। একসপ্তাহ হলো তার মধ্যে তো কোন অস্বাভাবিক আচরণ দেখলাম না। কোনো প্রকার ডাক্তার কবিরাজও দেখালাম না। একটা সুস্থ সবল মেয়েকে তুমি এভাবে ছেড়ে দিলে’? রশিদ ভাইকে কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে তিনি তরতর করে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলেন।

যেহেতু এটা কোন গল্প নয়, সত্য কাহিনি তাই পাঠকের জন্যে ঘটনার শেষ পরিণতি গলায় আটকিয়ে রেখে লাভ নেই। এর ৭ বৎসর পরে ঠিক রশিদ ভাইয়ের মতই শিক্ষিত প্রবাসী এক হৃদয়বান ব্যক্তির সাথে হাজেরার বিয়ে হয়, এবং ৫ সন্তানের জননী হাজেরা সুখেই বিলেতের কোনো একটি অঞ্চলে বসবাস করছেন।

আমার বড় জানতে ইচ্ছে করে রিফাত, হাজেরাদের এই দুর্গতি কি কোনোদিনই শেষ হবার নয়? জীন-ভুতেরা কেন বারেবারে শুধু মেয়েদেরকেই আক্রমণ করে? সমাজ বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞানে কি এর কোনো ব্যাখ্যা নেই? কামনা করি এমন কাহিনি যেন আর কাউকে কোনদিন নতুন করে লিখতে না হয়।

গল্পের ভিতরে গল্প

ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীতে সর্বোচ্চ মার্ক পেয়ে ক্লাসে প্রথম স্থান অধিকারিণী জিনাতারা বেগম বাৎসরিক পরীক্ষার পর অষ্টম শ্রেণীতে ঢোকার দিন অপূর্ব এক পোশাক পরিধান করে স্কুলে আসলো। ছাত্র-ছাত্রীরা কেউ আড়চোখে তাকালো, কেউ মুখ বন্ধ করে হাসলো। জিনাতারা এমনিতেই ফর্সা রঙ্গের, তার উপর চোখে আধুনিক ফ্রেইমের চশমা। এবার গোলাকার মুখমন্ডল আবৃত হয়েছে গোলাপী কালারের সিল্কি কাপড়ের হিজাব দিয়ে। গলা থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত নাইট গাউনের মতো হালকা বেগুনী রঙের বিলেতি পিচ্ছিল কাপড়ের তৈরি গায়ের বসন। চৈতালি সমীরণ দুষ্টুমী করে, ধানক্ষেতের কচি পাতার দোলা জাগায় তার পিঠের উপর। সে মৃদু বাতাসের ঢেউ টের পায় তার নিতম্বে। জিনাতারার ভাল লাগে। আইডিয়াটা করেছিলেন তার দাদা কাজী আলমদর আলী সাহেব,যে দিন তাকে অত্র স্কুলের গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান বানানো হয়। বিগত দশ বছর যাবত এই স্কুলে কোন জাতীয় দিবস উদযাপন হয়না, ২১শে ফেব্রুয়ারি, ২৬শে মার্চ এবং ১৬ ডিসেম্বর স্কুল বন্ধ থাকে। স্কুলটির নাম শ্রী ভারত চন্দ্র দ্বি-পাক্ষিক উচ্চ বিদ্যালয়। লক্ষীপুর গ্রামের এই স্কুলটি এক কালে প্রচুর সুনাম অর্জন করেছিল। দূরের গ্রামের মানুষেরা এই গ্রামকে গুণীদের গাঁও বলে ডাকতো।

বাৎসরিক পরীক্ষার পর আজ স্কুলের প্রথম দিন। ছাত্র-ছাত্রীরা সকল আসেনি, দু একজন শিক্ষকও অনুপস্থিত। এ দিকে পরীক্ষা হলকে পুনরায় ক্লাসে বিভক্ত করা হয়নি, বেঞ্চ টেবিল জায়গামতো আসেনি, সুতরাং প্রধান শিক্ষক ঘোষণা দিলেন, ক্লাসের দরকার নেই, পরীক্ষা হল যেভাবে আছে সে ভাবেই থাক। সেখানে মিটিংয়ের আয়োজন করা হলো। সহকারী শিক্ষকগণ প্রধান স্যারের নির্দেশানুযায়ী একে একে তাদের বক্তৃতায় ব্যাখ্যা করলেন- 'বিদ্যা অমূল্য ধন', 'শিক্ষাই জাতীর মেরুদন্ড', 'পরিশ্রম উন্নতির সোপান' ইত্যাদি। প্রধান শিক্ষক তার মিটিং সমাপণী ভাষণের পূর্বে জিনাতারাকে

শিক্ষকদের পাশে এসে দাঁড়াতে আদেশ দিলেন। তিনি জিনাতারার মাথায় হাত রেখে ছাত্র ছাত্রীদের উদ্দেশ্য করে বললেন- 'এর নাম কী জানো'? এক সাথে কয়েকজন উচ্চস্বরে উত্তর দিলো 'জ্বীন্নাঁতাঁরা'। স্যার বললেন- 'হ্যাঁ, জিনাতারা। রেজিষ্টারিতে তার নাম জিনাতারা থাকবে, কিন্তু আজ থেকে আমি তার নাম দিলাম 'মুক্তিকন্যা' এটা হবে তার ডাকনাম'। স্যার আবার প্রশ্ন করলেন- 'মুক্তিকন্যা' কেন নাম দিলাম তোমরা কি কেউ ধরতে পেরেছো? কেউ উত্তর দেয়না। সকলকে নিশ্চুপ দেখে, তিন বছর যাবত ক্লাস সিক্সে পড়ে থাকা আবুল পরম দায়ীত্বটা নিল। গ্রীবা উঁচু করে একহাত উপরে তুলে বললো- আমি ধরতে পেরেছি স্যার। স্যার বললেন- কী বুঝেছো, বলো দেখি তার নাম কেন দিলাম 'মুক্তিকন্যা'? আবুল উত্তর দিলো- 'ওর বাপ মনে হয় মুক্তিযোদ্ধা'। হলের ভিতর হাসির মাতম শুরু হয়ে গেল। শিক্ষকরা মুখ বন্ধই করতে পারছেন না। ছাত্র ছাত্রীরা বোকা বনে গেল, বিষয়টা কী? তারা কোনো সমাধান বের করতে না পেরে আবুলকে দোষারুপ করলো আর মৃদু মন্দ গালাগালি করে সবাই চুপ হয়ে গেল।

দিনে দিনে শ্রী ভারত চন্দ্র দ্বি-পাক্ষিক উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের গা থেকে লাল সবুজের ইউনিফর্ম উধাও হতে থাকলো। মায়ের হাতের নিপুণ কারিগরির নিদর্শন কালো চুলের বেণীগুলো হিজাবের শক্ত বন্ধনে অবরোদ্ধ হলো। ক্রমে ক্রমে হিজাবের সংখ্যা বাড়তে থাকলো আর এর সাথে পাল্লা দিয়ে এক নতুন উপদ্রব জন্ম নিলো। ইভ-টিজিং। নবম দশম শ্রেণীর ছাত্রীদের যারা পেটিকোট বা ছায়ার মতো লম্বা স্কার্ট পরে আসতো, তারা একটু বেশি অসুবিধেয় পড়লো। ছেলেরা হিজাবপরা মেয়েদের সামনের দিকে তাকায়না, পেছনের দিকেই তাদের ইন্টারেষ্ট বেশি। স্কুলে আসার পথে ভোরের সূর্যকীরণ যখন মেয়েদের সিল্কি কাপড়ে লুটিয়ে পড়ে, অকারণে বায়ূ যখন জল তরঙ্গের ঢেউ তুলে তাদের পশ্চাদবস্ত্রে, দূর থেকে মনে হয় যেন জলপ্রপাতের পাদদেশে রূপালী ইলিশের নৃত্য। ছেলেরা তখন গেয়ে উঠে- 'দোল-দোল দুলনী' কিংবা 'দুই পাহাড়ের মাঝে মৌলায় মসজিদ বানাইছে'। মেয়েরা বুঝে ও টের পায় এর নাম ইভ টিজিং। মুক্তিকন্যা যখন

দশম শ্রেণীর ছাত্রী তখন একপর্যায়ে অবস্থা সহ্যের বাইরে চলে যায়। সর্বপ্রথম ক্লাস টেনের কয়েকজন ছাত্রী প্রতিবাদী হয়ে উঠলো। এভাবে আর চলতে দেয়া যায়না, এর একটা বিহীত হওয়া চাই। তারা গোপনে দু একটা মিটিং করলো, কিন্তু কোন মিটিংয়েই মুক্তিকন্যা উপস্থিত হলোনা। ২৪শে মার্চ ক্লাস শেষে এক সপ্তাহের জন্য স্কুল বন্ধ হয়ে গেল। মুক্তিকন্যার বিশ্বস্ত বান্ধবী রোখসানা উরফে রুখু তার ঘরে এসে জিজ্ঞেস করলো-

- কী রে, দুই দুইবার দাওয়াত দিলাম তুই মিটিংয়ে আসলিনা কেন?

- সমস্যাটা কী?

- মা'নে? ছেলেগুলো দিন দিন বেপরোয়া হয়ে যাচ্ছে, পথে ঘাটে ছাত্রীদের টিজিং করে তুই দেখছিস না?

- আমাকে তো কেউ করছেনা।

- বলিস কী? কিছুদিন পূর্বে স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে আমাদেরকে দেখে আমাদের সামনেই মুকুল গান করলো- ‘রাধা কিউ গোরি ময় কিউ কালা’। সে তো তোকেই বলছিলো।

- জানি।

- জানিস? জিনাত তোর কি মাথা ঠিক আছে? তোর কী হয়েছে রে, আমাকে খুলে বল তো দেখি।

- তুই আমাকে বিশ্বাস করিস?

- নিশ্চয়ই।

- আমি তার প্রেমে পড়ে গেছি।

- কার? কৃষ্ণকালো মুকুলের? সে'ই তো তোকে বেশি টিজিং করে।

- তাই তো। আমি জানিনা কখন কীভাবে এই কালো ছেলেটার চোখে চোখ পড়েছিল। তার মাথার চুল, হাতের মাসল, দুটো চোখ, তার ঠোঁট- –

- ব্যস, ব্যস ব্যস আর বলতে হবেনা। আমি তো ভাবছিলাম সেদিন ঠাস করে একটা থাপ্পড় দিয়ে আসি তার মুখে।

- তারপরও সে স্কুলে যেতে পারবে।

- অর্থাৎ?

- অর্থাৎ, তোর গালে দাগ পড়লে কয়েকদিন স্কুলে যেতে পারবিনা। বাস্তবকে অস্বীকার করে, অবজ্ঞা করে সমস্যার সমাধান হয়না।

- তো এখন কী করা?

- বিশ্বাস কর রুখু, তাকে এক মিনিটের জন্যেও চোখ থেকে সরাতে পারিনা। তুই আমাকে একটু সাহায্য করবি?

- বল্।

- এক সপ্তাহের জন্য স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে। তুই মুকুলকে শুধু বলবি আমি তাকে ভালবাসি। জীবনে যদি কাউকে বিয়ে করি তাহলে তাকেই করবো। আর বলবি, ২৬ তারিখ আমার বইয়ের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে সে উপস্থাপনা করবে।

- বাহ বাহ বাহ। একটা কথা বলি জিনাত মাইন্ড করিস না। ইভ টিজিং সমস্যার সমাধান করার জন্যে, তুই কি মনে করিস আমরা সবাই একে একে এক একটা ছেলের প্রেমে পড়ে যাই?

- আমাকে ভুল বুঝলি রুখু। এর সাথে ইভ টিজিং সমাধানের কোনো সম্পর্ক নেই। মুকুল যে কেমন বেপরোয়া ছেলে, সকলে তাকে সমীহ করে চলে, তা তো দেখেছিস। ছুটির পর স্কুল যখন খুলবে, মুকুলকে তোদের মিটিংয়ে নিয়ে আসার চেষ্টা করবি, আমিও যাবো। মুকুল যদি কোনো ছেলেকে বলে, মেয়েদের দিকে তাকালে চোখ খুলে ফেলবো তাহলে সেই ছেলে বিশ্বাস করবে সত্যিই ঘটনা খারাপ।

- এটা কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা হলো, নাকি পুরুষের কাছে নারীর নতজানু–

- দেখ রুখু, এতোসব ক্যাচাল প্যাচাল বুঝিনারে বোন, সমাধানটাই তো সকলের কাম্য, এখানে জয় পরাজয়ের কী আছে?

- -আচ্ছা মুকুল যদি তোর প্রস্তাব রিজেক্ট করে?

- তুই এখন যা তো, আমার মাথা ব্যাথা করছে, আমি একটু ঘুমাবো।

আজ ২৬শে মার্চ। গ্রামের পাঠশালা, মক্তব-মাদ্রাসা, হাই স্কুল সব বন্ধ। আজকের দিনের আবহাওয়া কেমন হবে সেই ভাবনায় গতরাতে কাজী সাহেবের ভাল ঘুম হয়নি। মাথা ব্যাথা করার কথা ছিল কিন্তু করছেনা। এতো সুন্দর সকাল হবে ভাবতেই পারেন নি। উঠোনে নাতনী জিনাতারাকে দেখে গালভরা হাসি দিয়ে বললেন-

- কি দাদু, তোমার কি মাথায় ঠান্ডা লাগলো? গত রাতেও তোমার মাথাব্যাথা হয়েছিল। তুমি ঘুমিয়ে গিয়েছিলে আমি তোমার মাথায় একটা ফু দিলাম।

- একসাথে পুরো দুটো প্যারাসিটেমল খেয়ে ঘুমিয়েছিলাম, আপনি কোন্ সময় ফু দিয়েছিলেন টের পাইনি।

- তোমার গলার স্বরে তো মনে হয় সর্দিও আছে। মাথা ভারী ভারী লাগছে?

- না, তেমন কিছু না, আমি ভালই আছি।

- দেখলে দাদু, গতরাতের রেডিও খবরে বলা হলো, 'আগামীকাল দেশের ওপর দিয়ে ক্ষণেক্ষণে হালকা ধমকাহাওয়া বইবে ও গুড়িগুড়ি বৃষ্টি হবে'। দেখো আকাশে মেঘের কোনো লক্ষণই নেই। Morning Shows the Day ঠিক না?

- আমাদের এখানে হচ্ছেনা, অন্য কোথাও হতে পারে। খবরে কিন্তু 'বইবে' 'হইবে' বলেনা, বলে 'হতে পারে' 'সম্ভাবনা আছে'।

কাজী সাহেব কথা না বাড়িয়ে পুকুরের পূর্ব পাড়ে এসে পশ্চিমমুখী হয়ে দাঁড়ালেন। বিশাল এই বাড়িটিতে ৩০ বছর আগে ৭টি পরিবার বাস করতো। তিনটি ঘাটে দল বেঁধে মেয়েরা স্নান করতো, দুই ভাগে ছেলেরা উঠোনে বল আর মেয়েরা গোল্লাছুট খেলতো। নারী পুরুষ, শিশু-কিশোর মিলিয়ে এক সময় বাড়িতে ৩৬ জন মানুষ ছিল। অর্ধ ইঞ্চি জায়গার জন্যে সুনা মিয়া আর ধলা মিয়া দুই ভাই মারামারি করে হাসপাতাল গেলো। এখন এই ঘর, বাড়ি, বাড়ির গাছ-বিছালি, ফল-মুল কোনোকিছুর মালিকানা দাবি করার মতো কেউ নেই। ইংল্যান্ড যারা গিয়েছিলেন তাদের চতুর্থ প্রজন্ম

বাংলাদেশকেই ভুলে গেছে। যে দুই পরিবার ঢাকা ও সিলেটে স্থায়ী বসতি গড়েছেন, তারা ঈদে পর্বেও গ্রামে আসেন না। আজ বহু বছর যাবত কাজী আলমদর আলী ৬ কেদার জমি নিয়ে তৈরি এই বাড়ির অলিখিত একচ্ছত্র মালিক। এক সময় বাড়ির চতুর্পার্শ্বে নৌকা চলাচলের জন্যে খাল ছিল, বর্ষাকালে ছেলে-মেয়েরা সারিবদ্ধ হয়ে জাল দিয়ে বড়শী দিয়ে মাছ ধরতো, এখন সবটুকুই পাকা রাস্তা। পশ্চিমের বড় ঘরের সন্মুখ থেকে উঠোন হয়ে পুবের বাংলা ঘরের মধ্য দিয়ে পুকুরের দক্ষিণ পাড় বেয়ে গাঁয়ের মূল সড়ক পর্যন্ত পিচঢালা পথ। আলমদর আলী সাহেব তার নাতনীকে কাছে ডেকে এনে বললেন-

- বুঝলি জিনাত, আজকের দিনটি এই গ্রামের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।
- দাদু, বইয়ের মোড়ক উম্মোচন অনুষ্ঠানে উপস্থাপনা ও আমার একটি ছড়া আবৃতি করার জন্যে আমার সহপাঠি এক বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করেছি, ঠিক আছে?
- অবশ্যই অবশ্যই। আচ্ছা দেখো, কেমন পরিষ্কার রাস্তা, কোথাও মরা একটি আমের পাতাও অযতনে পড়ে রয়নি। মনুর মা সযতনে সব সরিয়ে রেখেছে।
- বাগানবাড়ির ফিনিশিং টাচটা তো দেখেন নি দাদু। এক সপ্তাহ ধরে আব্বু, মনু, মনুর মা আর ঐ পেইন্টার মিলে বাড়িটাকে একদম, কী বলবো- –
- তাজমহল, স্বর্গোদ্যান?
- বেটা পেইন্টার একজন ভাল দক্ষ আর্টিষ্টও। উঠোনে যে প্যান্ডোল বাঁধা হয়েছে তার নিচে এক হাজার মানুষের বসার জায়গা হবে। ইশ্, আজ যদি ইংল্যান্ডের বড় চাচা, মেজো চাচা ভাই বোনদের নিয়ে উপস্থিত থাকতেন, কতই না সুন্দর হতো। এই বাড়িতেই থাকার মানুষ নাই, বাগান বাড়ি খামোখাই বানিয়ে রেখেছেন দাদু। কি বড় বড় আম গাছ, কাঁঠাল গাছ, কলা বাগান, লিচু সব বাঁদুড় আর কাঠবিড়ালীর পেটে যায়।

- আজ যদি বাগান বাড়ি বিক্রীর নাম ধরি, দাম কতো টাকা হবে জানো? পাঁচ কোটি তো কোনো কথাই নেই। তুমি রেডি হয়ে থেকো, আমরা ঠিক সোয়া দশটায় বাগান বাড়ি যাবো, কেমন?

কাজী সাহেব বাংলা ঘরে এসে পত্রিকার বিজ্ঞাপনটা আবার পড়লেন। দিনের সময় সূচী অনুযায়ী, সকাল সাড়ে দশটা থেকে দুপুর বারোটা পর্যন্ত জাকাত ও কাফফারার টাকা এবং শাড়ি বিতরণ। ১ টা থেকে তিনটা পর্যন্ত জিনাতারার ছড়া বইয়ের মোড়ক উন্মোচন। সাড়ে তিনটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত কাঙ্গালী ভোজ। সন্ধ্যা ছয়টা থেকে আটটা পর্যন্ত বিশেষ অতিথিদের সাথে নৈশভোজন। মনু এসে খবর দিল, বাগান বাড়িতে লোক এসে গেছে, অনেক মানুষকে গেইটের বাইরে লাইন ধরায়ে রাখা হয়েছে, আরো মানুষ আসছে। কাজী সাহেব বাংলা ঘরের ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ালেন। এখান থেকে বাগানবাড়ি দেখা যায়। কাজী সাহেবের বাড়ির সামনে পাকা সড়ক, তারপর ছোট্ট একটি মাঠ, মাঠের পূর্বধারে সুমতি নদী। তারপর অনাবাদি কিছু জায়গা, থোকা থোকা বেতের ঝোপ, এর পর বাগানবাড়ি, আর বাগানবাড়ির ঠিক দক্ষিণ পাশেই ভারত চন্দ্র হাই স্কুল। দূরদর্শনের চশমাটা চোখে লাগিয়ে কাজী সাহেব বাগানবাড়ির দিকে তাকালেন। দেখলেন, এ তো সেই একাত্তরের ছবি। মনে পড়ে এভাবেই সে দিন ঘটি-বাটি, গাট্টি-বোচকা করে মানুষের বাচ্চা মুরগীর বাচ্চা এক খাঁচায় ভরে, কেউ মাথায় আর কেউ কাঁধে করে গ্রাম ছেড়ে ছুটে চলেছিল যে যেদিকে পারে। কাজী সাহেব মনে মনে ভাবেন, কিন্তু এ তো উলটো হচ্ছে, এ যেন দেশ ত্যাগীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন। হায়রে দেশ তোর এই অবস্থা? পিঁপড়া যেমন মরা ফড়িংযের গন্ধ পেলে সারিসারি দল বেঁধে বের হয়ে আসে, মানুষও টাকার গন্ধ পেলে তেমনি কবর থেকে বের হয়ে আসে। বাংলাদেশের ১৪ কোটি মানুষ, সবাই কি এক দিনের জন্যে ফকির হয়ে গেল?

বাগানবাড়ি যাওয়ার পথে জিনাত বললো- ‘দাদু, আপনার বক্তৃতায় সিলেটি ভাষা আর সাধু-চলিত ভাষার খিচুড়ী চলবেনা। আর আলোচনা সভার সভাপতি দিয়েছি আপনাকে,

প্রধান অতিথি সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, বিশেষ অতিথি কুমার পাড়া ইউনিয়নের নব নির্বাচিত চেয়ারম্যান ও আমাদের স্কুলের প্রধান শিক্ষক। অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করবে স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র মুকুল'। বাগানবাড়ি এসে কাজী সাহেব লক্ষ্য করলেন, থানার টি এন ও সাহেব কথা মতো সময়ের আগেই এক ডজন পুলিশ পাঠিয়ে দিয়েছেন। পুলিশের উপস্থিতে কোনো প্রকারের হৈচৈ গন্ডগোল নেই। সু সৃংখল সারিবদ্ধভাবে সবাই শুভক্ষণের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে।

জাকাত, কাফফারার টাকা ও শাড়ি বিতরণ পর্ব শুরু হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই আকাশের চেহারায় বিষন্নতার ভাব দেখা দিল। কাঙ্গালেরা বৃষ্টি না হওয়ার জন্যে আকাশের দিকে হাত তুললো আর কৃষকেরা বৃষ্টি হওয়ার জন্যে দোয়া করলো। আকাশের বিধাতা মধ্যপন্থা অবলম্বন করলেন। বৃষ্টি হলো কিন্তু মাটি ভিজলোনা। দক্ষ ব্যবস্থাপকবৃন্দের ও প্রশাসনের সহযোগীতায় আশাতীত শান্তিপূর্ণ পরিবেশে যথাসময়ে প্রথম দুই পর্ব শেষ হলো। আলোচনা সভায় স্কুলের দু একজন ছাত্র মুক্তিকন্যার ছড়া আবৃতি করলো ও মেধার প্রশংসা করলো, তার সুন্দর উজ্জ্বল ভবিষ্যত কামনা করলো। বাকি প্রায় সকল বক্তাই তাদের বক্তৃতার মাধ্যমে, স্বাধীনতার এতো দিন পরে মানুষ কী পেলো, মুক্তিযুদ্ধের ফসল কার ঘরে উঠলো, আর বর্তমান ও অতীত সকল সরকারের ব্যর্থতার বিস্তারিত নমুনা উপস্থিত জনতার সামনে তুলে ধরলেন। আবহাওয়ার অবস্থা ভাল নয় দেখে বিশেষ অতিথিদের সাথে নৈশভোজনও এক ঘন্টা আগে শুরু করা হলো। রাত আটটায় ভোজন পর্বের শেষ পর্যায়ে মনু এসে সংবাদ দিল একজন মেহমান জিনাতের বাবার সাথে দেখা করতে চান, তিনি ঘাটপাড়ে দাঁড়িয়ে আছেন। জিনাতের বাবা আহমদ আলী ঘাটপাড়ে এসে মেহমানকে চিনতে পারলেন না, বললেন-

- বেয়াদবি ক্ষমা করবেন, আমি আপনাকে তো চিনতে পারলাম না।

- বহুদিন, প্রায় পাঁচ ছয় বৎসর পূর্বে একবার দেখা হয়েছিল।

- কোথায়?

- ভারত চন্দ্র আই হসপিটাল এন্ড চিল্ড্রেন ক্লিনিক, মাচুয়া বাজার, কলকাতা, ওয়েষ্ট বেঙ্গল, মনে পড়েছে? আমি সেই হসপিটেলের সার্জন, ডঃ সুধীর চন্দ্র দেব।

- ডাক্তার বাবু! আরে এখানে দাঁড়িয়ে কেনো, ঘরে আসুন ঘরে আসুন। এখানে কীভাবে, কোথা থেকে?

- না ঘরে যাচ্ছিনা। গাড়িতে ড্রাইভার অপেক্ষা করছে। রাণীগঞ্জ গ্রামে আমার একমাত্র জীবিত পিসিমা ৮৫ বছর বয়সে আমাকে শেষ দেখা দেখতে চান বলে ডেকে পাঠালেন। এখানে এসে আপনাদের অনুষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দেখলাম। দিনের বেলা আলোচনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলাম। মেয়েটা বেশ বড় হয়ে গেছে মোটেই চিনতে পারিনি। রাতে ফেরার পথে এদিকেই যখন যাবো, ভাবলাম কাজী সাহেবের সাথে দেখা করে যাই। আপনার সাথে অবশ্য এর আগেও দেখা হয়েছে অনেক বার বাল্যকালে।

- কোথায়?

- এই বাড়িতে।

- ডাক্তার বাবু আপনি ঘরে আসুন, বাবার সাথে পরিচয় করিয়ে দিই। জিনাতকে না দেখে যেতে পারবেন না, সে আপনাকে দেখলে ভারী খুশি হবে।

ঘরে যাওয়ার প্রয়োজন হলোনা, কাজী সাহেব ছেলের কাছে এসে বললেন- ‘তুমি একটু ঘরে যাও তো বাবা, অতিথিবৃন্দ বিদায় নেয়ার জন্যে তোমার অপেক্ষায় আছেন’। আহমদ আলী চলে যাওয়ার পর কাজী সাহেব বললেন- ‘মেহমানকে চিনলাম না যে’? আগন্তক উত্তর দিলেন- ‘সুধীর চন্দ্র দেব, পিতা নবীণ চন্দ্র দেব, পিতামহ শ্রী ভারত চন্দ্র দেব’? মুহুর্তে কাজী সাহেবের বড় বড় চোখ দুটো জ্বলন্ত অগ্নিপ্রস্তরের আকার ধারণ করলো। তিনি মেরুদন্ড সোজা করে ক্রোধান্বিত ফনা তুলা কালনাগের মতো চেহারায় সুধীর বাবুর মুখোমূখি দাঁড়ালেন। বললেন-

- এখানে কী চাও সুধীর?

- কিছু ফেরত নিতে আসিনি কাজী সাহেব। একদিন দশ হাজার টাকা বন্ধকের বাড়িটা আমার বাবা বিশ হাজার টাকা দিয়ে ফেরত নিতে এসেছিলেন। এখন বাড়িটার দাম–

- সুধীর, তুমি সেচ্ছায় বেরিয়ে যাবে, না আমি–

- এর কোন প্রয়োজন হবেনা কাজী সাহেব। বাড়ি ফেরত নিতে আসিনি, শুধু একটা কথা বলতে এসেছি। আপনি বক্তৃতায় বারবার বলেছিলেন- 'দেশ স্বাধীন করে কী পেল এ দেশের মানুষ'? জনাব কাজী আলমদর আলী সাহেব, একাত্তুরে শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান আজ হাই স্কুলের গভর্ণিং বডির চেয়ারম্যান। এ দেশ থেকে আর কী চান?

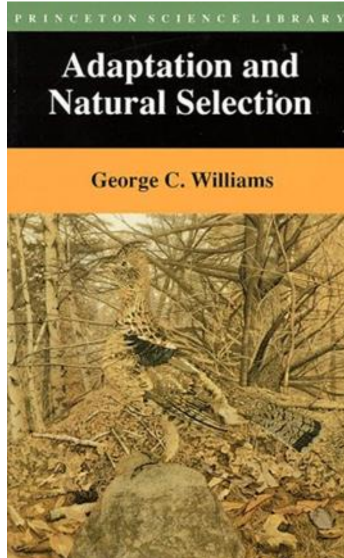
ঠিক তখনই আকাশ ভেঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি নেমে আসলো। দৃষ্টি সীমানায় যতক্ষণ সুধীর বাবুর গাড়ি দেখা যায়, ঝড় বৃষ্টি উপেক্ষা করে কাজী সাহেব ততক্ষণ ঘাটপাড়ে স্থির দাঁড়িয়ে রইলেন।

বিবর্তনের বাঁকে বাঁকে

‘যে ব্যক্তি তার মেধা, বুদ্ধিবৃত্তিক অর্জন ও বাগ্মিতাকে কুসংস্কার ও মিথ্যার পদতলে বলি দিয়ে বৌদ্ধিক বেশ্যাবৃত্তি করে, তার উত্তরসুরী না হয়ে আমি বরং সেইসব নিরীহ প্রাণীদের উত্তরসুরী হতে চাইবো যারা গাছে গাছে বাস করে,
যারা কিচিরমিচির করে ডাল থেকে ডালে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ায়।’
- হাক্সলি (Thomas Henry Huxley)

বড়দিন ও নববর্ষ উৎসবে যেটুকু আনন্দ উল্লাস বউ মিস করেন তার সবটুকু পুশিয়ে নেন ঈদ উৎসবে। ক্রিসমাসে ঘরের আলোকসজ্বা থেকে সকল আয়োজনের দায়ীত্বে থাকে ছেলে মেয়েরা, মিউজিক টেলিভিশন থাকে তাদের দখলে আর বউ থাকেন নীরব দর্শক। ঈদে হয় ঠিক তার উলটো। সবকিছু হয় বউয়ের প্লান পছন্দ মোতাবেক। বাঙ্গালীর ঘরে বাংলাদেশের রাজনীতির আবহ থাকবে এটাই স্বাভাবিক। এখানে বউ প্রধানমন্ত্রী (একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী) স্বামী ঠুটো জগন্নাথ প্রেসিডেন্ট (সিগনেচারের মালিক) আর সন্তানেরা পাবলিক (রাষ্ট্রের উৎস)। গত ঈদটা একটু ব্যতিক্রমী ছিল। এতদিন মেয়েরা ঈদের দিনে সেলোয়ার কামিজ পরতো, গত ঈদে বউ আইন পাশ করলেন, এবার সবাই পরবে শাড়ি। তার বাঙ্গালী সনদ অনুযায়ী মেয়েরা শাড়ি পরার যোগ্য হয়ে গেছে। উপর তলায় বেডরুমে শাড়ি পরার রিহার্সেল হলো। শাড়ি পরা নাকি জগতের সব চেয়ে কঠিন শৈল্পিক বৌদ্ধিক কর্ম। শাড়ি পরে মেয়ে তিনটি সিড়ি বেয়ে নিচে আসার পথে এক পর্যায়ে আমাকে লক্ষ্য করে তাদের নানী বললেন, ‘দেখো যেন আসমান থেকে এক একটা চাঁদ নেমে আসছে’। আমি বললাম, হ্যাঁ মানুষ আসমান থেকে এসেছে, বিজ্ঞানীরা সেটাই আজ ভাবছেন। ‘আরে বাবা, বিজ্ঞানীরা ভাবছেন আজ, আর আমাদের রাসুল জানতেন দেড় হাজার বছর আগেই’। পঁচাত্তর বছর বয়েসী আমার শাশুড়ীর সরলোক্তি। আমি আর কথা বাড়ালাম না। তিনি যখন তার চাঁদের হাট নিয়ে

ব্যস্ত আমি তখন ভাবছি, এই যে সঙ্গবদ্ধ পরিবার, এই পারিবারিক নিয়ম রীতি, শৃংখলা বিশৃংখলা, হাসি কান্না, বিরহ বিচ্ছেদ, সুখ দুঃখ, মায়া ভালবাসা, প্রেম যাতনা, হিংসা বিদ্বেষ, ধর্ম বিশ্বাস এ সব আমাদের পূর্বপুরুষের মাঝেও কি ছিল? কেমন ছিল তাদের জীবনধারা, তাদের জীবনপদ্ধতি? জীবজগতে অন্যান্য প্রাণীদের মাঝেও কি এ সব দেখা যায়? এই সম্পদ দখলদারিত্ব, অধিকার-বঞ্চণা, শাসন-শোষণ, ব্যবসা-বানিজ্য, লেনদেন-চুক্তি, ধিক্কার-পুরুষ্কার, দান-প্রতিদান, লজ্বা-শরম এ সকল শব্দগুলোর উৎপত্তি কোন সময় থেকে? এমন আজগুবি চিন্তা, আনাড়ি প্রশ্ন আমার মাথায় খেলতো ছোটকাল থেকেই। উত্তর জানতাম না, জানার সুযোগ ছিলনা। এখন যতটুকু জেনেছি, দেখেছি, পড়েছি তাতে আমি নিশ্চিত মানুষ আর পশুদের মধ্যে জীবনাচরণগত পার্থক্য খুবই সামান্য। যারা রিচার্ড ডকিন্সের The Selfish Gene কিংবা জর্জ উইলিয়ামসের Adaptation and Natural Selection বই দুটো পড়েছেন, তারা আশা করি একমত হবেন যে, মানুষের প্রায় সকল দোষাবলি, গুণাবলি, বৈশিষ্টাবলি পশুদের মাঝেও বিদ্যমান আছে।



পশুদের মাঝেও সঙ্গবদ্ধ পরিবার, পারিবারিক নিয়ম-শৃংখলা, মায়া-ভালবাসা, প্রেম-অনুভুতি, মালিকানা-দখলদারিত্ব, হিংসা-ঝগড়া, ত্যাগ-ভক্তি, প্রতারণা-ধোকাবাজি, পরকিয়া, বহুগামিতা, সমকামিতা, রূপচর্চা, সেন্স অফ বিউটি, সেবা-যত্ন, নার্সিং, হেল্পিং, ফস্টারিং, চাতুরি-ছলনা, অন্নহীনকে অন্ন দান, পঙ্গুদের ঘরে বসায়ে খাওয়ানো, অন্ধকে পথ দেখানো সবই আছে। এ সবই যখন আছে তাহলে ইমোশন বা আবেগ, আর মোরালিটি বা নৈতিকতা বাকি রইলো কোথায়? না, বাকি নেই। পশুর মাঝে ইমোশন, মোরালিটি? বলির পশু বুঝে ভুতেশ্বরের নামে তার গলা কাটা অন্যায়? কোরবানির গরু টের পায় মানুষ কেমন অসুর? এসব শুনলে অনেকের চোখ উপরে উঠারই কথা। 'আবেগ' আর 'নৈতিকতা' এ দুটো গুন জন্মগতভাবেই মানুষের দখলে তা আমরা জেনে এসেছি বহুকাল যাবত। কিন্তু আজিকার জীববিজ্ঞানীরা তা আর মানছেন না। তারা বলছেন, পশুর মধ্যেও নৈতিকতা আর আবেগ আছে। ডারউইন সাহেব তো এক কদম আগ বাড়িয়ে বলেই দিয়েছেন যে, নৈতিকতা আসলে পশুর কাছ থেকেই মানুষ শিখে নিয়েছে। কি সর্বনাশা কথা! ঈশ্বর তার বাড়ির উঠোনে আদমকে চিৎ করায়ে শুইয়ে বছরের পর বছর সকাল বিকাল নৈতিকতা শিখালো, সাথে একগাদা বই বগলে দিয়ে দুনিয়ায় পাঠালো, আর এখন কি না বলা হয় মানুষ নৈতিকতা শিখেছে পশুর কাছ থেকে। তবে ডারউইন ঠিক 'পশুর কাছ থেকে মানুষ নৈতিকতা শিখেছে' বলেন নি, বলেছেন 'বিবর্তনের মাধ্যমে আমাদের পূর্ব পুরুষ (animal ancestors) থেকে পেয়েছি'। আর যদি বলাই হয় যে, মানুষ পশুর কাছ থেকে শিখেছে তাহলে ভুল কি বলা হবে? কারণ পশু যে, আদমের আগে পৃথিবীতে এসেছে তা তো সকল ধর্মগ্রন্থই স্বীকার করে। বুঝা গেল 'নৈতিকতা' 'একটা চাবি মাইরা দিছে ছাইড়া, জনম ভইরা চলিতেছে' এ রকম কিছু নয়, ওটা ধীরে ধীরে বেড়েছে বিবর্তন প্রক্রীয়ায়, আগে থেকে মানুষের মগজে ডিজাইন করা ছিলনা। Marc Bekoff এর 'Wild Justice and Moral Intelligence in Animals' আর Charles Darwin এর 'The Descent of Man' বই দুটোতে এ বিষয়ের উপর সুন্দর সুন্দর প্রচুর উদাহরণ ও প্রমাণ উপস্থাপন

করা হয়েছে। উৎসাহী পাঠক এ ব্যাপারে সেখান থেকে জেনে নিতে পারেন। তাহলে পার্থক্য কি একেবারেই নেই? মান-সম্মান, জ্ঞান-বুদ্ধিতে মানুষ আর জানোয়ার সমান সমান? পশুর মত বাচ্চা প্রসব, রিপ্রোডাকশন, মৃত্যুর আগে নিজের বংশ রেখে যাওয়া, নিজের জিন বিস্তার করা ছাড়া মানুষেরও জীবনের আর কোন লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নেই? সেই কথা বলার জন্যেই আজকের এই লেখা।

প্রকৃতি যে, বিরাট শিশুর আনমনে সৃষ্টি ও ধ্বংসের খেলায় মত্ত আছে, আমরা মানুষ সহ সকল জীবেরা তার সেই খেলার পুতুল ছাড়া আর কিছু নয়। সেই খেলা চলে আসছে সময়ের বা সৃষ্টির সুচনালগ্ন থেকে। নুতনের সৃষ্টি, পুরাতনের ধ্বংস এই তার খেলা এই তার লীলা, এই তার নিয়ম। সে পুরাতনকে ধ্বংস করে নুতনদের জায়গা করে দিবে, তার কাছে পুরাতনের ভালবাসা, কান্না, আবেগের কোন মূল্য নেই। সাগর পাড়ের চিৎকারে সাগরের ঢেউয়ের কিচ্ছু আসে যায় না। প্রকৃতির এই পাগলপনা খেলায় ভুল হয়, মিসটেইক হয়, সকলকে সমান ভাবে একই নিয়মে সৃষ্টি করেনা, বড়ই বিশৃংখল তার ডিজাইন তার ম্যাকানিজম। তার খেলা সে খেলছে নিজের ইচ্ছে মত, সে কারো পরোয়া করেনা। কেউ দূর্বল, কেউ সবল, কেউ সুন্দর কেউ কুৎসিত, কেউ ছোট, কেউ বড়, প্রকৃতির পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ায়ে যে চলতে পারবে সে ই ঠিকবে অন্যরা বিলুপ্ত হয়ে যাবে, এ নিয়ে সে মোটেই চিন্তিত নয়। সৃষ্ট জীবেরা প্রকৃতির এই হেয়ালীপনা, তার পাগলপনা নিয়ম-কানুন মেনে চলেছে জীবের জন্মলগ্ন থেকে। এটাই পশুদের ধর্ম, মানুষের ধর্মও ছিল তাই। জীবজগতের সদস্যপদে মানুষের নাম উঠেছিল প্রাণের উৎপত্তির অনেক পরে। মানুষও অন্যান্য জীবের মত প্রকৃতির সেই নিয়ম মেনে চলেছিল হাজার লক্ষ বছর যাবত। 'জন্ম, রিপ্রোডাকশন, মৃত্যু' এ ছাড়া জীবনের আর কোন লক্ষ্য আর কোন উদ্দেশ্য নেই। গুহাযুগ, প্রস্তরযুগ, শিকারযুগ এভাবে ধাপে ধাপে মানুষ যখন কৃষিভিত্তিকযুগে এসে পৌছিল তখন থেকে মানব জগত অন্যান্য প্রাণীর জীবনধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। তাহলে নিশ্চয়ই এর পেছনে কোন কাহিনি আছে।

কাহিনি শুরু হয়েছিল প্রকৃতির সৃষ্ট মানব প্রজাতির নারী-পুরুষের দৈহিক কাঠামোর তারতম্যের কারণে। সে কথা পরে হবে, তার আগে মানব জীবনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা যাক।

বলা হয় সন্তান নাকি মা বাবার ভালবাসার ফসল। ভালবাসা জিনিসটা কী? মানুষ ভালবাসার সংজ্ঞা সন্ধান করে আসছে বহু যুগ পূর্ব থেকে। এর সঠিক উত্তর বোধ হয় রবীন্দ্রনাথও জানতেন না, তিনি লিখেছেন-

সখী, ভাবনা কাহারে বলে। সখী, যাতনা কাহারে বলে ।
তোমরা যে বলো দিবস-রজনী 'ভালোবাসা' 'ভালোবাসা'-
সখী, ভালোবাসা কারে কয়! সে কি কেবলই যাতনাময়।।

আমরা মনে করি, ভালবাসা কী জিনিস তা অনেকেই জানি। না, আমরা জানিনা। আর জানিনা বলেই আমাদের মাঝে অন্য আরেকটি বিষয়ের জন্ম দিয়েছি। Jealousy ঈর্ষা। নিজের সম্পর্কে জানা, অপরকে বুঝা ও বিশেষ করে মানুষের সাথে সম্পর্ক গড়ার ক্ষেত্রে ঈর্ষার প্রভাব অনস্বীকার্য। যে মুহুর্তে আপনি কাউকে ভালবেসেছেন, সেই মুহূর্ত থেকেই ঐ মানুষটির অকালমৃত্যু হয়ে গেছে। এক প্রকার অধিকার Monopoly বা দখলদারিত্ব Possessiveness কিংবা অন্যভাবে বললে জীবের স্বাধীনতা হরণ করে নেয়ার অপর নাম ভালবাসা। মানুষ ভালবাসা বলতে সেটাই বুঝায়, সেটাই মিন করে। শুনতে আজব লাগেনা? লাগারই কথা। আমরা যুগ যুগ ধরে ভালবাসা শব্দটির ভুল অর্থ করে আসছি, ভুল বুঝেছি তাই এখন 'ভালবাসা' থেকে 'ঈর্ষা' শব্দকে আলাদা করতে পারিনা, সেই পথ আমরা বন্ধ করে দিয়েছি। তাত্বিক অর্থে শব্দ দূটো মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। একটা উদাহরণ দেয়া যাক। আপনি যখন আপনার পছন্দের একজন সুন্দরী নারীকে বললেন- 'আমি তোমায় মনে প্রাণে ভালবাসি' এর অর্থটা কী দাঁড়ালো? আপনি চান এই নারী শুধুই আপনার হয়ে থাকুক, একে যেন আর কেউ

ভালবাসেনা। অন্যভাবে বলা যায়, যেহেতু আপনি এই নারীর ভালবাসা কামনা করেন তাই সে যেন অন্য কাউকে ভালবাসেনা। ভালবাসার নামে আপনি তার উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চান, তার স্বাধীনতা বা অধিকার কেড়ে নিতে চান। আপনি চান না এই মেয়েটিকে অন্য কেউ ভালবাসুক, আপনি চান না এই মেয়েটি অন্য কাউকে ভালবাসুক। এরই নাম ঈর্ষা। এই ঈর্ষার বশবর্তি হয়ে আপনি আপনার ভালবাসার মেয়েটিকে খুনও করতে পারেন। তাহলে ভালবাসার অর্থটা কী দাঁড়ালো? এই ভালবাসা পশু জগতে নেই, আমাদের পূর্বপুরুষদের মাঝেও ছিলনা। পশুর ধর্ম হলো; ক্ষিদে পেয়েছে, খাদ্যের সন্ধানে বের হও। খাদ্য আহরণ করে পেট পুরে খাও তারপর বিশ্রাম করো, লম্বা একটা সুখ নিদ্রা, কিছুটা কুলাকুলি, কিছুটা আনন্দ, যতক্ষণ পর্যন্ত না আবার ক্ষিধে পেয়েছে। রোজ আনি রোজ খাই, সঞ্চয়ের দরকার নেই, বেংক ব্যালেন্স বাড়ানোর দরকার নেই, নেই কোন লেন-দেন, কোন লাভ-মুনাফার চুক্তি বন্ধন। দূর্ভিক্ষের দিনে, সংকট সময়ে মাল গুদামজাত করে, ষ্টোক করে অন্যের ভোগান্তি সৃষ্টিরও চিন্তা নেই। প্রাণের উৎপত্তিকাল থেকে পশুরা এই ধর্ম মেনে চলে আসছে, আমাদের পূর্বপুরুষদের ধর্মও ছিল তাই। এখন আমরা আমাদের ভালবাসা প্রকাশ করি এভাবে-

কইলজার ভিতর বাইন্ধা রাখুম তোয়ারে
ছিনার লগে বাইন্ধা রাখুম তোয়ারে, ও ননাইরে।।

কেউ বাঁধে কলিজায় কেউ বাঁধে ছিনায়,কেউ বাঁধে মাথার কেশ দিয়ে,কেউ শাড়ির আঁচল দিয়ে কেউ চুলের বেণী দিয়ে। এই বাঁধা-বাঁধি পশু জগতে নেই,আমাদের পূর্বপূরুষদের মাঝেও ছিলনা। আরেকটা উদাহরণ হতে পারে এমন;আপনার প্রীয় ব্যক্তিটি,নির্দিষ্টভাবে আপনার প্রেমিকা বা স্ত্রীকে পরপুরুষের সাথে মেলেমেশা বা চলাফেরা করতে দেখলে, স্বাভাবিকভাবেই আপনি ঈর্ষান্বিত হবেন, দুঃখ পাবেন। কিন্তু এতে যদি আপনার ঈর্ষা না হয়, যদি এতে আপনি ক্ষুব্ধ না হন তাহলেও সমস্যা আছে। আপনি মনে করবেন, আপনি তাকে ভালবাসেন না, আপনার উচিৎ ছিল ঈর্ষান্বিত হওয়া, গোস্বা করা, রক্তচক্ষু

দেখানো। এ ভাবেই ‘ভালবাসা’ আর ‘ঈর্ষা’ একে অন্যের সাথে অতঃপ্রতভাবে জড়িয়ে গেছে। ঈর্ষামিশ্রিত ভালবাসা প্রকৃত ভালবাসা হতে পারেনা।

যুগ যুগ ধরে মানব সমাজে এই ঈর্ষামিশ্রিত ভালবাসার শেষ পরিণতি হল ‘বিবাহ পদ্ধতি’। ভেঙ্গে পড়ার, চুরি হওয়ার বা হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাময় জিনিসের ইনসুরেন্স, সিকিউরিটি বা গ্যারান্টির প্রয়োজন পড়ে। ঠুনকো ভালবাসা এতই নড়বড়ে যে, তাকে আর বিশ্বাস করা যাচ্ছে না। এই আছে তো এই নেই, সুতরাং একে শেকল পরাতে হবে, শক্ত করে বেঁধে রাখতে হবে। কেশের চেয়েও শক্ত বাঁধন, লোহার চেয়েও শক্ত বেড়ি অর্থাৎ এখান থেকে ভালবাসাকে শেকল পরানো যুগের সুচনা। তারপর আগামী দিনের কথা, ভবিষ্যত জীবনের সুখ শান্তির কথাও তো চিন্তা করতে হয়। আপনি এখন যুবক, কাল বৃদ্ধ হবেন, সেই বৃদ্ধ বয়সের প্রয়োজনকালে আপনার স্ত্রী যেন পাশে থাকেন এমন একটা গ্যারান্টি বা নিশ্চয়তা আপনি চান। ভালবাসার মানুষটি যেন শুধুই আপনাকে সারা জীবন ভালবাসে এই গ্যারান্টি পেতে হলে কিছু লেনদেন, কিছু চুক্তি কিছু সমঝোতা তো করতেই হয়। বলার অপেক্ষা রাখেনা- চুক্তি, লেনদেন আর সমঝোতা যেখানে সমস্যাও সেখানে। সিকিউরড ভবিষ্যত বা আগামী দিনের নিশ্চয়তার জন্যে একটা সিষ্টেমের দরকার পড়লো। সেই সিষ্টেমের নাম দেয়া হল ‘বিয়ে’। বলা বাহুল্য এর পেছনে নারীর কোন হাত ছিলনা, আইডিয়াটা পুরুষের। বিয়ের মাধ্যমে নারী হল পুরুষের দখলকৃত বা ক্রয়কৃত প্রাইভেট সম্পত্তি। পশুদের বিয়ে নেই, প্রাইভেট সম্পত্তিও নেই। তারা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করে, পশুরা সবাই এক একটা ঝানু কমিউনিষ্ট। পশুদের মাঝে শ্রেণী বৈষম্য নেই, বর্ণবাদ নেই, শ্রমিকের উপর বুর্জুয়াদের শোষণ নেই। তারা সদা মুক্ত, সদা স্বাধীন। বিয়ে সাদী নেই, সুতরাং লেনদেন, সমঝোতা চুক্তির প্রশ্নই উঠেনা। প্রকৃতির নির্দেশনানুযায়ী যথা সময়ে উত্তরসূরী জন্ম দিয়ে বিদায় নিতে হবে। সুতরাং নির্দিষ্ট সময়ে নুতনের বেঁচে থাকার উপযুক্ত নুতন জায়গায় নুতন বাসা তৈরি করবে। পুরাতন বাসা পদ্মার জলে ভেসে গেল, নাকি হিমালয়ের ঝড়ে উড়ে

গেল এ নিয়ে তাদের কোনই টেনশন নেই। সারা দুনিয়া তাদের বাড়ি। হাজার হাজার বছর যাবত আদিমানব আমাদের যাযাবর পূর্বপুরুষদের জীবনও এমন ছিল। বিয়ে সাদী ছাড়াই তারা দলবদ্ধ হয়ে বাস করতেন। আজ এখানে তো কাল সেখানে, রোজ আনি রোজ খাই।

মোরা এক ঘাটেতে রান্ধি বারি আরেক ঘাটে খাই / মোদের ঘর বাড়ি নাই,
সকল দুনিয়া বাড়ি মোদের / সকল মানুষ ভাই
মোদের সুখের সীমা নাই।।

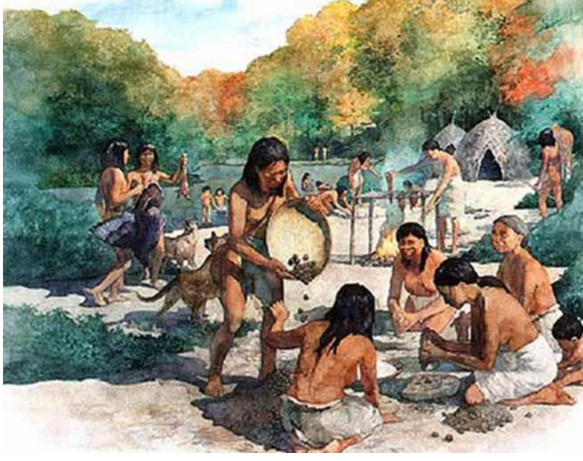
পূর্বে উল্লেখ করেছিলাম, কৃষিভিত্তিক সমাজ গড়ার মাধ্যমে মানব প্রজাতির জীবনধারা পশুজগত থেকে আলাদা হয়ে যায়। এক সময় মানুষ গুহায় বাস করতো। সময়ের পরিক্রমায় তারা সমতল ভূমিতে আবাস গড়ে তোলে। কালের সুদীর্ঘ যাত্রাপথে মানবজাতি বেশ কয়েকটি ধাপ পেরিয়ে এসে যখন কৃষিভিত্তিক সমাজ গড়ে তুললো, তখন থেকে আধুনিক মানব সভ্যতার শুরু আর আদিমযুগের অবসান হয়।



শিকার ভিত্তিক জীবন ব্যবস্থায়, নিত্যদিন পশু সন্ধানে ব্যস্ত পুরুষের নুতন কোনো খাদ্য আবিষ্কার বা অন্য কোনো জ্ঞান অর্জনের সময় বা উপায় ছিলনা। কৃষিভিত্তিক ব্যবস্থা মানুষের জীবন ও তার দুনিয়াটাই বদলে দেয়। এর শুরুটা করেছিলেন নারী। পরবর্তিতে এই নারীকেই হাতের মুঠোয় বন্দী করে পুরুষ, বিয়ে নামক প্রথা উদ্ভাবনের মাধ্যমে। সে কথায় পরে আসছি, আগে দেখা যাক এর শুরু হল কীভাবে? প্রকৃতি নারীর শারিরিক গঠন, দৈহিক কাঠামো, যেভাবে গড়ে দিয়েছে তা বন্যপশু শিকারের জন্যে উপযোগী নয়। অথচ পশু শিকারই ছিল মানুষের বেঁচে থাকার একমাত্র উপায়। নারীকে বসে থাকতে হয় ঘরে শিকারের অপেক্ষায় ও ছোটদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়ীত্বে। অনেক সময় সে থাকে গর্ভবতি ও শারীরিকভাবে দূর্বল। সে বাসস্থান পরিচ্ছন্ন রাখা ও খাদ্য প্রস্তুতি শেষে যতটুকু সময় পায় তা ব্যয় করতো তার চারপাশ অনুসন্ধান পর্যবেক্ষণ করে। সে প্রকৃতিকে গভীরভাবে চিনতে ও জানতে চেষ্টা করে। প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য অবলোকন করে নারী মুগ্ধ হয়। সে নিজেকে সেই রূপে সাজিয়ে তোলে। খোপায় ফুল, গলায় হার পায়ে রঙ মেখে সুন্দর পৃথিবীকে নারী আরো সুন্দরতম করে তোলে। প্রকৃতির ডাক নারী শুনতে পায়। মায়ের ডাকে ব্যাকুল নারী গেয়ে উঠে-

তোমার প্রেমে তোমার গন্ধে পরান ভরে রাখি
এইতো আমার জীবন মরণ এমনি যেন থাকি।।

নারী প্রকৃতির কাছ থেকে শিখেছে সৃষ্টি, আবিষ্কার, মমতা, ভালবাসা, নারী হয়ে উঠে প্রকৃতির সুন্দরের প্রতীক। সুন্দরই তার ধর্ম, সুন্দরই তার কামনা, সে সুন্দরের পুজারি, তার অন্য কাউকে পুজোর দরকার নেই। তাই নারী কোনোদিন কোন ধর্মগ্রন্থ লিখেনি, সে কোনো পয়গাম্বর, অবতার, অস্পরা, দার্শনিক হতে চায় নি।



এক সময় নারী আবিষ্কার করে, প্রকৃতি তার সৃষ্ট জীবের জন্যে পশু শিকার ছাড়াও তার চারপাশে প্রচুর খাদ্য ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখেছে। সে লক্ষ্য করে মাটি থেকে উদ্ভিদ জন্ম নেয়, তাতে ফুল ফুটে, ফল ধরে, ফল থেকে বীজ হয়, সেই বীজ আবার মাটিতে পড়ে আবার অঙ্কুরিত হয়। অন্যান্য জীবেরা এই ফল-মুল খেয়ে বাঁচে। সে নিজে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে থাকে তার নিজের জন্যে কোনটা আহার উপযোগী আর কোনটা অনুপযোগী। এক সময় নারী কৃষিকাজে মনযোগী হয়ে উঠে আর মানব প্রজাতির খাদ্যাভাব পুরনের এক অভিনব পন্থা আবিষ্কার করে ফেলে। এখান থেকে মানব জীবনের আরেক নতুন অধ্যায়ের শুরু।

মানুষ সঙ্গবদ্ধ জীবন শুরু করেছিল পশুর হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে। পশুরা যেমন খাদ্যের সন্ধানে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ঘুরে বেড়াতো, মানুষকেও পশুর সন্ধানে তাদের পিছু ছুটতে হতো অবিরত, এক জায়গায় স্থির থাকা সম্ভব হতোনা। জীবজগতে অন্যান্য প্রাণীরা তার শিকার ধরতে কৃত্রিম অস্ত্র ব্যবহার করেনা। একবেলা খাদ্যের যোগান হলে হাতের কাছে পেয়েও অতিরিক্ত শিকার ধরেনা। পেটের তাগিদ ও প্রাণের নিরাপত্তার কারণ ছাড়া মারামারি করেনা, কারো ঘাড় মটকায় না। বাঘের কোলে

হরিন শাবক পালিত হতেও আমরা দেখেছি। মানুষই একমাত্র জীব, যে তার শিকারের জন্যে অস্ত্র ব্যবহার করে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্য সঞ্চয় করে। আধুনিক যুগে এসে মানুষ শুধু পশু শিকারে নয়, সে স্বজাতির মানুষকে হত্যা করতেও অস্ত্র ব্যবহার শুরু করে। এই আইডিয়াটায় নারীর কোন হাত নেই, এটাও পুরুষের উর্বর মস্তিষ্কের জঘন্য কাজ।

যুগ যুগ ধরে পৃথিবীতে কখনো ধর্মের নামে, কখনো সভ্যতার নামে, কখনো গনতন্ত্রের নামে মানুষ মানুষকে খুন করলো, এমন অসভ্য কাজ পশুরা কোনোদিন করে? কতো সহজে কতো কম সময়ে, কতো বেশী খুন করা যায়, এই চিন্তা পশুদের নেই আছে মানুষের। জগতে কয়টা হলোকাষ্ট, কয়টা হিরোসিমা-নাগাসাকি, কারবালা, কুরুক্ষেত্র পশুরা ঘটিয়েছে? এখানেই মানুষ ও পশুদের মাঝে বিরাট একটা পার্থক্য। তাই মানব প্রজাতিকে আশরাফুল মখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা জীব বলে আখ্যায়ীত না করে তার উল্টোটা বলাই যৌক্তিক হতো। নিজেকে সৃষ্টির সেরা দাবি করার আগে মানুষ কি জীবজগতের দিকে একবার চোখ মেলে তাকিয়ে দেখবেনা, যে নারী, এই দুনিয়া আবাদ করলো, পুরুষকে নয়টা মাস যে নারী নিজের শরীরের রক্ত মাংস খাওয়ায়ে তার ভেতরেই বড় করলো, পুরুষকে জন্ম দিতে, দুনিয়ায় নিয়ে আসতে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়লো, তার জরায়ু রক্তাক্ত ছিন্‌ন ভিন্ন হল, সেই নারীকে পুরুষ অসতীর অপবাদ দেয়, পাথর মারে, আগুনে পোড়ায়, এ কেমন শ্রেষ্ট মানুষ? যুগ যুগ ধরে পুরুষ নারীর সতীত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে, লুলুপ দৃষ্টিতে নারীর জরায়ুর দিকে তাকিয়েছে, নারী কোনোদিন পুরুষকে অসতের অপবাদ দিয়ে পাথর মারেনি, আগুনে পোড়ায় নি। এখানেও মানুষ আর পশুর মধ্যে আরেকটা পার্থক্য পাওয়া গেল।



ধীরে ধীরে মানুষের সংখ্যা বাড়তে থাকে আর শিকারের পশুর সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকে। এক সময় পুরুষের জন্যে পর্যাপ্ত খাদ্যের যোগান দেয়া কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। পুরুষকে নারীর কাছে ফিরে আসতে হয়। পুরুষ একমত হতে বাধ্য হয় যে, কৃষিভিত্তিক ব্যবস্থায় কোনোদিন খাদ্যাভাব দেখা দিবেনা। ধীরে ধীরে পশু শিকার কমতে থাকে আর শষ্য-ফল উৎপাদনের লক্ষ্যে জমি চাষাবাদ বাড়তে থাকে। কিন্তু এর সাথে পাল্লা দিয়ে আরেকটি নতুন সমস্যার উদ্ভব হয়। জমির পরিমাণ যত বেশি হবে, ফসলের পরিমাণও তত বেশি হবে এটাই স্বাভাবিক। দলে বা গোত্রে সকল মানুষ শারীরিকভাবে সমান শক্তির বা সামর্থ্যের হয়ে জন্মায় না। এবার সবলেরা অধিক জমি দখল করে শষ্য-ফল উৎপাদনে দূর্বলদের চেয়ে এগিয়ে যেতে লাগলো। এখান থেকে দখলদারীত্ব, ব্যক্তি মালিকানা, নিম্নবিত্ত-উচ্চবিত্ত, শ্রেণী বৈষম্যের শুরু। এরই ফলশ্রুতিতে জন্ম নিল বিনিময় সিষ্টেম। মানুষের বহুদিনের সাথী জীবজগতের অন্যান্য পশুরা কমিউনিষ্ট রয়ে গেল আর মানুষের জীবনে হল পুঁজিবাদের শুরু। প্রয়োজনের অতিরিক্ত একজাতীয় শষ্য ঘরে রাখার কোনো মানে হয় না। মানুষ ভাবলো, এর বিনিময় মূল্যে সমপরিমাণ বা এর অতিরিক্ত পরিমাণ ভিন্ন স্বাদের খাদ্য শষ্য বা ভিন্ন জিনিস পেলে ক্ষতি কী? এক ধারার সহজ জীবন থেকে বহুরূপীধারার, বহু সম্ভাবনার স্বাপনিক ও কঠিন জীবনে মানুষ পদার্পণ করলো। পরবর্তিতে এই ব্যক্তি মালিকানা আরেকটি সমস্যার সৃষ্টি করলো।

যখন সম্পত্তির মালিক মারা যায়, তখন তার সঞ্চিত সম্পদের মালিক কে হবে? কেউ চাইবেনা তার কষ্টার্জিত সম্পদ অপচয় হউক বা বিনষ্ট হউক কিংবা অপরের দখলে চলে যাক। সুতরাং এর পাহারাদার, এর উত্তরাধিকারী, এর রক্ষণা বেক্ষণের দায়ীত্বে কাউকে নিয়োজিত করা দরকার। বলা নিষ্প্রয়োজন, সে অবশ্যই হবে নিজের রক্ত সম্পর্কের কেউ। এখানে এসে মানুষ তার আদিম জীবনধারা থেকে সম্পূর্ণ বদলে যায়। এক সময় আদিমযুগে পুরুষ শিকার থেকে ফিরে এসে ঘরে নবজাতক শিশু দেখে অবাক হত। সে বুঝতে পারতো না এই শিশু কোত্থেকে এলো, এটা কার সন্তান। আধুনিক যুগে এসে পুরুষ তার সন্তানের উপর মালিকানা দাবি করে বসলো এবং মৃত্যুর পর নিজের সন্তানের কাছেই তার সম্পত্তি রেখে যেতে চাইল। সন্তানের উপর মালিকানা দাবি করার আগে, বীর্য পরিচয় নিশ্চিত করা দরকার। আর তা করতে হলে অবশ্যই সন্তানের মায়ের সাথে সমঝোতায় বা চুক্তিতে আসতে হবে। এই চুক্তির সভ্য নামকরণ হল 'বিয়ে'। চুক্তিবদ্ধ বিয়ের মাধ্যমেই পুরুষ নিশ্চিত হতে চায় যে, সন্তান তার নিজের। বিয়েবহির্ভুত সন্তানের নাম দেয়া হল 'জারজ'। 'ভালবাসা' থেকে 'বিয়ে' শব্দের জন্ম হয় নি, হয়েছে 'ব্যক্তি মালিকানা' বা 'অর্থনীতি' থেকে। পুরুষ এবার শুধু সম্পদেরই মালিক হলোনা, তার চির সাথী নারীকেও সম্পদ হিসেবে ভাবতে লাগলো। তার এই ভাবনাকে বাস্তব রুপ দিতে সে ধর্মের আশ্রয় নিল। নারীকে দেখালো আজগুবি সব ভয়-ভীতি। তৈরি করলো নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করার লক্ষ্যে কিছু নিয়ম বিধান। ধর্মগ্রন্থে লিখিতভাবে ঘোষণা দেয়া হল, নারী শ্রেষ্ট উপভোগ্য সম্পদ। আইন করে দেয়া হল, পুরুষের কামবাসনা জাগা মাত্র নারীকে সর্বাবস্থায় তৈরি থাকতে হবে। নারীর পেছনে জুড়ে দেয়া হল আজগুবি সব বিশেষণ। কেউ অসতী বলে পাথর মেরে হত্যা করে, আর কেউ সতীত্বের পরীক্ষা নেয় আগুনে পুড়ে। ভালবাসার পরীক্ষা শুধু নারীকেই দিতে হয় আগুনে ঝাপ দিয়ে। কেউ কোনোদিন পুরুষের ভালবাসার পরীক্ষা নিতে বিধান সৃষ্টি করলোনা। নারীর স্বকীয়তা, স্বাধীনতা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, পছন্দ-অপছন্দ বলে আর কিছু রইলোনা। অথচ এই মানব সভ্যতা, এই জগতের যা কিছু কল্যাণকর, যা কিছু সুন্দর

সবটুকুতেই নারীর অবদান আছে। এই পৃথিবীকে এমন সুন্দর করে গড়ে তোলার পেছনে নারীর স্বপ্ন, নারীর কল্পনা, নারীর ত্যাগ অস্বীকার করার উপায় নেই।

মা যখন তার সন্তানদের দিয়ে প্রায় অর্ধেক পৃথিবী আবাদ করে নিয়েছেন তখন পর্যন্ত বাবার জন্মই হয়নি। অবশ্য মা সব সময়ই ছিলেন। সন্তান জানতোনা দলের কোন পুরুষ তার বাবা, সুতরাং সকল পুরুষই তার চাচা। এই হিসেবে বাবার চেয়ে চাচা অনেক পুরাতন শব্দ। সভ্যযুগে এসে মানবপ্রজাতি যখন বিয়ে প্রথার জন্ম দিলেন, একই সাথে আরেকটি অসভ্য শব্দের জন্ম হল। 'জারজ'। পশুদের কোন জারজ সন্তান নেই, তাদের সকল সন্তানই বৈধ সন্তান। আমাদের পূর্বপুরুষদের মাঝেও জারজ সন্তান ছিলনা, আমরা সকলেই আমাদের পূর্বপুরুষদের বৈধ সন্তান। যদিও তাদের মাঝে বিয়ের প্রচলন ছিলনা। বিয়েকে যদি বৈধতার মাপকাটি বলে মেনে নিই তাহলে আমরা সকলেই জারজ সন্তান, এই পৃথিবীতে বৈধ সন্তান একজনও খুঁজে পাওয়া যাবেনা। কারণ যারা এই ফতোয়া আবিষ্কার করেছিলেন, যারা এই শব্দের জন্মদাতা, তারা নিজেরাই কারো না কারো অবৈধ সন্তান ছিলেন।

ভালবাসাকে শেকল পরানো প্রকৃতিবিরোদ্ধ কাজ। জোর করে ভালবাসা অর্জন করা যায় না। 'বিয়ে' 'ধর্ম' 'জারজ' এ সব আধুনিক যুগের পুরুষের আবিষ্কার, নারী ও প্রকৃতির এতে সমর্থন নেই, আমাদের পূর্বপুরুষদেরও ছিলনা। বলা হয়, লজ্বা নাকি নারীর বসন। পুরুষের নয় কেন? আমাদের পূর্বপুরুষদের ঠিক কোন সময় থেকে লজ্বাবোধের উৎপত্তি? যেহেতু জীব জগতের অন্য কোথাও এর প্রমাণ মেলেনা, অনুমান করি আমাদের পূর্বপুরুষদের মাঝেও 'জারজ' এবং 'লজ্বা' বলতে কোন শব্দ ছিলনা। আজও আফ্রিকার বনাঞ্চলের ট্রাইব বা উপজাতিরা উলঙ্গ অবস্থায়ই আছে। মানব প্রজাতি তার লক্ষ কোটি বছরের বিবর্তনের বাঁকে বাঁকে প্রমাণ রেখে এসেছে, সেও যে জীব জগতের অন্যান্য প্রাণীর মতই প্রকৃতি-পরিবারের এক সাধারণ সদস্য বই আর কিছু নয়।

স্মৃতির পাতা থেকে

১৯৭০ সালে কওমী মাদ্রাসার ছাফেলা চারমে (মাদ্রাসার হিসেবে নবম শ্রেণী) বৃত্তি পরীক্ষা দিয়ে অবসর দিন কাটাচ্ছিলাম। কওমী মাদ্রাসায় ছাফেলা দুওম (সপ্তম), ছাফেলা ছুওম (অষ্টম), ও ছাফেলা চারম (নবম) তিনটি শ্রেণীকে ঐ সকল শ্রেণীতে পাঠ্য, প্রধান কিতাবের নামানুসারে ডাকা হয়- 'সফর', 'নহমীর' ও 'হেদোয়াতুন নুহ'। উল্লেখ্য আমি মাদ্রাসা শুরু করেছিলাম তৃতীয় জামাত থেকে। ছাফেলা চারমে এসে সহপাঠী শওকত আলীর সাথে আমার গভীর বন্ধুত্ব গড়ে উঠলো। তার চাচা, পাঠশালা হেডমাষ্টার মোখলেস আলী ছিলেন বঙ্গবন্ধুর ভক্ত একজন আওয়ামী লীগ সমর্থক। শওকতের সুত্রে আমিও মাষ্টার সাহেবকে চাচা ডাকতাম। তিনি আমাদেরকে নিজের সন্তানের মতো দেখতেন। মাদ্রাসা ছুটির পর প্রায়ই তাদের বাড়ি যেতাম, মাষ্টার সাহেব না খেয়ে আসতে দিতেন না। দু একদিন না দেখলে তিনি আমার খোঁজ নিতেন। মাষ্টার সাহেব আমাদেরকে দেশ বিদেশের বিচিত্র গল্প শুনাতেন। ভুগোল, রাজনীতি, বিশ্ব ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করতেন, আমরা মুগ্ধ হয়ে শুনতাম। তার টেবিলে পড়ে থাকা বাংলা পত্রিকা মাঝে মাঝে পড়তাম। মাদ্রাসায় বাংলা পত্রিকা সপ্নেও দেখি নাই। চাচার ঘরে একটা রেডিও ছিল। তিনি আমাদেরকে সাথে নিয়ে সংবাদ শুনতেন। তিনি চলে গেলে ভলিয়্যুম কমিয়ে দিয়ে আমরা রেডিওতে গান শুনতাম। একজন মাদ্রাসা ছাত্র হিসেবে ঐ একটি ঘর ছাড়া আমার জন্যে নির্ভয়ে নিরাপদে গান শুনার জায়গা পৃথিবীতে আর কোথাও ছিলনা। মাঝে মাঝে ভাবতাম মাষ্টার সাহেব এত অমায়িক বন্ধুসুলভ ব্যবহার করেন আর আমাদের হুজুররা কেন এত খিটখিটে মনের। হুজুরগন আর আমাদের মধ্যে যেন মুরগীর বাচ্চা আর চিলের সম্পর্ক। একদিন চাচা আমাদেরকে শেখ মুজিবুর রহমানের কাহিনি শুনালেন, সাথে ছয় দফা কী, কেন, তাও ব্যাখ্যা করলেন। তখন রাজনীতির কিছুই বুঝতাম না। মাদ্রাসায় সমাজ বিজ্ঞান, রাস্ট্র বিজ্ঞান, পৌরনীতি পড়ানো হয়না। তবে চাচার কাছ থেকে এতটুকু বুঝেছিলাম যে, সিলেটের ছাতকে তৈরি

সিমেন্ট পাকিস্তানে সস্তায় পাওয়া যায়, আমাদের দেশে তৈরি কাগজ বিক্রীর অনুমোদন পেতে হলে পাকিস্তান থেকে সীল মোহর লাগাতে হয়। শেখ মুজিব পাকিস্তানের এই বৈষম্যমূলক আচরণের বিরোধিতা করেন। তখন আমি এও জানতাম যে আমাদের হুজুরগন 'জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম' নামক একটি দলের সমর্থক, খেজুর গাছ 'জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম' এর প্রতীক এবং নৌকা 'আওয়ামী লীগ' এর প্রতীক। শওকত প্রকাশ্যেই বলতো যে, সে শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের সমর্থক।

বৃত্তি পরীক্ষা শেষে কোথায় যাব কী করবো জানিনা, একদম ভবঘুরে অবস্থা। ছয়মাস গোয়ালে বন্দী, বর্ষার শেষে কার্তিক অগ্রহায়ন মাসে শুকনো মাটি পেয়ে গরুদের যে অবস্থা হয়, আমার অবস্থাও ঠিক তেমনি। লুকিয়ে লুকিয়ে হাইস্কুলের ছাত্রদের সাথে মেলামেশা, গান, নাটক, যাত্রাদল, দূর্গাপুজা, কালীপূজা সব জায়গায় আনাগোনা। পাঞ্জাবী টুপি ছেড়ে শার্ট পরার পর নিজেকে আয়নার সামনে পুরো শিক্ষিত বাবুর মতো দেখে মনে মনে হাসলাম। ইতিমধ্যে মুন্ডানো মাথায় চিরুণী বসানোর মত চুলও গজায়েছে। শওকত আলী দূরে কোথাও অন্য একটি মাদ্রাসায় চলে গেল, আমি আর চাচার বাড়িতে যাইনা। আমার পরিবর্তন দেখে বড় ভাই চিন্তিত হলেন। একদিন জিজ্ঞেস করলেন, 'এখন কী করা, এভাবে তো সময় নষ্ট করা যায়না'। আমি বললাম- 'আমি স্কুলে পড়বো'। প্রায় ২ বৎসর পর ১৯৭৩ সালে একদিন আমাকে আমাদের গ্রাম থেকে পাঁচ মাইল দূরে একটি গ্রামের হাইস্কুলে নিয়ে যাওয়া হলো। মা-বাবার ঘর ছেড়ে জীবনে এই প্রথমবারের মতো পরের ঘরে বাস করার পথে পা বাড়ালাম। জায়গীর বাড়ির ভাত মুখে তুলবো, ভাবতেই ভয় লাগে। পরের বাড়ি, পরের ঘর, পরের বিছানায় শুইতে যাবো, গৃহ কর্ত্রীকে মা, না খালা, না চাচী ডাকতে হবে? এ সমস্ত ভেবে মনটা ভারী হয়ে আসলো।

স্কুলের কাছাকাছি এসে মনে হলো, এ যেন স্কুল নয় কোনো সৌখিন শিল্পীর তুলিতে আঁকা এক ছবি। স্কুলের পূর্ব ও পশ্চিম দিকে দুটো করে ভিটের দুই প্রান্তে কৃষ্ণচুড়ার

গাছ। পাতা নেই শুধু ফুল আর ফুল। দূর থেকে মনে হয় যেন গাছ দুটোর গুড়িতে সবুজ ঘাসের উপর চকচকে লাল রঙ্গের কার্পেট বিছানো। আমি বুঝিনা এই গাছটার নাম কৃষ্ণচুড়া কেন হলো? স্কুলের ঠিক মাঝখানে রক্তজবা ফুলের ঝাড়। এর সামনে মসৃণ মাঝারি ধরণের উঁচু মোড়ালি বাঁশের আগায় পতপত করে উড়ছে লাল সবুজের পতাকা। ইউনিফর্ম পড়া ছাত্র ছাত্রীরা, ছেলেরা ছেলেদের সাথে, মেয়েরা মেয়েদের সাথে দল বেঁধে স্কুলে আসছে, ক্লাসে ঢুকছে, এমন দৃশ্য এত নিকট থেকে আগে কোনোদিন দেখিনি। মাদ্রাসার বন্ধু শওকত আর আবুলের কথা মনে পড়ে গেলো। খুব ভাল হতো তারাও যদি আমার সাথে এই স্কুলে ভর্তি হতো। নিজেকে বড় একা, অসহায় মনে হলো।

স্কুলের চৌকিদার সুব্রত হাওলাদার আমাদেরকে, প্রধান শিক্ষক সুবাস চন্দ্র দেব এর খাস কামরায় নিয়ে গেলেন। স্যার আমাদেরকে দেখে হাত তুলে বললেন- ‘আদাব’। শব্দটি আগেও শুনেছি তবে নিজে কোনোদিন কারো প্রতি ব্যবহার করিনি। ভিতরে দুষ্ট হাসি চেপে রেখে মনে মনে বললাম, এখানে ছাত্ররা হিন্দু মুসলমান চিনে আদাব-সালাম বলে কীভাবে? আমি যদি না চিনে ভুলে হিন্দু স্যারকে সালাম আর মুসলমান স্যারকে আদাব বলি তা হলে কী হবে? স্যার টুকটাক আমার মৌখিক পরীক্ষা নিচ্ছেন, এমন সময় বাহিরে শুনা গেল জাতীয় সঙ্গীত। স্যার উঠে দাঁড়ালেন আমরাও দাঁড়ালাম। ভয় বিষ্ময়ের মিশ্র মৃদু ঝড় বুকের ভিতর বয়ে যাচ্ছে। জাতীয় সঙ্গীত শুনলে এভাবে দাঁড়াতে হয়? রুমের দরজা বন্ধ, আমরা তিনজন মানুষকে কেউ দেখছেনা তবুও দাঁড়াতে হবে? নামাজের আজান শুনে পেছনের জীবনে হাজারবার আজানের দোয়া পড়লাম, কিন্তু এমন অনুভুতি তো কোনোদিন টের পেলাম না, জাতীয় সঙ্গীত শুনে দাঁড়ানোর মধ্যে যা পেলাম। স্কুলের শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রীরা এ দেশকে এত ভালবাসেন, এই পতাকাকে তারা এত শ্রদ্ধা করেন? কওমি মাদ্রাসাগুলো কি বাংলাদেশকে ঘৃণা করে? কেন সেখানে পতাকা নেই, জাতীয় সঙ্গীত নেই? আগামীকাল আমিও সকলের সাথে লাইনে দাঁড়িয়ে

জীবনে প্রথমবারের মত জাতীয় সঙ্গীত গাইবো। সেদিনের অভুতপূর্ব অনুভুতি ভাষায় ব্যক্ত করা যায়না। জাতীয় সঙ্গীত শেষে স্যার আমাকে তার শেষ প্রশ্নটি করলেন- ‘স্কুলের পাশে একটি ফুলের বাগান আছে’ বাক্যটির ইংরেজি কী হবে’? আমি উত্তর দিলাম- ‘Flower garden near school’. স্যার মুচকি হেসে বললেন- ‘কিছুটা ভুল হয়েছে, অসুবিধে নেই, বীজ গণিত আর ইংরেজিতে তোমার একটু অসুবিধে হবে, আমি সব ঠিক করে দেবো’। উল্লেখ্য, কওমি মাদ্রাসায় পাটি গণিত পড়ানো হয়, বীজ গণিত পড়ানো হয়না। স্যার টেবিলের উপর রাখা পিতলের ছোট ঘণ্টার মাথায় দুটো চাপ দিলেন। ক্রিং ক্রিং করে শব্দ হলো, অমনি চৌকিদার সুব্রত হাওলাদার উপস্থিত হয়ে বললেন- ‘আজ্ঞে স্যার’। স্যার বললেন- ‘অস্টম শ্রেণীতে গিয়ে কামালকে বলো এখানে আসতে’। কামাল রুমে ঢুকে বললো ‘আদাব’ স্যার। স্যার কামালকে আদেশ করলেন, সে যেন আমাকে স্কুল ছুটির পর তাদের বাড়ি নিয়ে যায়। কামাল ‘আজ্ঞে স্যার’ বলে মাথা নিচু করে চলে গেল। বুঝা গেল জায়গীরের ব্যবস্থা নিয়ে কামাল বা তার অভিভাবকের সাথে আগেই হেড স্যারের আলোচনা হয়েছে। আগামীকাল থেকে আমিও ‘ইয়েস স্যার’ ‘নো স্যার’ ‘আজ্ঞে স্যার’ আদাব, নমষ্কার বলবো, এ সব ভেবে কিছুটা চিন্তিত হলাম। কোনোদিন যা বলি নাই, নাটকীয়ভাবে এ সব বলতে গিয়ে ঠোঁটে যদি হাসির উদয় হয় তখন কী হবে? স্যার আমাকে সোজা নবম শ্রেণীতে ভর্তি করে দিলেন। জীবনে ওস্তাদ, হুজুর, মাষ্টার, শিক্ষক নামের অনেক লোক দেখেছি, সুবাস চন্দ্র দেব এর মত শিক্ষক দ্বিতীয় আরেকজন দেখিনি। স্যার তাঁর নিজের লেখা একটি ইংরেজি ব্যাকরণের বই হাতে দিয়ে বললেন- ‘এক সপ্তাহের জন্যে আসরের নামাজের পর থেকে মাগরিবের নামাজের পূর্ব পর্যন্ত সময়টুকু আমি তোমাকে পড়াবো, তুমি আমার ঘরে আসবে তোমাকে এলজ্যাব্রা আর ইংরেজি ব্যাকরণ বুঝায়ে দিব’। সেখানে গিয়ে দেখি ঐ নির্দিষ্ট সময়ে দশম শ্রেণীর কিছু ছাত্রও স্যারের কাছে আসে। স্যারের কথার মধ্যে যাদু ছিল। যে কোনো কঠিন বিষয়কে ভেঙ্গে ভেঙ্গে, এত সুন্দর, সহ্জ ধীর-শান্ত ভাষায়, উপমা, উদাহরণ দিয়ে কীভাবে বুঝাতেন তা না দেখলে অনুমান করা মুশকিল।

সকলকে অবাক করে ষান্মাসিক পরীক্ষায় ক্লাসে ৩৫ জন ছাত্রের মধ্যে তৃতীয়, ও বাৎসরিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান পেয়ে গেলাম। স্পষ্ট মনে আছে, দীনিয়াত বা ধর্ম শিক্ষার মৌলভী সাহেব কানেকানে কৌতুক করে বলেছিলেন- এবারে ৯৯ দিলাম, পরবর্তিতে তোমার ধর্ম শিক্ষার কাগজে তুমি নিজেই মার্ক করে দিও।

বাৎসরিক পরীক্ষার পর একদিন একটি গ্রামের হাইস্কুল থেকে তাদের স্কুল কর্তৃক আয়োজিত ভলিবল প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণ করার জন্যে নিমন্ত্রণ আসলো। মোহসিন স্যারের নেতৃত্বে আমরা প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণ করলাম। পুরুস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে একজন বক্তা ঐ গ্রামের নাম বললেন- ‘শহীদ নগর’। অথচ আমরা জানতাম যে, গ্রামের নাম ‘শ্রী রাম শ্রী’, বা শ্রীরামিশী। গ্রামটির নাম শহীদ নগর কেন, কীভাবে হলো, সংক্ষিপ্তভাবে বক্তা তাও ব্যক্ত করলেন। সেদিন গ্রামের মানুষের কাছ থেকে শুনেছিলাম এক লোমহর্ষক কাহিনি আর আমাদেরকে দেখানো হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের সাক্ষী গ্রামের কিছু জায়গা। স্মৃতির পাতা বেয়ে বেয়ে আজ সেই কাহিনিটি শুনানোর জন্যে, আপনাদেরকে মাদ্রাসা থেকে স্কুল হয়ে এই গ্রাম পর্যন্ত এতদূর কেন নিয়ে আসলাম, তার কারণটা বলে দেয়া ভাল। সেদিন স্কুলে আসার কারণে কাহিনির ঘটনাস্থল দেখার সুযোগ হয়েছিল, আর এই ঘটনার ভিল্যেন নায়কদেরকে আমি মাদ্রাসায় পড়াকালীন সময়ে বহুবার কাছে থেকে দেখেছি।

দিনটি ছিল ১৯৭১ সালের ৩১শে আগষ্ট মঙ্গলবার, সকাল ৯টা। পূবাকাশে বর্ষাকালের অথৈ জল ভেদ করে সবেমাত্র রঙ্গীন ভোরের সূর্য উঠেছে। সিলেট জেলার, জগন্নাথপুর থানার অন্তর্গত শ্রী রাম শ্রী (শ্রীরামিশি) গ্রামের শিশু কিশোরেরা প্রস্তুতি নিচ্ছে স্কুলে যাওয়ার, কৃষকেরা গরু নিয়ে গোয়ালায় ব্যস্ত, ধীরে ধীরে নতুন সুন্দর একটি দিনকে বরণ করে নিতে জেগে উঠেছে গ্রাম। এমনি সময় গ্রামবাসী জানতে পারলেন তাদের শ্রীরামিশি বাজার পাকিস্তানী আর্মি ঘেরাও করেছে। ৯টি নৌকায় ৩০জন পাকিস্তানী আর্মি, সাথে পথপ্রদর্শক কয়েকজন রাজাকার। প্রথম নৌকা থেকে বেরিয়ে আসলেন

রাজাকার-প্রধান দুই ব্যক্তি, তাদের একজন হলেন হজরত মৌলানা নূরুদ্দীন সাহেব-মুহাদ্দীসে গহরপূরী, অন্যজন জগন্নাথপুর থানার হবিবপুর গ্রামের আহেমদ আলী খান। সিলেট জেলার সকল গ্রামের কওমি মাদ্রাসার সাথে মুহাদ্দিসে গহরপূরীর গভীর সম্পর্ক। তারা গ্রামবাসীকে বাজার সংলগ্ন শ্রীরামিশি হাইস্কুল মাঠ প্রাংগনে সমেবত্‌ হওয়ার ডাক দিলেন। ধর্মবিশ্বাসী, গ্রামের সহজ সরল মানুষ তাদের ডাকে সাড়া দিলেন। সেদিন নারী ও শিশু ব্যতিত গ্রামের সকল পুরুষ স্কুলের মাঠে এসে জড়ো হয়েছিলেন। তাদের ধারণা ছিল অন্তত গহরপূরী মুহাদ্দিস সাহেবের উপস্থিতিতে আল্লাহর গজব নাজিল হবেনা। কিন্তু কে জানতো তিনি নিজেই যে এ গ্রামের নিরস্ত্র নিরপরাধ মানুষের জন্যে গজব হয়ে হাজির হয়েছেন। রাজাকার দলের নেতাগণ গ্রামবাসীকে বললেন যে, তারা দেশ ও গ্রামের শান্তি রক্ষার্থে একটি শান্তি কমিটি গঠন করে চলে যাবেন। ইতিমধ্যে বিশ্বাস ঘাতক আহেমদ আলী খান স্থানীয় কিছু দালালদের সহযোগীতায় আওয়ামী লীগ সমর্থক ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের বেশ কিছু মানুষের নাম সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। রাজাকারগন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এই গ্রামে স্বাধীনতার পক্ষের কোন মানুষকে জীবিত রাখবেনা। শান্তি কমিটি গঠন করার ঘোষণা ছিল একটি মিথ্যে ধোকা, প্রতারণা। তারা তাদের প্রভু পাকিস্তানী কমান্ডারকে প্রস্তুত হতে ইংগিত করলো। ১০০ জন মানুষকে আলাদা করে স্কুল ও বাজারের মধ্যবর্তি ছোট্ট খালপাড়ে নিয়ে দাঁড় করানো হলো। এ খালটি বিশ্বনাথ ও জগন্নাথপুর থানার সীমানা দিয়ে প্রবাহিত। পেছন দিক থেকে হাত বেঁধে দিয়ে সকলকে কলেমা পড়ার আদেশ দেয়া হলো। ভীত সন্ত্রস্ত অসহায় মানুষগুলোর অনেকেই সাক্ষাৎ মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়িয়ে, আপন মাতা পিতা, ভাই বোন, স্ত্রী সন্তানদের স্মরণ করে কাঁপা কণ্ঠে অস্ফুটস্বরে কিছু কথা বলেছিল, আর অনেকেই কলেমা সম্পূর্ণ পড়তে পারেনি। ততক্ষনাৎ তাদের বক্ষ লক্ষ্যভেদ করে স্টেইনগান দিয়ে ব্রাসফায়ার করা হয়। গগণবিদারী স্টেইনগানের বিকট শব্দে টিনের চালে বসা কবুতরেরা, বৃক্ষের শাখার পাখিরা উড়ে যেতে পেরেছিল। মানুষ পালিয়ে যাওয়ার পথটুকুও রাজাকারেরা বন্ধ করে দিয়েছিল। প্রায় সকলের মৃতদেহ খালের জলে অর্ধ ডুবন্ত অবস্তায় তিন দিন ভাসমান

ছিল। এই নৃশংস হত্যার সংবাদ যখন ঘরে পৌছিল, তখন গ্রামের বধু তার স্বামী, মা তার সন্তানের লাশ তুলে নেয়ার আর সময় নেই। নিজ প্রাণটুকু হাতে নিয়ে যে যেদিকে পারেন পালিয়ে যান। অল্প সময়ের মধ্যেই জনবহুল শ্রীরামিশি গ্রাম জনশুন্য হয়ে যায়। সেদিন শ্রীরামিশি গ্রামের কমপক্ষে ১৩০ জন নিরপরাধ মানুষকে পাকিস্তানী আর্মিরা তাদের সহযোগী রাজাকারদের পরামর্শে হত্যা করেছিল। বাজারের প্রায় সবগুলো দোকানে কেরোসিন ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে ধ্বংস করে দেয়া হয়। বেশ কয়েকটি বাড়িও আগুনে পুড়িয়ে দেয়া হয়। যে সকল রাজাকার এই গণহত্যা ঘটিয়ে ছিল, তারাই এক সপ্তাহ পরে জগন্নাথপুর থানার রানীগঞ্জ বাজারে অনুরূপ আরেকটি হত্যাকান্ড ঘটায়। সেখানে তারা ২৫ জন মানুষকে খুন করে সম্পূর্ণ বাজার আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস করে দেয়।

৭০/৭১ সালে আমাদের সিলেট এলাকার গ্রামাঞ্চলে মৌলানা মওদুদী বা 'জামাতে ইসলাম' এর নাম অনেকেই জানতেন না। সিলেটের যে সমস্ত এলাকায় শান্তি কমিটি ও রাজাকারবাহিনী গঠন করা হয়েছিল, প্রায় সবই হয়েছিল দেওবন্দি সিলসিলার বা নিখিল ভারত জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের উত্তসুরী 'পূর্ব পাকিস্তান জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম' নামক দলটির উদ্যোগে। এ দলটির পশ্চিম পাকিস্তান শাখার নেতৃত্বে ছিলেন মুফতী মাহমুদ ও পূর্ব পাকিস্তান শাখার নেতৃত্বে মৌলানা মহীউদ্দীন।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার ৩৮ বছর পেরিয়ে গেল, আজও একটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর আমি পাইনি। অনেক আওয়ামী লীগ সমর্থক নেতা পর্যায়ের লোককেও প্রশ্নটি শুনে বিব্রতবোধ করতে দেখেছি। শতশত কওমি মাদ্রাসার ছাত্র, উস্তাদ এবং দেওবন্দি আলেম নামে পরিচিত রাজাকারদের নাম সিলেট জেলার রাজাকারের তালিকায় নেই কেন? যারা শ্রীরামিশি গ্রামে ও রাণীগঞ্জ বাজারে হত্যাকান্ড ঘটিয়েছিল তারা কি যুদ্ধাপরাধী নয়? তারা আজও বহাল তবিয়তে আছে, আছে তাদের মাদ্রাসাও। যে আদর্শকে সামনে রেখে তারা সেদিন অস্ত্র হাতে নিয়েছিল, সেই আদর্শ বাস্তবায়নে ঐ সকল কওমি মাদ্রাসা

থেকেই ভিন্ন ভিন্ন ইসলামী দলের নামে আজও অস্ত্রহাতে বেরিয়ে আসে আত্মঘাতী জেহাদি জংগীবাদী ইসলামী সন্ত্রাসী। আমরা কি তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি?

কবি নজরুল

আজ ২৫শে মে কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম দিন। ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের এই দিনে (১৩০৬ বঙ্গাব্দের ১১ই জ্যৈষ্ঠ) ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে সাম্যের কবি নজরুল জন্মগ্রহণ করেন। আজ তার জীবনী নয়, কবির জন্মদিনে শুধু কবির কিছু কবিতা, কিছু বাণী স্মরণ করাই এই লেখার মূল উদ্দেশ্য। প্রশ্ন জাগে মনে, সেই ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে নজরুলের বিদ্রোহী কবিতা প্রকাশ হওয়ার সময় থেকে আজ এ পর্যন্ত আমরা, আমদের দেশ, আমাদের সমাজ কতটুকু বদলালো, কতটুকু সামনে অগ্রসর হলো, নাকি আমরা আজও তালাকের ফতোয়া খুঁজি কোরান হাদিস চষে? আজও কি ধর্মগ্রন্থের নির্দেশে সাতক্ষিরা জ্বলেনা? কাঠমোল্লাদের অঙ্গুলী নির্দেশে হেনা, শেফালী,হোসনাদের মাটিতে পুরে হত্যা করা হয় না? ধর্মগ্রন্থ নিয়ে নজরুল লিখেছেন- পূজিছে গ্রন্থ ভন্ডের দল মূর্খরা সব শোন/ মানুষ এনেছে গ্রন্থ, গ্রন্থ আনেনি মানুষ কোনো।

যে গ্রন্থ মানুষের রচিত সেই ধর্মগ্রন্থের সমালোচনা করলে আজও আমাদের কণ্ঠ রোধ করে দিতে, হাতের কলম কেড়ে নিতে ধেয়ে আসে মূর্খ ধার্মিকেরা। আজও দেশের কবি সাহিত্যিকেরা হন খুন, হন নির্বাসিত। যে দিন থেকে ধর্মগ্রন্থ দুনিয়ায় এসেছে, সে দিন থেকে জগতের মানুষ তার মনুষ্যত্ব পরিচয় ভুলে গিয়ে বিভক্ত হয়ে গেছে বহু জাতিতে বহু পরিচয়ে। ধর্মগ্রন্থ মানুষের কাছে মানুষকে কীভাবে পরিচয় করিয়ে দেয় নজরুল বলছেন-

“একদিন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলোচনা হচ্ছিল আমার, হিন্দু-মুসলমান সমস্যা নিয়ে। গুরুদেব বললেন: দেখ, যে ন্যাজ বাইরের, তাকে কাটা যায়, কিন্তু ভিতরের ন্যাজকে কাটবে কে? হিন্দু-মুসলমানের কথা মনে উঠলে আমার বারে বারে গুরুদেবের

ঐ কথাটাই মনে হয়। সঙ্গে সঙ্গে এ প্রশ্নও উদয় হয় মনে যে, এ ন্যাজ গজালো কী করে? এর আদি উদ্ভব কোথায়? ঐ সঙ্গে এটাও মনে হয়, ন্যাজ যাদেরই গজায় তা ভিতরেই হোক আর বাইরেই হোক তারাই হয়ে ওঠে পশু। যে সব ন্যাজওয়ালা পশুর হিংস্রতা সরল হয়ে বেরিয়ে আসে বাইরে শৃঙ্গরূপে, তাদের ততো ভয়ের কারণ নেই, যত ভয় হয় সেই সব পশুদের দেখে যাদের হিংস্রতা ভিতরে, যাদের শিং মাথা ফুটে বেরোয়নি। শিংওয়ালা গরু মহিষের চেয়ে শৃঙ্গবিহীন ব্যাঘ্র-ভল্লুক জাতীয় পশুগুলো বেশি হিংস্র বেশি ভীষণ এ হিসেবে মানুষও পড়ে ঐ শৃঙ্গহীন বাঘ ভালুকের দলে। কিন্তু বাঘ ভালুকের তবু ন্যাজটা বাইরে, তাই হয়ত রক্ষে। কেননা, ন্যাজ আর শিং দুইই ভিতরে থাকলে কী রকম হিংস্র হয়ে উঠতে হয়, তা হিন্দু মুসলমানের ছোরা মারা না দেখলে কেউ বুঝতে পারবে না"। ['হিন্দু-মুসলমান']

এতোদিন পরেও কি আমরা মানুষকে মানুষ রূপে জানতে শিখেছি? আজও কি আমরা ক্রস, টিকি-দাড়িতে মানুষের পরিচয় খুঁজিনা? নজরুল মানুষেরই মাঝে খুঁজে পেয়েছিলেন মানুষের পরিচয়, লিখেছেন-

গাহি সাম্যের গান-গাহি সাম্যের গান-
যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান
যেখানে মিশছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুস্লিম-ক্রীশ্চান।
গাহি সাম্যের গান!
কে তুমি?- পার্সী? জৈন? ইহুদী? সাঁওতাল, ভীল, গারো?
কন্ফুসিয়াস্? চার্বাক চেলা? ব'লে যাও, বলো আরো!
বন্ধু, যা-খুশি হও,
পেটে পিঠে কাঁধে মগজে যা-খুশি পুঁথি ও কেতাব বও,
কোরান-পুরাণ-বেদ-বেদান্ত-বাইবেল-ত্রিপিটক-
জেন্দাবেস্তা-গ্রন্থসাহেব পড়ে যাও, যত সখ-

কিন্তু,কেন এ পন্ডশ্রম, মগজে হানিছ শূল?
দোকানে কেন এ দর কষাকষি? পথে ফুটে তাজা ফুল!

তোমাতে রয়েছে সকল কেতাব সকল কালের জ্ঞান,
সকল শাস্ত্র খুঁজে পাবে সখা, খুলে দেখ নিজ প্রাণ!
তোমাতে রয়েছে সকল ধর্ম, সকল যুগাবতার,
তোমার হৃষয় বিশ্ব-দেউল সকল দেবতার।
কেন খুঁজে ফের' দেবতা ঠাকুর মৃত পুঁথি-কঙ্কালে?
হাসিছেন তিনি অমৃত-হিয়ার নিভৃত অন্তরালে!
যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান
যেখানে মিশছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুস্লিম-ক্রীশ্চান।

মোল্লাতন্ত্রের উৎপীড়ন, নির্যাতন থেকে মানুষকে বাঁচাতে নতুন প্রজন্মকে নজরুল আহবান করেন-
"আমাদের সমাজের কল্যাণকামী যে সব মৌলানা সাহেবান খাল কাটিয়া বেনোজল আনিয়াছিলেন, তাঁহারা যদি ভবিষ্যৎদর্শী হইতেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইতেন বেনোজলের সাথে সাথে ঘরের পুকুরের জলও সব বাহির হইয়া গিয়াছে। উপরন্তু সেই খাল বাহিয়া কুসংস্কারের অজস্র কুমির আসিয়া ভিড় করিয়াছে। মৌলানা মৌলবী সাহেবকে সওয়া যায়, মোল্লাও চক্ষুকর্ণ বুজিয়া সহিতে পারি, কিন্তু কাঠমোল্লার অত্যাচার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। ইহাদের ফতুয়া-ভরা ফতোয়া। বিবি তালাক ও কুফরির ফতোয়া তো ইহাদের জাম্বিল হাতড়াইলে দুই দশ গন্ডা পাওয়া যাইবে। এই ফতুয়াধারী ফতোয়াবাজদের হাত হইতে গরীবদের বাঁচাইতে যদি কেহ পারে তো সে তরুণ"।

খাল কেটে আপন ঘরে যারা কুমির এনেছিলেন সেই সকল ফতুয়াধারী ফতোয়াবাজদের বিরুদ্ধে নজরুল সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন-

“এই ঘরো যুদ্ধ ভাইয়ের সহিত, আত্মীয়ের সহিত যুদ্ধই সর্বাপেক্ষা বেদনাদায়ক। তবু উপায় নাই। যত বড় আত্মীয়ই হোক,তাহার যক্ষ্মা বা কুষ্ঠ হইলে তাহাকে অন্যত্র না সরাইয়া উপায় নাই। যে হাত বাঘে চিবাইয়া খাইয়াছে তাহাকে কাটিয়া ফেলিয়া দেওয়া ছাড়া প্রাণ রক্ষার উপায় নাই”।

আমরা বড় স্বার্থপর হয়ে গেছি। সমাজকে কুষ্ঠরোগীদের হাতে ছেড়ে দিয়ে আমরা শুধু নিজের প্রাণ বা নিজেকে বাঁচাতে সমাজ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিতে চলেছি। এই কুমিরদের আমরা সরাতে পারি নাই বা সরাবার চেষ্টা করি নাই, তাই তারা মাঝে মাঝে নুরজাহানদের মাটিতে পুঁতে হত্যা করে, সাতক্ষিরায় আগুন জ্বালিয়ে তাদের উপস্থিতি জানায়। নজরুল দেখেছেন, ধর্মগ্রন্থ চুমে চুমে, ধর্মের পুজারী মানুষগুলো কেমন করে মনুষ্যত্ব ভুলে গিয়ে পশুত্ব গ্রহণ করে নিল। তাই অতিশয় বেদনাহত নজরুল আক্ষেপ করে বলেন-

“পশু সাজবার মানুষের একি ‘আদিম’ দুরন্ত ইচ্ছা!-ন্যাজ গজালোনা বলে তারা টিকি দাড়ি জন্মিয়ে যেন সান্তনা পেল। ......হিন্দুত্ব মুসলমানত্ব দুই সওয়া যায়, কিন্তু তাদের টিকিত্ব দাড়িত্ব অসহ্য, কেননা ঐ দুটোই মারামারি বাধায়। টিকিত্ব হিন্দুত্ব নয়, ওটা হয়ত পন্ডিত্ব। তেমনি দাড়িও ইসলামত্ব নয়, ওটা মোল্লাত্ব। এই দুই “ত্ব” মার্কা চুলের গোছা নিয়েই আজ যত চুলাচুলি!........... মানুষ আজ পশুতে পরিণত হয়েছে, তাদের চিরন্তন আত্মীয়তা ভুলেছে। পশুর ন্যাজ গজিয়েছে ওদের মাথার ওপর, ওদের সারা মুখে। ওরা মারছে লুংগিকে, মারছে নেংগোটিকে; মারছে টিকিকে, দাড়িকে! বাইরের চিহ্ন নিয়ে এই মূর্খদের মারামারির কি অবসান নেই”?

মোল্লাতন্ত্র আমাদের নারীসমাজকে গৃহবন্দী করে রেখেছে যুগযুগ ধরে। অবরোধবাসিনী নারীরা ভুলেই গেছেন তারাও যে মানুষ। অবরোধ প্রথাকে শ্বাসরোধ বলে উল্লেখ করে নজরুল বলেন-

“আমাদের পথে মোল্লারা যদি হন বিন্ধ্যাচল, তাহা হইলে অবরোধ প্রথা হইতেছে হিমাচল। আমাদের দুয়ারের সামনের এই ছেঁড়া চট যে কবে উঠিবে খোদা জানেন। আমাদের বাংলাদেশের স্বল্পশিক্ষিত মুসলমানদের যে অবরোধ, তাহাকে অবরোধ বলিলে অন্যায় হইবে, তাহাকে একেবারে শ্বাসরোধ বলা যাইতে পারে। এই জুজুবুড়ির বালাই শুধু পুরুষদের নয়, মেয়েদেরও যেভাবে পাইয়া বসিয়াছে, তাহাতে ইহাকে তাড়াইতে বহু সরিষাপোড়া ও ধোঁয়ার দরকার হইবে। আমাদের অধিকাংশ শিক্ষিত বা অর্ধ শিক্ষিত লোকই চাকুরে, কাজেই খরচের সঙ্গে জমার তাল সামলাইয়া চলিতে পারে না। অথচ ইহাদের পর্দার ফখর সর্বাপেক্ষা বেশি। আর ইহাদের বাড়িতে শতকরা আশিজন মেয়ে যক্ষ্মায় ভুগিয়া মরিতেছে আলো বায়ুর অভাবে। এই সব যক্ষ্মা রোগগ্রস্ত জননীর পেটে স্বাস্থ্য-সুন্দর প্রতিভাদীপ্ত বীর সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে কেমন করিয়া! ফাঁসির কয়েদিরও এইসব হতভাগিনীদের অপেক্ষা অধিক স্বাধীনতা আছে। আমাদের কন্যা জায়া, জননীদের শুধু অবরোধের অন্ধকারে রাখিয়াই ক্ষান্ত হই নাই, অশিক্ষার গভীরতর কূপে ফেলিয়া হতভাগিনীদের চির বন্দিনী করিয়া রাখিয়াছি। আমাদের শত শত বর্ষের এই অত্যাচারে ইহাদের দেহ মন এমনি পঙ্গু হইয়া গিয়াছে যে, ছাড়িয়া দিলে ইহারাই সর্বপ্রথম বাহিরে আসিতে আপত্তি করিবে। ইহাদের কি দুঃখ, কিসের যে অভাব তাহা চিন্তা করিবার শক্তি পর্যন্ত ইহাদের উঠিয়া গিয়াছে।

নজরুলের মতো আজও কি আমাদের আক্ষেপ হয়না, তার কথাগুলোর সত্যতা আজও কি আমরা আমাদের সমাজে দেখতে পাইনা? আজ নারীরাই অবস্থান নিয়েছে নারীর বিরুদ্ধে। পর্দা, বোরখায় অভ্যস্থ নারী আজ কথা বলে নারী স্বাধীনতার বিপক্ষে। এই ভুত তাড়াতে যদি বহু সরিষাপোড়া ও ধোঁয়ার দরকার হয়, সেটা তো আমাদেরকেই করতে হবে। আসুন আমরা ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হই। নজরুলের উত্তরসূরী আমরা বিশ্বকে গান শুনাবো নজরুলের ভাষায় ‘মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী আর হাতে রণ-তূর্য’।

শেষ রজনী

(এটি 'গল্পের ভিতরে গল্প' এর শেষাংশ)

ভারতচন্দ্র দ্বী-পাক্ষিক উচ্চবিদ্যালয়ে ছয়টি বছর স্কুলে আসা যাওয়ার পথে মুকুল, যে মেয়েটিকে দূরে থেকে ফুল দিল, টিজিং করলো, কাছে পাওয়ার জন্যে পাগল ছিল, আজ এত নিকটে পেয়ে যেন তাকে চিনতেই পারলোনা। জিনাতের পরণে বিয়ের লাল শাড়ি, গোলাকার চেহারার সাথে মানানসই আধুনিক মেকআপ, গলায় সোনার হার, কানে দুল, হাতে বালা, সিঁথাপাটি, টিকলি, লিপষ্টিকরাঙ্গা ঠোঁট, মাথায় পাতলা গোলাপী ওড়না। বিয়ের প্রথম সন্ধ্যারাতে ঝমকালো বিদ্যুতবাতির আলোয়, নিজের বেডরুমের পালংকের মাঝখানে মানুষের ভীড়ে বসা জিনাতকে দেখে মুকুল আপন মনে উচ্চারণ করেছিল- 'হায় আল্লাহ, তোমার কোনো সৃষ্টি এর চেয়ে সুন্দর হতেই পারেনা'। বাসর ঘরে মধ্যরাতে ডিম-লাইটের (dim light) আলোতে ঘোমটা মাথায়, গয়নাবিহীন শরীরে, আটপৌরে শাড়ি পরা, বিছানার উপরে একাকী বসা জিনাতকে দেখে মুকুল অনেকক্ষণ নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইলো। জিনাত অনুমান করলো মুকুল কিছুটা লজ্জা, কিছুটা নার্ভাস ফিল করছে। সে আস্তে করে ধীরে ধীরে মাথাটা একটু তুলে কপাল থেকে খানিকটা ঘোমটা সরিয়ে দিয়ে, লিপষ্টিকহীন অধর দুটোতে বাঁকা ধনুকের হাসি তুলে, হরিণীর টানাটানা চোখে, মেহদিরাঙ্গা ডান হাতটি মুকুলের দিকে বাড়িয়ে দিল। মুকুল পালংকের পাশে বসে জিনাতের হাত ধরে নির্বাক নিষ্পলক তার চোখের দিকে তাকিয়ে রইল। জিনাতই প্রথম মুখ খুললো-

- কী দেখছো?
- দেখছি স্রষ্টার অতুলনীয় সৃষ্টি তোমাকে, আর রাতের কাছে করছি প্রার্থনা 'রজনী তুই হইসনারে প্রভাত'।

মুকুল আস্তে আস্তে জিনাতের হাতটি নিজের বুকে টেনে নেয় আর মুখটা বাড়িয়ে তার ঠোঁটের খুব কাছাকাছি নিয়ে আসে। বাম হাতের উষ্ণ কোমল দুটো আঙ্গুল মুকুলের ঠোঁটের উপর ধরে জিনাত তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে-

- রাত এখনও অনেক বাকি।

- তোমার চোখে ঘুম নাই, সারা রাত জেগে থাকবে?

- উপাসনা রাত জেগেই উত্তম, মনযোগে ব্যাঘাত ঘটেনা। আমি অজু করে বিছানায় এসেছি। তুমি উপরে বাথরুমে গিয়ে অজু করে এসো, আমরা একসাথে দু-রাকাত নফল নামাজ পড়বো। এতটুকু কন্টক ছড়ানো পথ পাড়ি দিয়ে, কত ঝড়-জঞ্ঝাট, বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে আমরা এখানে এসে মিলিত হলাম, তার জন্যে প্রভুর কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে হবেনা? চলো তুমি বাথরুমে চলো, ততক্ষণে আমি জায়নামাজটা বিছিয়ে দেই।

মুকুল বাথরুম থেকে ফিরে এসে দেখে জিনাত নামাজে দাঁড়িয়ে গেছে। নামাজ শেষে বিছানায় শুয়ে জিনাত মুকুলের পাশ ঘেঁষে তার বুকের উপর হাত রেখে প্রশ্ন করে- ‘বলো তো তোমার আমার সম্পর্কটা কী? আমি তোমার কে আর তুমি আমার কে’? মুকুল ইতস্তত বোধ করে। ভেবে পায় না, সর্বজন স্বীকৃত অতি পরিচিত একটি উত্তর, জেনে শুনে আবার এ কেমন প্রশ্ন। এই মুহুর্তে উত্তরের অপেক্ষা করে জিনাত মুকুলকে বিব্রত অবস্থায় ফেলতে চায় না। ‘আমরা একে অপরের পরম বিশ্বস্ত বন্ধু’ জিনাত নিজেই উত্তর দিল। দার্শনিকের ভাব ধরে মুকুল বললো- ‘আমি সেটাই বলতে চেয়েছিলাম’। জিনাত মৃদু সুর করে হেসে ফেলে। মুকুলের চোখের উপর চোখ রেখে জিনাত বললো ‘বিশ্বস্ত বন্ধুর কাছে কোনো কিছু গোপন রাখতে নেই। আমার সবকিছু তোমার কাছে আর তোমার সব কিছু আমার কাছে প্রকাশিত থাকবে, কেমন? প্রকাশিত থাকাটা যতটুকু নিরাপদ, অপ্রকাশিত থাকাটা তার চেয়ে অধিক বিপদজনক’। মুকুল এ কথার মর্মোদ্ধারে উদ্যোগী না হয়ে বললো-‘নিশ্চয়ই’। জিনাত বললো- ‘আমাদের

দুজনের দুটো দেহ, দুটো মন আজ মিলেমিশে এক দেহ এক মন হয়ে গেছে। আমরা চাইলে আমাদের জীবনের প্রতিটি রজনী এক একটি বাসর রাত করে নিতে পারি'। মুকুল আর কথা না বাড়িয়ে জিনাতকে তার বাহুবেষ্টনীতে জড়িয়ে নিল। রাতের এক পর্যায়ে এসে জিনাতও মনে মনে কামনা করলো- 'এই রাত কভু যদি ভোর না হতো'।

জিনাত ঠিকই বলেছে, অনেক চড়াই উৎড়াই পেরিয়ে অনেক জটিলতার মধ্য দিয়ে তাদের এই বিয়েটা হয়েছে। দাদু কলমদর আলী সাহেবের বড় সাধ ছিল মৃত্যুর আগে জিনাতের বিয়েটা দেখে যাবার। কিন্তু বিয়ের দুই মাস পূর্বে বয়ঃজনিত কারণে নাতনীর বিয়ে না দেখার শোক বুকে নিয়ে, তার দাদা ইহলোক ত্যাগ করেন। জিনাতের 'এইম ইন লাইফ' অনুযায়ী সে টিচার্স ট্রেইনিং কোর্স সফলতার সাথে শেষ করার পর নিজ গ্রামের শিশু স্কুলে সহকারি শিক্ষকের চাকুরি, আর অন্যদিকে একই সময়ে মুকুল 'ফটোগ্রাফি অ্যান্ড ফটো সাংবাদিকতা'র উপর প্রশিক্ষণ নিয়ে তাদের গ্রাম থেকে বিশ মাইল দূরে শহরে একটি অনলাইন পত্রিকায় কাজ পেয়ে যায়। জিনাতের বাড়ি লক্ষীপুর গ্রাম থেকে মুকুলের বাড়ি কুমারপাড়া পূর্বদিকে আড়াইল মাইল দূরে। কাজের সুবাদে মুকুল আর জিনাতের চোখের আড়ালের দূরত্ব প্রায় তেইশ মাইল হলেও একে অন্যের মনের আড়ালে কোনো সময়েই ছিলনা। জিনাতের বান্ধবী রোকসানা উরফে রুখুর কাছ থেকে যেদিন মুকুল জানতে পেরেছিল যে, জিনাত তাকে ছাড়া কাউকে বিয়ে করবেনা, সেদিনই মুকুল প্রতিজ্ঞা করেছিল জীবনে বিয়ে করলে জিনাতকেই করবে। ব্যাপারটা উভয় পরিবারের মধ্যে জানাজানি হয়ে যাওয়ার পর একদিন মুকুলের মা তার স্বামীর কাছে কথাটা তুললেন-

- আমাদের মুকুলের বিয়ের বয়স তো হয়ে গেল। মাসে একবার বাড়ি আসে দুই দিনের জন্যে, একদিনও বাড়িতে শান্তিমত কাটায় না। দুই দিনই কাটিয়ে দেয় লক্ষীপুর গিয়ে। এর চেয়ে মেয়ের পরিবারের পক্ষ থেকে কোন আপত্তি না থাকলে মেয়েটাকে বউ করে ঘরে তুলে নিলে হয় না? বয়সের দোষে কত কিছুই না ঘটে যেতে পারে।

- অসুবিধের তো কিছু দেখিনা। মেয়ের বাবা আহমেদ আলী সাহেবকে আমি চিনি, তাঁর মেয়েকেও একবার দেখেছি। বছর খানেক পূর্বে সে'ই তার একটি অনুষ্ঠানে আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিল। রূপে গুণে বুদ্ধিমত্তায় মেয়েটি অসাধারন। কিন্তু এখন শুনেছি সে নাকি একটি শিশু স্কুলে চাকুরি করে। আমাদের বংশে পরিবারে মেয়েদের চাকুরি করার প্রথা নেই। এখানে একটু অসুবিধে আছে দেখছি।

- কোনো অসুবিধে নেই। ছেলে থাকবে মাসের আটাইশ দিন শহরে, বউ এখানে একা একা কী করবে? তার চেয়ে দিনের বেলা ঐ শিশুদের নিয়ে ব্যস্ত থাকলে মেয়েটার মন মানসিকতা ভাল থাকবে। রিকশায় যাবে, রিকশায় আসবে আড়াইল মাইল রাস্তা তো আর এমন কিছু না।

- আচ্ছা তবু আমি মেয়ের বাবার সাথে এ ব্যাপারে একটু আলাপ করে দেখি।

কথাটা জিনাতের কানে যখন পৌছুলো, সে পরিষ্কার জানিয়ে দিল, দিনে একবার স্কুলের ঐ শিশুদের না দেখলে সে বাঁচবেনা। মুকুলের বাবা মহসিন উদ্দিন তার এই দাবি থেকে পিছু হটলেন। কানে কানে জিনাতের বাবাকে বললেন- 'ঠিক আছে বেয়াই, নাতি-পুতি হওয়ার সময় কিন্তু বউমাকে আমি এতদূর এসে স্কুল করতে দেবোনা, তার যে কষ্ট হবে'। আহমেদ আলী বললেন- 'আপনার বউমাকে আপনি হেলিক্যাপ্টার দিয়ে স্কুলে পাঠিয়ে দিবেন, অসুবিধে কী'? এ পর্যন্ত বিয়ের বন্দোবস্ত করতে তেমন আর কোন অসুবিধে চোখে পড়লোনা। দেন-মোহর, কাবিন-কেবালা, দিন তারিখ ঠিক করার আগে নিকটাত্মীয়দের পরামর্শ নিতে হয়, অন্যতায় অকারণেই কেউ বেঁকে বসতে পারেন। মহসিন উদ্দিন সাহেবের ঘরে বৈঠক বসলো। খানা-পিনা, সোনা-দানা জেওরাতপাতি নিয়ে আলাপ চলছে। এক পর্যায়ে মহসিন উদ্দিনের ছোট ভাই সদরুদ্দিন নম্র অথচ গম্ভীর কণ্ঠে এই বিয়েতে আপত্তি জানায়ে বললেন- 'একজন রাজাকারের নাতনীকে আমাদের পরিবারের বউ বানিয়ে আনতে পারিনা, আমি এই বিয়েতে নেই'। সকলের চেহারায় বিষণ্ণতার ছাপ, ঘরে পিনপতন নিরবতা, নিঃশব্দ মুখে একে অন্যের দিকে

চাওয়া চাওয়ি করছেন। সদরুদ্দিন ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হলেন। 'দাঁড়াও সদরুদ্দিন' মুকুলের মা ধমকের সুরে বলে উঠেন। সদরুদ্দিন তার বড় ভাইকে যতটুকু ভয় পান তার চেয়ে অনেক বেশি শ্রদ্ধা করেন তার ভাবীকে। 'তোমাদের পলিটিক্স, দুইটা নিষ্পাপ সন্তানের ভালবাসায় নিয়ে না আসলে হয় না'? সদরুদ্দিন মাথা নিচু করে নেন। তারপর মুকুলের মা তার জ্ঞানে যতটুকু কুলায় 'শেখ মুজিবের সাধারন ক্ষমা' ও পাশাপাশি আশেপাশের কিছু উদাহরণ উপমার কথা তুলে ধরে কথাটাকে চাপা দিতে সক্ষম হলেন। বাতাসে ভর করে ঘটনাটা একদিন জিনাতের বাবার কানে পৌছুলে তিনি মনে খুব দুঃখ পেলেন এবং মেয়ের ভবিষ্যত নিয়ে শংকা বোধ করলেন। একদিন হয়তো মেয়েটিকে এর পরিণতি ভোগ করতে হবে। কিন্তু তিনি কারো কাছে দুঃখটা প্রকাশ করলেন না। মেয়ের ভবিষ্যত তার অদৃষ্টের উপর ছেড়ে দিয়ে তিনি বিয়ের দিন তারিখ ধার্য করে নিলেন। যথা সময়ে যথারীতি বেশ ধুমধামের সাথে নিরাপদে নির্বিঘ্নে বিয়ে সম্পন্ন হয়ে গেল।

বিয়ে উপলক্ষে দুই সপ্তাহের ছুটি কাটিয়ে কাজে ফেরার দিন জিনাত মুকুলকে জড়িয়ে ধরে তার কাঁধে মাথা রেখে আবদার করলো 'সপ্তাহে কমপক্ষে একবার ফোন করো আর বাড়ি আসার পূর্বে দিন তারিখ আমাকে জানিও'। মুকুল এর কারণ জিজ্ঞেস করায় জিনাত বলেছিল 'বাসর ঘর আমাকেই যে সাজিয়ে রাখতে হবে, সময় লাগবেনা'? উভয়ে নিজ নিজ কাজে ফিরে গেল আর আহমেদ আলী সাহেবের আশংকা মিথ্যে প্রমাণিত হতে থাকলো। নিয়মিতভাবে মুকুল প্রতি মাসে দুই দিনের ছুটি নিয়ে বাড়ি আসে। আসার পূর্বে টেলিফোন করে দিন তারিখ জিনাতকে জানিয়ে দেয়। উভয় পরিবারের আত্মীয়তা আরো ঘনিষ্টতা লাভ করতে থাকলো আর এ ভাবেই দিন যায় রাত আসে জিনাত-মুকুল দম্পতি সুখে শান্তিতে দুঃখ-বিষাদহীন দিন যাপন করতে লাগলো।

গল্পটা এখানে শেষ হয়ে গেলে বোধ হয় ভাল হত, আমরা রূপকথার রাজকুমার রাজকুমারীর একটি স্বার্থক প্রেমকাহিনি পড়ে অবসর সময়ের বিনোদন পেতাম। কিন্তু যেহেতু শেষ হয়নি তাই আমরা কাহিনির শেষটা না হয় দেখেই যাই।

বিয়ের দুই বছররের মাথায় এসে জিনাত লক্ষ্য করলো কিছুদিন যাবত তার মাতা শাশুড়ীর কেমন যেন উদাসীন ভাব, কথা বার্তা কম বলেন, সব সময় চেহারায় বিরক্তির ছাপ। আরো আশ্চর্যজনক ঘটনা হলো আজকাল স্কুল থেকে ফিরে এসে প্রায়ই তার বিছানা বালিশ, ড্রয়িং টেবিলের জিনিসপত্র এমন কি আলমারির ভিতরের ভাঁজ করা কাপড়-চোপড়ও যেন ঠিক জায়গামত পায় না। অথচ তার বেডরুমে যে, বিনা অনুমতিতে কারো প্রবেশাধিকার নেই তা সে দরোজায় লিখেই রেখেছে। একদিন কাজের বুয়া সখিনার মাকে জিজ্ঞেস করলো- বিষয়টা কী? সখিনার মা বললো- ‘কি জানি আফা, কয়দিন ধইরা দেখছি আফনে ইশকুলে ছইলা গেলে খালাম্মা এসে আফনের রুমে কী যেনো খোঁজাখুঁজি করেন’। একদিন সে টের পেল তার ভ্যানিটি ব্যাগেও শাশুড়ীর হাত পড়েছে। জিনাত ভেবে পায়না কারণটা কী? তার শাশুড়ী একজন মধ্যবিত্ত শিক্ষিত ভদ্র পরিবারের মহিলা। তিনি এমনটা তো করার কথা না। একদিন স্কুল থেকে ফিরে এসে ঘরের বারান্দায় বসে ঠান্ডা বাতাসে জিনাত বিশ্রাম নিচ্ছিল। তার ডান হাতে ছোট্ট একটি কাঁচা আম। হঠাৎ করেই তার শাশুড়ী বিষ্ময়ভরা চোখে সামনে এসে দাঁড়িয়ে আহলাদী মুখে বললেন- ‘কাঁচা আম! তুমি কাঁচা আম খাচ্ছো বউ মা? খুব ভাল খুব ভাল’। জিনাত ভাবে, এই বিকেলে বৈশাখীর আকাশের মেঘেঢাকা কালো অন্ধকার ভেদ করে মাথার উপর সূর্য আসলো কীভাবে? জিনাত ভেবে কুল পায় না শাশুড়ীর এই অস্বাভাবিক আচরণের কী কারণ হতে পারে? সে মনে মনে কিছুটা ভয় পেয়ে যায়। তার আশংকা হয়, বার্ধক্যজনিত কারণে কোনো রোগ-ব্যাধী নয় তো? পরদিন আশংকা দূর করে দিতে এগিয়ে এল সখিনার মা। সখিনার মায়ের কাছে ঘটনার আদ্যোপান্ত জানার পর, বিয়ের জীবনে এই প্রথম জিনাতের চোখ দুটো অশ্রুজলে ঝাপ্সা হয়ে

উঠলো। প্রখর মেধাবী ও অত্যন্ত সাহসী জিনাত এত সহজে ভেঙ্গে পড়ার মেয়ে নয়। দুই সপ্তাহ পর মুকুল বাড়ি আসলে সে তার সাথে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করার প্লান করলো।

অলস শরীরে সন্ধাবেলা বিছানায় হাত পা ছড়িয়ে মুকুল চোখদুটো বন্ধ করে গুনগুন করে গান ধরেছে-

"শুধু তোমার বাণী নয় গো, হে বন্ধু হে প্রীয়
মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার পরশখানি দিয়ো।
সারা দিনের ক্লান্তি আমার সারা দিনের তৃষা
কেমন করে মেটাবো যে খুঁজে না পাই দিশা"।।

আগে থেকে প্লান করে পুরাতন একটি মাসিক ম্যাগাজিন হাতে জিনাত এসে পাশে দাঁড়ালো। একেবারে নোরম্যাল সহজভঙ্গীতে নির্দিষ্ট প্রবন্ধে আঙ্গুল রেখে মুকুলকে জিজ্ঞেস করলো-

- এই লেখাটা পড়েছো?
- কী?
- লেখার শিরোনাম হচ্ছে 'ইসলামের দৃষ্টিতে জন্মনিয়ন্ত্রণ'।
- হয়তো পড়েছি, মনে নেই।
- আচ্ছা, এ ব্যাপারে তোমার কী অভিমত?
- জন্মের সাথে 'নিয়ন্ত্রণ' শব্দটাই বে-মানান।
- মা'নে?
- মা'নে, জন্ম এবং মৃত্যু দুটোই আল্লাহর হাতে। জীবন দেয়ার ক্ষমতা যেমন মানুষের নেই, জীবন নেয়ার ক্ষমতাও মানুষের নেই। প্রাণ নিয়ন্ত্রণ, প্রকারান্তরে প্রাণ হত্যারই শামিল।

– কী রকম?

– উপযুক্ত পরিবেশে পুরুষের শুক্রানু প্রায় পাঁচ দিন এমনকি তারও বেশি সময় জীবন্ত থাকতে পারে। এই জীবন্ত শুক্রানু যাতে নারীর ডিম্বানুতে ঢুকতে না পারে সেই ব্যবস্থার নামই জন্মনিয়ন্ত্রণ। কিছু বুঝাতে পারলাম?

– ও মা, তুমি এ সব জানো কীভাবে?

– পত্রিকায় কাজ করি, এখানে ডাক্তার-মৌলভীর অভাব আছে?

জিনাত তার কাঙ্খিত উত্তর পেয়ে যায়। আনন্দে আবেগে মুকুলকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে তার ঠোঁটে দীর্ঘ একটা চুম্বন দেয়। মুকুল জিজ্ঞেস করে 'কী হলো দাগ পড়ে যাবে যে'? জিনাত বলে 'আমার মনের মানুষ চিনতে আমি ভুল করিনি'।

শত চেষ্টা করেও শাশুড়ীর কথা জিনাত মন থেকে সরাতে পারেনা। স্কুলে ব্রেকটাইমে খেলার মাঠে শিশুদের দিকে সে উদাস মনে তাকিয়ে থাকে। খেলায় মত্ত চঞ্চলমতি শিশুদের ভিড়ে আপন একটি সন্তান কল্পনা করে। জিনাতের মাঝে মাতৃত্বের আকাঙ্খা জেগে ওঠে। মনে পড়ে মুকুলের কথা- 'জন্ম মৃত্যু দুটোই আল্লাহর হাতে'। জিনাত অসহায় বোধ করে। একদিন তার পুরাতন বান্ধবী রুখুকে ফোন করে-

- রুখু, আমি জিনাত।

- জিনাত তুই? আছিস তাহলে এই পৃথিবীতেই?

- স্কুল নিয়ে সব সময় ব্যস্ত থাকি, ফোন-টোন করতে পারিনা। রুখু, একটা কাজে ফোন করেছি।

- ইমার্জেন্সি কিছু?

- না, তবে ইমপোর্টেন্ট।

- টেলিফোনে বলা যায় না?

- না। একটু প্রাইভেট, কনফিড্যান্সিয়েল।

- আগামী শনিবারে আসলে হবে?

- আমি তোর জন্যে অপেক্ষা করবো।

উল্লসিত অভ্যর্থনা, আবেগী আচরণ, কণ্ঠে আড়ষ্টতা লক্ষ্য করে রুখু অনুমান করলো জিনাতের জীবনে মারাত্বক কিছু একটা ঘটেছে। সবকিছু অবগত হয়ে রুখু সান্তনার সুরে বললো-

- এটা একটা চিন্তার বিষয় হলো জিনাত?

- আমাকে যে শুধু আমার চিন্তা করলে হয় না রে রুখু। অন্যের সুখ-শান্তি, খুশি-আনন্দ, দুঃখ-ব্যাথার দায়ও নিতে হয়। আমরা যে নারী। রুখু, আমি কি ডাক্তার দেখাবো?

- ধুর, তুই এতো টেনশন করিস কেন? ডাক্তার দেখানোর প্রয়োজন হলে দেখাবে, না হলে নেই, এখানে অপরাধবোধের কী আছে? আমার জানামতে এমন কয়েকটা কেইস আছে যাদেরকে পরিবারের লোকেরা বন্ধ্যা ঘোষণা দিয়ে রেখেছিল, তাদের কেউ চিকিৎসায় কেউ বিনে চিকিৎসায় বিয়ের ৩/৪ বছর পরে গর্ভবতি হয়েছেন।

– আচ্ছা যদি ডাক্তার দেখাতে হয়, তাহলে পুরুষ ডাক্তার–

– আহ হা, গ্রামে না থাকতে পারে আমাদের সিলেট শহরে মহিলা Gynaecologist এর কি অভাব আছে? প্রয়োজন হলে তোকে আমি আমার বাসায় নিয়ে গিয়ে ট্রিটমেন্ট করাবো, তুই কোনো চিন্তা করিসনা।

জিনাতের আবেগের বাঁধ ভেঙ্গে এক সাগর জল এসে তার চোখে ভর করে। রুখুকে জড়িয়ে ধরে জিনাত হু হু করে কেঁদে ওঠে। জিনাতের বুকের উপর বয়ে যাওয়া প্রচন্ড ঝড়ের জলোচ্ছাস রুখু টের পায়। তার পিঠে চুলে হাত বুলিয়ে সান্তনা দেয়ার চেষ্টা করে। কিছুক্ষণ পর জিনাতকে বুক থেকে সরিয়ে তার চোখে চোখ রেখে রুখু বলে ‘দেখ জিনাত আমি সব সহ্য করতে পারি কিন্তু নারীর চোখের জল সহ্য করতে পারিনা। আর একফোটা জল ফেলবিনা’। রুখু নিজের শাড়িল আঁচল দিয়ে জিনাতের চোখ মুছে দেয়। কথার ফাঁকে ফাঁকে তাদের স্কুল জীবনের স্মৃতির অবতারণা করে জিনাতকে

স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে। এতক্ষণে জিনাত মোটামুটি শান্ত হয়ে গেছে, রুখু বলে-

'বিনে চিকিৎসায় বিয়ের ৩ বছর পর আমার ননদ গর্ভবতি হয়েছিলেন। উনি আমার দেয়া টিপস ফলো করেছিলেন। ঐ যে 'বাজ পড়ে পাখি মরে / পীরের পীরাকি বাড়ে' এমনি আর কি। আমি তাকে কী টিপস দিয়েছিলাম সে কথা পরে বলছি। এখানে অনেকটা বিষয় জড়িত আছে। তোর যে বন্ধ্যাত্ব বা ইনফার্টিলিটি জাতীয় কোনো সমস্যা আছে সেটাই তো পরীক্ষা করে জানা হয় নি, তো তোর এত চিন্তা কিসের? আর জানিস, কো্নো সমস্যা না থাকলেও বছরে বছরে বাচ্চা হবে এর কোনো নিশ্চয়তা নেই। এটাকে একপ্রকার এক্সিডেন্ট্যাল ঘটনাই বলা যায়। মেডিক্যালের ছাত্র ছিলাম বিধায় কিছু কিছু সাধারণ বিষয় এমনিতেই জানি, তবে আমি কোন Gynaecologist নই। শোন, আমার পড়া-জানা থেকে বিষয়টা একটু ব্যাখ্যা করি। জীবনের প্রতিটি দিনই পুরুষ শুক্রানু উৎপন্ন করতে পারে। পক্ষান্তরে নারী প্রায় ১০ থেকে ২০ লক্ষ্ ডিম্বানু নিয়ে জন্মগ্রহন করে এবং তার অল্প কিছু মাত্র জীবনকালে অবমুক্ত করে। আবহাওয়ার পার্থক্যভেদে নারীর ১০ থেকে ১৪ বছর বয়সে প্রথম পিরিয়ড শুরু হয়। পিরিয়ড শুরু হবার সময়কালে মাত্র ৩ লক্ষ ডিম্ব সক্রিয় থাকে, তার পুর্বেই বেশিরভাগ ডিম্বানু নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। পরবর্তীতে প্রতি মাসিক ঋতুকালে মাত্র একটি ডিম্ব পরিপক্ক হয়ে ডিম্ব থলি থেকে নিঃসরিত হয়। নিঃসরিত ডিম্বানু ফেলোপাইন টিউব (প্রজনন তন্ত্রের একটি অংশ) এর শেষ প্রান্তে এসে অবস্থান নেয়। পরবতীতে তা ক্রমশঃ গর্ভাশয়ের দিকে অগ্রসর হয়। তার এই যাত্রাপথে যদি কোনো শুক্রানু দ্বারা ডিম্বটি নিষিক্ত হয় তবে তা গর্ভাশয়ে গিয়ে বসে যাবে। যাকে আমরা নারীর গর্ভধারন বলি। গর্ভাশয়ে পরবর্তীতে শিশুর জীবনকাল আরম্ভ হয়। আর যদি ডিম্বানুটি কোনো পুরুষের শুক্রানু দ্বারা নিষিক্ত না হয়, তবে তা বিচূর্ণ হয়ে কিছু রক্তকনিকা সহ মাসিক ঋতুচক্রের সময় নির্গত হয়ে যাবে। গড়পড়তা প্রতি ঋতুচক্র ২৮ থেকে ২৯ দিন ব্যাপ্ত থাকে। যা পুর্ববতী ঋতুচক্রের প্রথম দিন থেকে

শুরু করে পরবর্তী ঋতুচক্র শুরুর আগের দিন পর্যন্ত গননা করা হয়। বেশিরভাগ নারীর মাসিক ঋতুচক্রের ১১ তম থেকে ২১ তম দিবসের মাঝের সময়ে ডিম্বাশয় থেকে পরিপক্ক ডিম্ব নিঃসরিত হয়। ডাক্তারী ভাষায় এই সময়কে 'নিষেক-কাল' বলা হয়। কারণ এই সময়ের মধ্যে যৌন মিলনের ফলে নারীর গর্ভধারনের সম্ভাবনা থাকে। দেখ, এখানে 'সম্ভাবনা' বলা হয়েছে 'নিশ্চিত' বলা হয় নি। এবার দেখ, জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্যে কৃত্রিম কো্নো কিছু ব্যবহার না করেও কীভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণ করা যায়। যারা কোনো প্রকার জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ি বা ইনজেকশান ব্যবহার না করতে চান তারা এই সময়কালে মিলনে বিরতি দিয়ে গর্ভধারন থেকে মুক্ত থাকতে পারেন। একই ভাবে যে সকল যুগল সন্তান নিতে চান তারা এই সময়কালে বেশি বেশি মিলন করলে গর্ভধারনের সম্ভাবনা প্রকট থাকে। তবে মনে রাখবে প্রতি মাসে একই সময়কালে ডিম্ব নিঃসরণ নাও হতে পারে। এবার বল, উপরের কথাগুলোতে আমার ননদকে দেয়া টিপস এর কোনো সন্ধান পেলে'?

জিনাতের ঠোঁটে লাজুক হাসি। রুখু জিজ্ঞেস করে 'তোর মাসিকস্রাবে কোনো প্রবলেম আছে'? জিনাত মাথা নাড়ে। রুখু বলে 'মাসিক যদি নিয়মিত হয় তাহলে তাড়াহুড়োর কোনো দরকার নেই। দুই তিন মাস আমার টিপসটা ফলো করে দেখ, আল্লাহর মর্জি কাজ হয়েও যেতে পারে'।

রাতে দুই সখি, স্কুল জীবনের স্বর্ণালী, বর্ণালী সুন্দর দিনের কথা স্মরণে দরজা জানালা বন্ধ করে বিছানায় মুখোমুখি বসলো। রুখু এই গ্রামেরই মেয়ে, বিয়ে হয়েছে শহরে তারই এক আত্মীয়ের সাথে যারা একদিন এই গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। রুখুও শহরের একটি হাইস্কুলের সহকারী শিক্ষক। পুরনো দিন-স্মরণপর্বের শেষ পর্যায়ে এসে হঠাৎ করেই আলোচনায় বিষাদের সুর বেজে উঠে জিনাতের এক প্রশ্নে। জিনাত জিজ্ঞেস করে-

- হ্যাঁ রে রুখু, তোদের নুতন বাসা শ্যামলদের বাসা থেকে কতদূর?

- রিকসায় ৫ মিনিটের রাস্তা।

- শ্যামল দাশ খুন হওয়ার পর তুই তাদের বাসায় গিয়েছিলি?

- হ্যাঁ, শ্যামলরা যে বাসায় থাকেন এর নিকটেই আমাদের হাইস্কুল। উনি ছিলেন আমার স্বামীর ঘনিষ্ট বন্ধু। মীরা বাজার আমাদের একটি লাইব্রেরি আছে,বিকেল বেলা ওখানে এসে প্রায়ই শ্যামল দাশ আড্ডা দিতেন। সেখানেই আমার স্বামী একদিন তার সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। বইয়ের পোকা ছিলেন শ্যামল দা। সব সময় তার হাতে একটা না একটা বই থাকবেই। প্রায়ই স্কুলে আসা যাওয়ার পথে দেখা হলে হাত উঠিয়ে প্রণাম করে বলতেন 'কেমন আছেন রুখু আপা'। অথচ বয়সে আমি তার এক বছরের ছোট। এমন একজন সদাহাস্য, উজ্জল চেহারার, আমায়ীক, ভদ্র, সদ্বচরিত্রের মানুষকে হত্যা করতে পারে এমন অসুরও যে দুনিয়ায় আছে কোনোদিন ভাবিনি। মানুষ কেন, কোনো প্রাণীই কি পারে এত নির্মম, এত বর্বর, এতটা বোধহীন হতে? আহা, কী আদব শ্যামল দা'র আচরণে, কী মিষ্ট তার ভাষা। সেদিন শ্যামল দা'র বাসার সামনে যে কী এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিল, তা না দেখলে অনুমান করতে পারবিনা। এক হাত লাশের উপরে রেখে আরেক হাত আকাশের দিকে ছুঁড়ে শ্যামল দা'র বোনের কী বিলাপ, সেই আহাজারী দেখে সেদিন আকাশও বুঝি কেঁদেছিল। পুত্র হারানোর শোকে মা তার বার বার মূর্ছা যাচ্ছিলেন। আর বাকশক্তিহীন বাবা তো নির্জীব পাথরের মত শুধু চেয়ে চেয়ে দেখছিলেন, বুঝতে পারছিলেন না তার আদরের সন্তানকে কেউ খুন করে ফেলেছে, সে যে আর জীবিত নেই'।

- রুখু, আমরা লক্ষীপুর শিশু স্কুলের উদ্যোগে শ্যামল হত্যার বিচারের দাবিতে একটি প্রতিবাদ সভার আয়োজন করেছি আগামী মাসের ৫ তারিখ, আমাদের শিশু স্কুলের মাঠে। স্কুলের পক্ষ থেকে সেখানে আমাকে বক্তৃতা দিতে হবে। গত দুই সপ্তাহে আমি এই নৃশংস খুনের মোটিভ, এই চোরাগোপ্তা হত্যার ভিত্তি কোথায় এ নিয়ে বেশ কিছু রিসার্চ করেছি, বিভিন্ন ইসলামি বই কিতাব থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছি, তাফসির ইতিহাস পড়েছি। এই বক্তৃতাটাই কাটছাট করে আমি একটা শিরোনাম দিয়ে পরবর্তিতে জাতীয়

পত্রিকায় প্রকাশ করতে চাই। এর জন্যে শ্যামলকে নিয়ে আমার আরো কিছু জানার প্রয়োজন।

- সত্যিকারের একজন ভাল মানুষ ছিলেন শ্যামল দা। একদিন এক গাদা বই নিয়ে আমাদের হাইস্কুলে এসে বললেন 'রুখু আপা, আমার ঘরের বুক সেলফে আর জায়গা নেই, এই বইগুলো আপনাদের স্কুল লাইব্রেরিতে দান করে দিলাম'। বেশিরভাগই কল্পবিজ্ঞান আর কিছু ছোটদের গল্পের বই। আরেকদিন করছেন কি জানিস, পাঁচ হাজার টাকার এক বান্ডিল নিয়ে এসে স্কুলে হাজির। আমি জিজ্ঞেস করলাম, শ্যামল দা এতো টাকা? তিনি বললেন 'আপনাদের স্কুলের গরিব ফান্ডে রেখে দিন'। তার এক বিদেশী বন্ধু নাকি এই টাকা তাকে কিছু বই কিনে দেয়ার জন্যে দিয়েছিলেন। তিনি তার বন্ধুকে নিজের পকেটের টাকা দিয়ে বই পাঠিয়ে দিয়েছেন, এই টাকা তিনি রাখবেন না। জানিস জিনাত, আমাদের স্কুলে মাত্র চারজন মণীপূরি হিন্দু ছাত্র আছে বাকি সবাই মুসলমান। শ্যামল দা গরিব মুসলমান ছাত্রদের ফান্ডে টাকা দান করেন আর তাকে কি না খুন করলো মুসলমানরাই।

- রুখু, এই নোট প্যাডে আমার যা বলার সব লিখে রেখেছি। দেখ তো কেমন হলো স্পিচটা? তুই প্রুফ রিডারের কাজটা কর, আমি ততক্ষণে দুই কাপ চা বানিয়ে নিয়ে আসি।

রুখু পড়লো জিনাত তার স্পিচে লিখেছে –

সম্মানিত উপস্থিতি, শ্রদ্ধেয় অভিভাবকবৃন্দ, লক্ষীপুর শিশু স্কুলের সম্মানিত শিক্ষক-শিক্ষিকা মহোদয়গণ ও স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী আমার প্রীয় সোনামণিরা, আসসালামু আলাইকুম। পত্রিকায় টেলিভিশনে সবকিছু দেখে শুনে মনে হয় যেন আমাদের বাংলাদেশে আজ মানুষ খুনের উৎসব চলছে। ইসলামের নামে যারা মানুষ খুন করে আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করি, সাহস আছে আল্লাহকে খুশি করার এই পূণ্য কাজের কথা তোমাদের মায়ের কাছে প্রকাশ করতে? পারবে তোমাদের স্ত্রীকে বলতে যে, আমি

একজন মানুষকে খুন করে এসেছি? মায়ের সামনে দাঁড়াবে কি, হিজড়া বলে যাদের তোমরা ঘৃণা করো তাদের সামনেই দাঁড়াবার সাহস তোমাদের নেই। তোমাদের মগজ ধোলাই করে, জাহান্নামের আগুনে ঠেলে দিচ্ছে একদল শয়তান তোমরা তা বুঝনা? ধরা পড়লে তোমরা পড়বে, গণপিটুনি খেয়ে মারা গেলে তোমরা মরবে, জেল খাটলে তোমরা খাটবে, তোমাদের বউ স্বামীহারা হবে, মা সন্তানহারা হবে, সন্তান পিতাহারা হবে, আর মরলে নিশ্চিত জাহান্নামী হবে তোমরাই, এইটুকু জ্ঞান তোমাদের নেই? তোমরা বুঝনা, মানুষের ভিতরে প্রাণ সঞ্চারের ক্ষমতা আল্লাহ যেমন কাউকে দেন নি, মানুষ খুন করার অধিকারও কোনো মানুষকে দেন নি?

পৃথিবীর কোনো মা'ই চান না তার পবিত্র গর্ভে একজন খুনী জন্ম নিক, কোনো স্ত্রী চান না তার স্বামী একজন জঙ্গী সন্ত্রাসী হউক। উপস্থিত আমার শ্রদ্ধেয় মাতা পিতা, ভাই বোন, অভিভাবকবৃন্দের কাছে আমি অনুরুধ করবো আসুন আমরা এই নরঘাতকদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হই। হিংস্র জন্তুর ভয়ে মানুষ গৃহে আটকে থাকেনি, লড়াই করেছে বন্যপশুর সাথে, অরণ্যের ত্রাস মানুষকে দমিয়ে রাখতে পারেনি, মানুষ জয় করেছে নরখাদক পশুকে, মানুষের মননশক্তির কাছে পশুশক্তি হার মেনেছে। মানুষ নামের কলঙ্ক, দেশদ্রোহী কিছু ভীরু কাপুরুষ শয়তান আজ মানুষ হত্যার উৎসবে মেতেছে। আমাদেরকে আমাদের নুতন প্রজন্মকে দংশন করতে আমাদের ঘরেই বেড়ে উঠছে এক ভয়ানক বিষাক্ত সাপ। এর ছোবল থেকে নিজেদের এবং ভবিষ্যত প্রজন্মকে বাঁচাতে হবে। এই নরপিশাচ অসুরদের রুখে দাঁড়াতে না পারলে আমাদের ধর্ম আর সভ্যতার মর্যাদা রইলো কোথায়? হায়েনারা যতই ধূর্ত চতুর হউক না কেন, আমরা যদি সজাগ দৃষ্টি রাখি, ১৪ কোটি মানুষের চোখকে ওরা ফাঁকি দিতে পারবেনা। আপনাদের সামনে বসা এই মাসুম নিষ্পাপ শিশুদের মাথায় ছোবল মারার আগে সেই সাপকে মেরে ফেলতে হবে। আসুন আমরা নারী পুরুষ সমাজের সকল স্তরের মানুষ আজ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ

হই, আমরা হিংস্র হায়েনারূপী এই জঙ্গীবাদী সন্ত্রাসীদের নির্মূল করে এ দেশকে ভবিষ্যত প্রজন্মের বাসযোগ্য দেশ হিসেবে গড়ে তুলবো।

চা নিয়ে রুমে ঢুকতে ঢুকতে জিনাত জিজ্ঞেস করে 'কি রে রুখু কেমন হলো স্পিচটা, আর কিছু যোগ করা যায়'? রুখু বলে 'জানিস জিনাত প্রায় হুবহু এই কথাগুলোই ভাইয়া এক মিটিংয়ে তার বক্তৃতায় বলেছিলেন'। ঠিক তখনই বাহিরে গাড়ির হর্ণ শুনা গেল। জিনাত বলে 'তোর স্বামীকে অনুরুধ করে দেখনা আজ রাতটা আমাদের বাড়ি থাকা যায় কি না'? রুখু বলে, না রে আজ রাতেই ফিরতে হবে,কাল সকালে দশটায় কর্তা মশায়ের একটা এপয়েন্টপেন্ট আছে ঢাকায়'।

রুখু চলে যাওয়ার দুই সপ্তাহ পর জিনাত মুকুলের হাতের একটি চিঠি পায়-

প্রীয় জিনাত,
নতুন কাজে যোগদানের পর কর্মব্যস্ততার কারণে এ মাসে ছুটি পাচ্ছিনা। ফোনও করতে পারি নাই। আগামী মাসের দুই তারিখ চার দিনের ছুটি নিয়ে বাড়ি আসবো। তুমি ভাল থেকো।

ইতি, তোমার মুকুল।

এক নাগাড়ে চার দিন ছুটি! জিনাত কেলেন্ডারের সাথে তার পিরিয়ডের তারিখ মেলায়। ঠিক উপযুক্ত সময়েই মুকুল বাড়ি আসছে। ভিতরে ভিতরে খুশিতে একা একা হাসে। মুকুল সাধারণত সন্ধ্যায় মাগরিব আর এশার নামাজের মাঝামাঝি সময়ে আসে। দুই তারিখ শনিবার জিনাত নববধুর বিয়ের সাজে সাজবে বলে প্লান করেছিল,শেষ মুহুর্তে প্লান চেঞ্জ করে ফেলে। এবার বিয়ের লাল শাড়ির বদলে পাতলা স্কাই ব্লু রঙ্গের সিল্কের শাড়ি আর সাদা ব্লাউজ। শাড়ির রঙ্গের সাথে ম্যাচিং করা মেকআপ। ব্লাউজের সাথে

ম্যাচিং করে খোপার ফুল। শাড়ির আঁচল বাম দিকে পিছন থেকে ঘুরিয়ে ডান দিকে এনে কুচি দিয়ে বাম কাঁধে ব্লাউজের সঙ্গে সেফটিপিন দিয়ে গাঁথা। ফলস্বরূপ,কোমর থেকে ব্লাউজের নিচ পর্যন্ত বাম বাহু খানিকটা উন্মুক্ত। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে জিনাত নিজের শরীরের এপাশ ওপাশ ঘুরে দেখে আর অস্পষ্ট স্বরে গুনগুন করে-

কুঞ্জদ্বারে বনমল্লিকা
সেজেছে পরিয়া নবপত্রালিকা
সারাদিন রজনী অনিমিখা
কার পথ চেয়ে জাগে
রোদনভরা এ বসন্ত
সখি কখনো আসেনি বুঝি আগে।।

সন্ধ্যা আটটায় মুকুল বাড়ী আসলো। এমনিতেই এয়ার ফ্রেশেনারের মিষ্টিগন্ধে ঘর মউ মউ করছে তার ওপর জিনাত আজ তার পছন্দের শ্রেষ্ট পারফিউম দেহে লাগিয়েছে। রাতের ডিনার টেবিলে জিনাত মুকুলের পাশ ঘেঁষে অকারণেই শাড়ির আঁচল বাতাসে উড়িয়ে বার কয়েক উঠাবসা করলো। প্রতিদিন ঘুমুবার আগে স্নান বা শাওয়ার করা জিনাতের শেখানো স্বামী স্ত্রীর মিলন কর্তব্যের অন্যতম কর্তব্য। মুকুল একদিন প্রশ্ন করেছিল ‘সকাল বিকাল দিনে দুইবার গোসল না করলে হয় না’? উত্তরে জিনাত বলেছিল ‘আল্লাহর দুনিয়ায় জলের অভাব আছে? যতবার মিলন ততবার স্নান এটা আমার নিজস্ব আইন’। আরো কিছু অপছন্দের জিনিস জিনাত মুকুলকে বিয়ের দুই সপ্তাহের মধ্যে জানিয়ে দিয়েছিল যেমন, হলদে আর ঘাড় সবুজ রঙ্গের শার্ট ট্রাউজার পরা, দরজায় নক না করে রুমে ঢুকা, পায়ে ধরে সালাম করা, জোরে হাঁচি দেয়া, শব্দ করে চা পান করা ইত্যাদি। মুকুল প্রতিবারই বলতো ‘ওটা আমিও মোটেই ভাল পাইনা’। আহারপর্ব শেষে জিনাত বললো ‘শুনো, উপরে ট্যাংকের জল এখনও উষ্ণ আছে, বাথরুমে তোমার টাওয়াল-শ্যাম্পু সব রেডি আছে, একটু বিশ্রাম নিয়ে তুমি শাওয়ার

করে নিও। আমি এশার নামাজে যাচ্ছি, ফিরে না আসা পর্যন্ত ঘুমোবেনা কিন্তু’। জিনাতের বেডরুমের পাশেই মহিলাদের নামাজের জায়গা। এর পাশ দিয়েই উপরতলায় বাথরুমে যাওয়ার সিড়ি।

একবার শাশুড়ীর কথা আর একবার রুখুর টিপসের কথা মনে পড়ায় আজ নামাজে জিনাত দুইবার ভুল করেছে। নামাজ শেষে দোয়ার মাঝে স্কুলের শিশুদের চেহারা মানসপটে ভেসে উঠায় দোয়ার মাঝেও মনযোগে বিঘ্ন ঘটে। হঠাৎ জিনাতের মনে হলো, এই বিশ পঁচিশ মিনিটের মধ্যে কারো উপরে উঠার পায়ের শব্দ কিংবা বাথরুমের জলের শব্দ শোনা গেলনা, মুকুল কি ঘুমিয়ে পড়লো? জায়নামাজ ভাঁজ করে করে জিনাত বেডরুমের দরজার সামনে এসে দেখে মুকুল বিছানায় নেই। সিড়ির পাশে গিয়ে উঁকি দিয়ে জিজ্ঞেস করে ‘তোমার শাওয়ার শেষ হলো? কোনো সাড়া শব্দ নেই। সে বেডরুমে ফিরে আসে। বিছানায় তাকিয়ে দেখে জিনাতের নোটপ্যাড তার বালিশের উপরে রাখা। তার ওপর একটি সাদা কাগজের টুকরায় বড় অক্ষরে লেখা-

জিনাত,
আমার হুজুরের নির্দেশে শ্যামলকে আমিই খুন করেছি। তোমার পবিত্র গর্ভে আমার পাপ, আমার মতো আরেকটা খুনী জন্ম নিক, তা আমি চাইনা।

বিদায়, মুকুল।

দুই হাতে জায়নামাজ বুকে চেপে ধরে জিনাত বিকট চিৎকার দিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। জিনাত উপুড় হয়ে সেজদারত অবস্থায় জায়নামাজে মাথা ঠুকে আর আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ জানায় ‘প্রভু গো, এ রাত যেন হয় আমার জীবনের শেষ রাত, আমি আর একটা ভোর দেখতে চাইনা। বুকফাটা ক্রন্দনসুরে জিনাত রাতের কাছে মিনতি জানায় ‘রজনী তুই আর হইসনারে প্রভাত’।

তবে কি ফিরে আসছে সেই ভয়াবহ দিনগুলো?

Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.
Great men are almost always bad men."
(Sir John Dalberg-Acton) (10 January 1834 – 19 June 1902)

যখন কোনো দল, প্রতিষ্ঠান, সরকার বা ব্যক্তি নিরংকুশ ক্ষমতার অধিকারী হয়, তখন তার ক্ষমতা অপব্যবহারের ও দুর্নীতিগ্রস্ত হওয়ার প্রবণতা বেড়ে যায়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এই প্রবণতাকে পরমবাদ বা কর্তৃত্ববাদ বলা হয়। পৃথিবীর ইতিহাসে নিরংকুশ ক্ষমতার অধিকারীর এই কর্তৃত্ব প্রবণতার প্রমাণ প্রচুর রয়েছে। একজন একনিষ্ঠ সমাজ সংস্কারক, দেশপ্রেমিক, সৎ চরিত্রবান ব্যক্তিও পরবর্তিতে আদর্শচ্যুত হয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত ও ক্ষমতা অপব্যবহারের কারণে সমাজে ঘৃণিত নিন্দিত হতে পারেন। অনেক সময় এর চরম মাশুল দিতে হয় নিজের জীবন দিয়ে। আমাদের চোখের সামনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ। দলটি তার দেশপ্রেম, আদর্শ, একনিষ্ঠতা, ত্যাগ ও বিসর্জনের মাধ্যমে নিরংকুশ ক্ষমতার অধিকার পায়, আবার এর অপব্যবহার করে জনপ্রীয়তার তলানিতে নেমে আসে। বাহাত্তর পূর্ববর্তি ব্যক্তি শেখ মুজিবের রাজনৈতিক জীবন, উদারতা, ত্যাগ, দেশপ্রেম বিবেচনায় রেখে, আমি বিশ্বাস করিনা তিনি অন্তরে মানসে, মনে প্রাণে একজন স্বৈরশাসক বা একনায়ক ছিলেন বা হতে চেয়েছিলেন। এ আমার নিতান্তই ব্যক্তিগত বিশ্বাস। কিন্তু বাহাত্তর পরবর্তি রাষ্ট্রনায়ক শেখ মুজিবকে তার নিরংকুশ ক্ষমতা ভুল পদক্ষেপ নিতে প্রেরণা যুগিয়েছিল আর তা তাকে জনমনে একজন কর্তৃত্ববাদী বা একনায়ক রূপে তুলে ধরেছিল। আমরা পেছনের ইতিহাসে যাবোনা, বর্তমান রাজনৈ্তিক হালচাল আর বিগত বছরগুলোর চাওয়া পাওয়ার হিসেব নিকেশ নিয়ে আজকের এই আলোচনা।

২০১৩ সালে চার সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে অকল্পনীয় পরাজয়ের পর হতাশাগ্রস্থ আওয়ামী লীগ কোনোভাবেই এই পরাজয়ের হিসেব মিলাতে পারছেনা। নিরংকুশ ক্ষমতা মানুষকে খুব সহজেই অল্প সময়ে দাম্ভিক আত্মম্ভরী করে তুলে। আওয়ামী লীগের আজকের সুচণীয় অবস্থার জন্যে তাদের নেতাদের দম্ভ অহমিকা বাচালতা অনেকাংশেই দায়ী। তারা ধরেই নিয়েছিলেন যে এই ক্ষমতা চিরস্থায়ী।

ক্ষমতার দম্ভ তাদেরকে এতই অন্ধ করে দিয়েছিল যে, তারা বিগত দিনগুলোতে জামাত, বি এন পির সীমাহীন প্রোপাগান্ডা, মিথ্যাচারের জবাব দেয়ার কোনো প্রয়োজনই বোধ করেন নি। সাধারণ মানুষের প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে ঘুঁৎঘাত করেছেন উম্মাদ ঘাড় ত্যাড়া ষাঁড়ের মত। দলের আদর্শ ও গঠনতন্ত্রের অঙ্গীকার জলাঞ্জলি দিয়ে ধর্মকে সংসদে টেনে এনে চরম ভন্ডামীর পরিচয় দিয়েছেন। জনপ্রীয়তা হারানোর আরো একটি কারণ হলো তাদের অতিকথন, অসঙ্গতিপূর্ণ লাগামহীন কথাবার্তা। আওয়ামী লীগের প্রত্যেকটা ভুল কথা, প্রত্যেকটা ভুল পদক্ষেপের কথা মানুষের মনে থাকে। তা প্রচার হয় দ্রুত, এর সমালোচনা হয় প্রচুর। পক্ষান্তরে জামাত, বি এন পির ভুল, অশোভন কথা, এমন কি শহিদ মিনার ভাঙ্গা, পতাকা পুড়ানো, শত শত কোরানে আগুন দেয়া মানুষ বেশিদিন মনে রাখেনা। কারণ মানুষ মনে করে জামাত ও বি এন পি এই দল দুটোর কাছ থেকে এমনটি অপ্রত্যাশিত তেমন কিছু নয়। আওয়ামী লীগ কোরানের একটি পাতা ছিড়লে তেঁতুল শাফিরা রাজধানী কাঁৎ করে ফেলতো। এখানেই আওয়ামী লীগের সাথে অন্য দল দুটোর পার্থক্য। এ পার্থক্য জন্মগত। আওয়ামী লীগের জন্মের সাথে এ দেশের মাটি ও মানুষের নাড়ির সম্পর্ক। বলা হয়, জামাত, বি এন পি হারলে একটি দল হারে আর আওয়ামী লীগ হারলে একটি দেশ হারে। কথাটা আসলেই সত্য। তাই তাকে শুধরানোর জন্যেই তার সমালোচনার প্রয়োজন।

মনে পড়ে বিগত বছরগুলোতে আওয়ামী নেতাদের কিছু অতিকথন আর ভন্ডামীর কথা-

‘সীমান্ত নিয়ে আমরা তেমন চিন্তিত নই’। (সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম, স্থানীয় সরকারমন্ত্রী)
জনগন ভাবতেই পারে, কেন আপনারা চিন্তিত হবেন না? আমরা জনগন তো সীমান্ত নিয়ে ভীষণ চিন্তিত। অথচ জোট সরকার আমলে সীমান্তের অবস্থা এর চেয়ে আরো বেশি অশান্ত ছিল। তুলনামূলকভাবে তাদের আমলে অনেক বেশি মানুষ মারা গিয়েছিল। কিন্তু আশরাফুলের এই দায়ীত্বহীন কথা পূর্বেকার সরকারের ব্যর্থতা দূর্বলতা চাপা দিয়ে নিজের দলের ব্যর্থতাই শুধু প্রকাশ করে দিল। ৫ মে ২০১৩ ‘হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ’ এর ঢাকা অবরোধ নিয়ে মন্ত্রী আশরাফুল মন্তব্য করেন- *‘হেফাজতিরা লেজ গুটিয়ে ঢাকা থেকে পালিয়েছে’।*

হেফাজত লেজ গুটিয়ে পালালো, না সকল সিটি নির্বাচনে আপনাদের লেজ কেটে দিল? কী দরকার ছিল এমন কথা বলার? অথচ এই হেফাজতিদেরকে আদরে সোহাগে আপনারাই বড় করেছেন, শাফিকে মাদ্রাসা বোর্ডের চেয়ারম্যান বানিয়ে সন্মান দিয়েছেন। মাদ্রাসার নামে জমিন বরাদ্ধ করলেন, শফিকে সসম্মানে হেলিকপ্টারে চড়িয়ে বাড়ী পাঠালেন। কিসের এত খাতির, কী এর পেছনের স্বার্থ? তারা ২০১০ সালে শিক্ষানীতি প্রণয়নের বিরোধীতা করলো। হেফাজতে ইসলাম সরকারের নিয়ন্ত্রাধীন থাকতে চায়না। তাকে শিক্ষানীতির আওতাধীন রাখার উদ্দেশ্যে আপনারা একটি কমিটি গঠন করেছিলেন। তারপর সেই কমিটির আর কোনো খোঁজ খবর নেই। এই সুযোগে জামাত তার বিষ ইনজেক্ট করেছে হেফাজতের মাথায়। হেফাজতের নিরীহ অবোধ রাজনীতি অসচেতন অল্প বয়সী কিশোর ছাত্রদেরকে সামনে রেখে জামাত শিবির রাজধানী তছনছ করে দিল। সরকার অত্যন্ত দক্ষতার সাথে কৌশলে লক্ষ লক্ষ হেফাজতের মানুষগুলোকে বাঁচিয়ে নিয়ে ঢাকা শহরকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করলো। এই অসাধারণ কাজটির জন্যে সরকার যখন প্রশংসিত হওয়ার কথা, সেখানে এই ভুল মন্তব্যটির কারণে দূর্নাম কুড়িয়ে নিল। হেফাজতের সন্ত্রাসী কর্মকান্ড, গরিবের দোকান-পাট ধ্বংস, হাজার হাজার

বৃক্ষনিধন, সর্বোপরি কোরান পুড়ানোর জন্যে যেখানে সাধারণ মানুষের ঘৃণা ধিক্কার পাওয়ার কথা, সেখানে আশরাফুলের এই ভুল দম্ভ দেখানোর কারণে মানুষ হেফাজতের প্রতি সহানুভুতিশীল হয়ে উঠলো। অত্যাচার না করেও অত্যচারী হলেন কারণ এ ভাষা অত্যাচারী শাসকের ভাষা।

'মরিচের গুঁড়োয় কারো মৃত্যু আর কচুগাছে ফাঁসি দিয়ে মৃত্যু সমার্থক'।

শুনা গেল, এমপিও ভুক্তির আন্দোলনে একজন শিক্ষক পিপার স্প্রে' আঘাতে মারা গেছেন। শিক্ষক তো মানুষই, নাকি? সরকার কেন বলে- 'গুঁড়ো মরিচের স্প্রে কী করে হত্যা করবে একজন মানুষকে'? কী করে হত্যা করে তা নিজের চোখে স্প্রে মেরে পরীক্ষা করে দেখতেই পারেন। ঘটনা সত্য হউক কিংবা মিথ্যা হউক, মখা আলমগীর কেন বললেন- *"যখন নৈরাজ্য বন্ধ করার জন্য নিরাপত্তা বাহিনি কাজ করে তখন তারা ফুলের মালা নিয়ে যাবে না"?*

পুলিশের হাতে ফুলের মালা থাকেনা তা তো একটা পাগলও বুঝে। জনগনকে পাগল মনে করেছেন? সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে সারা দুনিয়াকে কী দম্ভ প্রদর্শন? জনতার ক্ষমতাকে তুচ্ছজ্ঞান করলে এর পরিণাম হয় ভয়াবহ।

'বিশ্বজিত হত্যাকারীরা ছাত্র লীগের সদস্য নয়'।

এ কথা বলার মা'নেটা কী? ঠাকুর ঘরে কে রে, আমি কলা খাইনা?

'বিরোধী দলকে প্রতিহত করতে ছাত্র লীগকে মাঠে থাকতে হবে'।

তো এখন বিশ্বজিত খুনের দায়ভার নেবেন না কেন? শিবিরের পদাঙ্ক ছাত্র লীগ অনুসরণ করবে কেন?

'চার হাজার কোটি টাকা বড় কোনো টাকা না, হলমার্ককে আরও লোন দিতে হবে'।

নিরংকুশ ক্ষমতার কয় ছিলিম গাজা সেবন করলে একজন মানুষ এমন কথা বলতে পারেন?

‘বেডরুম পাহারা দেয়া আমাদের কাজ নয়’।

তো কার কাজ? ভোটাররা তো মনে করে তাদের একটা কুত্তার ঘর পাহারা দেয়া, একটা বিড়ালের নিরাপত্তা দেয়াও সরকারের কাজ।

‘প্রয়োজনে শারিয়ার আইনে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করবো। দেশ চলবে মদিনার সনদ অনুযায়ী। আওয়ামী লীগের আমলেই মসজিদ মাদ্রাসার উন্নয়ন হয়েছে জোট সরকারের আমলের চেয়ে অনেক বেশি। ইসলামের সেবা ও উন্নতির জন্যে কেউ কাজ করে থাকলে আওয়ামী লীগই করেছে। আর নামাজ রোজার দিক থেকেও যদি দেখেন, আওয়ামী লীগের লোকজনই বেশি নামাজ রোজা পালন করে। সংসদের মসজিদে খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন, বি এন পির কয়জন যায় আর আওয়ামীলীগের কয়জন যায়’।

বাহ, মাননীয় প্রধান মন্ত্রী মদিনার সনদ আরবিতে পড়েছিলেন না বাংলায়? আমাদের সংবিধান কি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করার যোগ্য নয়? বাবু নগরী সমাবেশ করে মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন, শারিয়া আইন আর মদিনার সনদ অনুযায়ী দেশ চালালে প্রথমেই সুরঞ্জিত বাবুর হাত দুটো কেটে ফেলতে হবে। ‘সনদ’ বেশি কে বুঝে, পাবলিক তা ভাল করেই জানে। তাই আপনার কথা ভন্ডামী হিসেবে মানুষ গন্য করে। আপনি যখন নিজেকে তাহাজ্জুদ নামাজী হিসেবে মানুষের কাছে পরিচয় দেন, মানুষ তখন ভাবে ‘ডাল মে কুচ কালা হ্যায়’। কারণ এটা বিজ্ঞাপন দিয়ে পাবলিককে জানানোর কথা নয়। আপনি যখন নামাজে, খালেদা জিয়া তখন বিউটি পার্লোরে। তারপরও খালেদা ধার্মিক আর আপনি ইসলাম বিদ্বেষী। কারণ খালেদা বেগম নামাজের সময় বিউটি পার্লোরে থাকবেন এটা প্রত্যাশিত কিন্তু ধর্ম নিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী আওয়ামী লীগ নেতা তার

দলের ধর্মচর্চা নিয়ে সংসদে সেমিনারে রাস্তায় বয়ান দিবেন তা অপ্রত্যাশিত। সংসদে একটি নির্দিষ্ট ধর্মের বিজ্ঞাপন টাঙ্গানো আওয়ামী লীগের সাজেনা। মানুষ জানে, আওয়ামী লীগ তার দলের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দ কেটে ফেলেও সারা দেশের মানুষের মন জয় করতে পেরেছিল অনেক পূর্বেই।

গোলাম আজমের রায়ে খুশি বা সন্তুষ্টি ব্যক্ত করার কী প্রয়োজন পড়লো? ট্রাইবুনালের আইনানুযায়ী এই অপরাধের আসামীর দন্ড দানে বয়স বিবেচনায় আসতে পারেনা,তা কি সরকারের আইন বিশেষজ্ঞরা জানেন না? একজন প্রশ্ন রেখেছে, বঙ্গবন্ধুর খুনীদের শাস্তির ব্যাপারে যদি বয়স বিবেচনায় নিয়ে কারো শাস্তি মৃত্যুদন্ড দেয়া না হতো তখন কি আপনি সন্তুষ্টি প্রকাশ করতেন? দেশী-বিদেশী সীমাহীন চাপ-চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র, হুমকি ধমকি সাহসের সাথে মোকাবিলা করে, চার বছরের কষ্টের সকল অর্জন হুট করে একটা হেয়ালী মন্তব্য করে কলঙ্কিত করে দিলেন। এ দিকে আবুল সাহেব বিদায় নিলেন মায়ের উপর সতীন তুলে। তাকে 'দেশপ্রেমিক' বলার দরকারটা কী?

'পবিত্র কোরান শরিফে আগুন দিয়ে তারা কি ইসলাম রক্ষা করতে চান? পুরো ঢাকা শহরকে লন্ডভন্ড করে দেয়া হলো, নির্বিচারে গাছ কেটে ফেলা হল। প্রতিটি গাছের পাতা 'আল্লাহ আল্লাহ' জিকির করে। কিন্তু হেফাজতরা গাছ কেটে সেই জিকির বন্ধ করে দিল। ইতিমধ্যে গাছ থেকে নতুন করে পাতা গজাচ্ছে। আল্লাহ আমাদের আবার নতুন করে বাঁচার তাগিদ দিয়েছেন। এই গাছের পাতা হেফাজতদের জানান দিচ্ছে তোমরা অন্যায় করেছ। জুলুম করেছ। তোমরা আমাদের ধ্বংস করেছিলে আল্লাহ আমাদের ধ্বংস করেন নি। ৭৯ সালে জিয়াউর রহমানের সময় রংপুরে শুধু পেটের দায়ে বহু সংখ্যক মহিলা যখন এফিডেবিট করে দেহ ব্যবসা শুরু করলেন, তখন আল্লামা শাফি কোথায় ছিলেন? জিয়া যখন প্রিন্সেস লাকী, জরিনাকে নাচালেন, মদ জুয়ার লাইসেন্স দিলেন, তখন শাফি কেন নিশ্চুপ ছিলেন'? – মতিয়া চৌধুরী।

সংসদকে ইসলামী জলসা বানানোর অধিকার আপনাদেরকে কে দিয়েছে? গাছের পাতার 'আল্লাহ আল্লাহ জিকির' আল্লামা শাফি, বাবু নগরীরা শুনলোনা, শুনলেন মতিয়া চৌধুরী। অগ্নিদগ্ধ কোরান দেখে দেশের কোটি কোটি মাদ্রাসার ছাত্র-ওস্তাদ, আলেম-ওলামা শেখ-মাশায়েখ কারো কান্না আসেনা, অশ্রুবারি ঝরে মতিয়ার চোখ থেকে। হেফাজত ভুল করলে জুলুম করলে তা রোধ করার, তাদেরকে জানানোর দায়ীত্ব আপনাদের, সবুজ গাছের পাতার নয়। এই ভান্ডামী ধরার জন্যে অক্ষর জ্ঞান লাগেনা। একটি এলাকার নারীদের বেশ্যা আখ্যা দিয়ে আরেকদল নারীর বৃত্তি-পেশাকে যে অপমান করে চলেছেন, ধর্ম ও ক্ষমতার আফিমাসক্ত মাতাল মতিয়া তা বুঝতেই পারেন নি।

'নবিজি বলেছেন, তোমরা ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করোনা। অথচ আল্লামা শাফি কোরানের অপব্যাখ্যা দিচ্ছেন। এটা ষড়যন্ত্র, এ সময়ে নীরব থাকা যায়না'। (বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী, আব্দুল লতিফ সিদ্দিকী)
তো কী করবেন? ডাক দিবেন জেহাদের। এবার কি আল্লামা তেঁতুল শাফিদের সাথে আওয়ামী নেতাদের মোবাহিলা (বাহাস) হবে পল্টন ময়দানে?

এরপর এডভোকেট তারানা হালিম, ফজিলাতুন্নেসা বাপ্পি, দিপু মণি, অপু উকিল, মতিয়া চৌধুরী, শেখ হাসিনা, তানিয়া আমীরের 'ইসলামের প্রথম মুসলিম নারী ও প্রথম শহিদ নারী' শিরোনামের একই ওয়াজের ভাঙ্গা সিডি বাজতে শুনেছি অনেক দিন। এ সব ফাইজলামী ভন্ডামী তাদের অধঃপতনের বড় একটা কারণ।

ওয়াশিংটন টাইমসে বাংলাদেশ বিরোধী নিবন্ধ লেখার কারণে বিএনপি চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়ার প্রতি তারই সাবেক উপদেষ্টা ও 'আমার দেশ' পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মহমুদুর রহমান তীব্র বিষোদগার করেছিলেন। খালেদা জিয়ার লেখায় স্বাধীনতা যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান নিয়ে তথ্য বিকৃতি, দেশের বিরুদ্ধে বিদেশীদের হস্তক্ষেপ চাওয়া নিয়ে মাহমুদুর রহমান খালেদা জিয়ার তীব্র সমালোচনা করে

বলেছিলেন, 'বিএনপি নেত্রীর আর জনগণের প্রতি আস্থা নেই। এ লেখার মাধ্যমে তিনি পলিটিক্যালি ডেড হয়ে গেছেন। বিএনপির এখন গলায় দড়ি দেয়ার সময় হয়ে গেছে'। শুভ্র নামে এক সাংবাদিকের সঙ্গে ফোনালাপে মাহমুদুর রহমান বলেন-

'ম্যাডাম একটি চিঠি লিখেছেন। কোথাকার কোন ওয়াশিংটন টাইমসে, ওয়াশিংটন পোস্ট না কিন্তু, যেখানে ম্যাডামের একটা চিঠি ছাপা হইছে। সে (খালেদা জিয়া) চিঠিতে মিনতি করেছেন বাংলাদেশে হস্তক্ষেপের জন্য। ইংল্যান্ডের কাছেও কাকুতি মিনতি করেছেন। আজকে সম্ভবত আওয়ামী লীগ সংবাদ সম্মেলন করবে। সংবাদ সম্মেলনে আওয়ামী লীগ তো আজ ম্যাডাম ও বিএনপিকে শোওয়াইয়া ফেলবে। আওয়ামী লীগ তো কমই করতাছে। আজ যদি শেখ হাসিনা এভাবে নিবন্ধ লিখত তাহলে আমার পত্রিকায় সাত কলামের হেডলাইন করতাম।'

ম্যাডামের ইংরেজী লেখার দক্ষতার বিষয়ে ওই সাংবাদিকের কাছে ক্ষোভ প্রকাশ করে মাহমুদুর রহমান আরো বলেন- *'যদি আমাদের বলত, আমি ইংরেজিতে অত ভাল না, বাংলা লিখতে পারি। তার পরেও যতটুকু ইংরেজি জানি ওর থেকে ভালো লিখতে পারতাম। 'ম্যাডাম তার ফার্স্ট ত্রি লাইনেই পলিটিক্যালি ডেড হয়ে গেছেন। শি ইজ ডেড। তিনি তো পলিটিক্যালি ডেড হয়ে গেছেন। এখন মনে হয় তাঁর আশে পাশে র'য়ের এজেন্টরাই এটা করেছে। প্রথমে তাঁকে ইন্ডিয়াতে নিয়েছে। সেখানে নিয়ে তাঁকে চুপ করে দিয়েছে। বাকিটা এখন করল। আমি তো এখন খালেদা জিয়ার নিউজই করি না। বরং আওয়ামী লীগ এ বিষয় নিয়ে সংবাদ সম্মেলন করলে ছাপিয়ে দেব। আওয়ামী লীগ তো তাকে শোওয়াইয়া ফেলবে।'*

আওয়ামী লীগ কি খালেদাকে শোয়াইতে পারলো? পারে নাই। শোয়াইবার প্রয়োজনই বোধ করে নাই। কারণ সেই দম্ভ, অহমিকা। তারা মনে করেন আমরা তো ক্ষমতায় থাকছিই।

এবার হিসেবের ওপর পৃষ্ঠা দেখা যাক।

১) প্রবাসীদের পাঠানো রেমিটেন্স ও রপ্তানি আয় বেড়ে ৫ বছরে দ্বিগুণ হয়েছে। আর অর্থনীতির এ দুই সূচকের উপর ভর করে বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ বেড়েছে আড়াই গুণ অর্থনীতিবিদরা বলছেন, এই তিন সূচকই দেশের অর্থনীতির ভিত মজবুত রেখেছে। গত পাঁচ বছরে গড়ে ৬ শতাংশের উপরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনেও রেমিটেন্স, রপ্তানি আয় ও রিজার্ভ বিশেষ অবদান রেখেছে। (বিডি নিউজ ডট কম)

২) এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) মনে করছে, চলতি ২০১০-১১ অর্থবছরে বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি ৬ দশমিক ৩ শতাংশ হতে পারে যা বিদায়ী বছরে ছিল ৬ শতাংশ। বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার মধ্যেও শক্ত অভ্যন্তরীণ চাহিদা ও সরকারের নেওয়া নানা প্রণোদনাগুচ্ছের কারণে বাংলাদেশ স্থিতিশীল এই প্রবৃদ্ধি ধরে রেখেছে বলে এডিবি মনে করছে। (প্রথম আলো)

৩) আইএমএফ প্রকাশিত ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুকে প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাসের দিক দিয়ে বিশ্বের ১৫০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৩৫তম। পূর্বাভাস অনুযায়ী এবার ভারত ৬ শতাংশ, পাকিস্তান ৩ দশমিক ৩ শতাংশ, শ্রীলংকা ৬ দশমিক ৭ শতাংশ, নেপাল ৩ দশমিক ৬ শতাংশ, মালয়েশিয়া ৪ দশমিক ৭ শতাংশ, ভিয়েতনাম ৫ দশমিক ৯ শতাংশ, ও চীন ৮ দশমিক ২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে পারে। এর আগে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) ৬ শতাংশ এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ ৬ দশমিক ১ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস দেয় বাংলাদেশের জন্য। (বাংলা নিউজ ২৪)

৪) মহাজোট সরকারের চার বছরের বড় সাফল্য হলো জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনে ধারাবাহিতা। সরকার বাজেট ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে শেষ অর্থবছরেও ছয় শতাংশের উপর

জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনে সমর্থ হয়েছে। সেই সঙ্গে এই চার বছরে দেশের মানুষের আয় দুই শ’ ডলারেরও বেশি বাড়াতে সমর্থ হয়েছে। (জনকণ্ঠ)

৫) মাথাপিছু আয় ১৯৭৩ সালে ৯০ মার্কিন ডলার থেকে ২০১১ তে ৭৪৮ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। মাথাপিছু ক্রয়ক্ষমতা দিয়ে দেখলে দেখা যায়, ১৯৮০ এবং ২০১০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের মাথাপিছু ক্রয়ক্ষমতা দ্বিগুণ হয়েছে, যা ৬৭৭ থেকে ১ হাজার ৪৮৮ ডলার হয়েছে। মধ্যম আয়ের দেশেও ওই সময়ে মাথাপিছু ক্রয়ক্ষমতা দ্বিগুণ হয়েছে। (সমকাল)

৭) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০১০ সালের খানা জরিপ অনুযায়ী, দারিদ্র্য হার কমে ৩১ দশমিক ৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। দারিদ্র্য হার কমার গতি সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দ্রুততর হয়েছে। যেমন ১৯৯১-৯২ এবং ২০০৫ সালে দারিদ্র্য হার কমেছে বছরে গড়ে ১ দশমিক ৩৫ শতাংশ হারে; ২০০৫ এবং ২০১০-এর সময়কালে কমেছে ১ দশমিক ৭ শতাংশ হারে। আর ১৯৯১-৯২ এবং ২০১০ এই পুরো সময়কালে দারিদ্র্য কমার হার ছিল গড়ে বছরে ১ দশমিক ৩৭ শতাংশ। চীন ও ভারতের পরে বাংলাদেশই দারিদ্র্য দূরীকরণে এতখানি অর্জন করতে পেরেছে। (সমকাল)

৮) বিশ্বব্যাংক মনে করে, ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশের পক্ষে মধ্য আয়ের দেশে উত্তরণ সম্ভব। লন্ডনের দৈনিক পত্রিকা দ্য গার্ডিয়ান অর্থনীতিবিদ ও গবেষকদের মতামত নিয়ে লিখেছে, বাংলাদেশ ২০৫০ সালে পশ্চিমা বিশ্বকে ছাড়িয়ে যাবে। (প্রথম আলো)

৯) অর্থবছরে (২০১২-১৩) রফতানি আয়ের আগের অর্থবছরের (২০১১-১২) তুলনায় এ আয় ১১ দশমিক ১৮ শতাংশ বেশি। (সমকাল)

১০) ৪০ বছর আগে দেশে ১ কোটি টন খাদ্যশস্য উৎপাদন হতো। বর্তমানে দেশে খাদ্য উৎপাদন হচ্ছে প্রায় সাড়ে ৩ কোটি টন। চার দশকে খাদ্য উৎপাদন বেড়েছে প্রায় সাড়ে তিন গুণ। কৃষিপ্রধান বাংলাদেশের জিডিপিতে এ খাতের অবদান ২০ শতাংশ। ৪০ বছরে মাথাপিছু আয় বেড়েছে নয় গুণেরও বেশি। এ সময় জিএনআই ৯০ ডলার থেকে ৮১৮ ডলারে উন্নীত হয়েছে। ক্রয় মক্ষমতার ভিত্তিতে জিএনআই ১ হাজার ৭০০ ডলার ছাড়িয়ে গেছে। রেমিটেন্স আয়ের দিক দিয়ে বিশ্বের ষষ্ঠ স্থান বাংলাদেশ। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ১১ বিলিয়ন ছাড়িয়ে গেছে। (জনকণ্ঠ)

রানা প্লাজার মালিক সোহেল রানা গ্রেফতার হয়েছে। সরকারদলীয় হওয়া সত্বেও সরকার তাকে আইনের হাতে সোপর্দ করেছে। অথচ ২০05 সালে এমভি কোকো নামে লঞ্চ ডুবে যাওয়ায় অনেক লোকের সলিল সমাধি হয়েছিল। কিন্তু কোকোকে গ্রেফতার করা হয়েছিল কি? বিশ্বজিতের হত্যাকারীদের গ্রেফতার করা হয়েছে। ছাত্রলীগের নাম আর পদবী নিয়েও তাদের শেষ রক্ষা হয় নি। সরকার তাদের আইনের হাতে সোপর্দ করেছে। লিমনের বিরুদ্ধে করা মামলাগুলো সরকার তুলে নিয়েছে। সাংবাদিক পেটানোর মামলায় আওয়ামী সংসদ সদস্য গোলাম মাওলা রনি কারাগারে। তবে এ সমস্ত উচিৎ কাজগুলো সময় মত করা হলোনা কেন? আওয়ামী লীগ শাসনামলে যুবলীগ ছাত্রলীগের চাঁদাবাজী, টেন্ডারবাজী, হল দখলদারী, মারাত্বক আকার ধারণ করে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। দূর্বল যুক্তি দেয়া হয়, কলেজ ইউনিভার্সিটি সহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিবিরের সীমাহীন দৌ্রাত্ব্য, ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি প্রতিহত করতে ছাত্রলীগের প্রয়োজন। আমি সেটা মনে করিনা। জামাত, বি এন পি'র ক্যাডারের প্রয়োজন আছে আওয়ামী লীগের থাকতে পারেনা। সশস্ত্র বিপ্লব নয়, সহিংস আন্দোলন নয়, অহিংস গনতান্ত্রীক আন্দোলনের মাধ্যমে স্বাধিকার কীভাবে আদায় করে নেয়া যায় অতীতে আওয়ামী লীগ এর প্রমাণ দেখিয়েছে। আজ সেই আওয়ামী লীগ তার মূল আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে, তাই তার ক্যাডারের প্রয়োজন পড়ে। ছাত্রলীগ

যুবলীগের সকল অপকর্মের দায়ভার অবশ্যই আওয়ামী লীগকে নিতে হবে। শিবিরকে দমন করা সরকারের দায়ীত্ব ছাত্রলীগের নয়। এ ব্যাপারে সাংসদ মন্ত্রীদের প্রশ্ন করেছি অনেকবার, সদুত্তর পাই নি বরং বলেছেন 'ওরাও তো তেমন করে'।

জামাত, বি এন পি'র বেঁচে থাকা সহিংসতা, মিথ্যাচার, প্রোপাগান্ডা, খুন, সন্ত্রাসের উপর নির্ভরশীল। ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্যে বিরোদ্ধমতের রাজনৈতিক দলের নেতাদের, মুক্তিযোদ্ধাদের খুন করা মেজর জিয়ার প্রয়োজন ছিল শেখ মুজিবের নয়।

এ পর্যায়ে এসে জামাত, তাদের সহযোগী সংগঠন ও সন্ত্রাসী শিবিরের আমলনামা খানা সংক্ষেপে পড়া যাক।

১৯৮১ সাল থেকে এ পর্যন্ত শিবিরের হাতে চট্টগ্রাম, ঢাকা, রাজশাহী, সিলেট বিশ্ববিদ্যালয়ে কতজন ছাত্রলীগ কর্মী খুন হয়েছে তার পূর্ণ হিসেব হয়তো আর পাওয়া যাবেনা।

১৯৮১- শিবির ক্যাডাররা চট্টগ্রাম সিটি কলেজের নির্বাচিত এজিএস ছাত্রলীগ নেতা তবারক হুসেনকে কলেজ ক্যাম্পাসেই কিরিচ দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেছিল। কিরিচের এলোপাতাড়ি কোপে মুমূর্ষ তবারক যখন পানি পানি করে কাতরাচ্ছিল তখন এক শিবির কর্মী তার মুখে পেশাব করেছিল। সেই থেকে এমন কোনো বৎসর নেই যে শিবিরের পান্ডারা কলেজ ইউনিভার্সিটিতে ছাত্র শিক্ষক খুন করেনি।

১৯৮২- চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে ৩ বাস বহিরাগত সন্ত্রাসী নিয়ে এসে শিবির ক্যাডাররা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্রদের উপর হামলা চালায়। এই সহিংস ঘটনায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবিরের রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

১৯৮৪- চট্টগ্রাম কলেজের সোহরাওয়ার্দী হলের ১৫ নম্বর কক্ষে শিবিরের কর্মীরা ছাত্র ইউনিয়ন নেতা ও মেধাবী ছাত্র শাহাদাত হোসেনকে জবাই করে হত্যা করে।

১৯৮৬- শিবির ডান হাতের কবজি কেটে নেয় জাতীয় ছাত্র সমাজের নেতা আবদুল হামিদের। পরবর্তীতে ঐ কর্তিত হাত বর্ষার ফলায় গেঁথে তারা উল্লাস প্রকাশ করে।

১৯৮৮- চাঁপাইনবাবগঞ্জের বীর মুক্তিযোদ্ধা ও জাসদ নেতা জালালকে তার নিজ বাড়ীর সামনে কুপিয়ে হত্যা করে শিবির ক্যাডাররা।

১৯৮৮- সিলেটে শিবির ক্যাডাররা মুনীর, জুয়েল ও তপনকে বর্বরভাবে হত্যা করে।

১৯৮৮- রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক মোঃ ইউনুসের বাসভবনে ছাত্র শিবির বোমা হামলা করে। এতে অধ্যাপক ইউনুস বেঁচে গেলেও তার বাড়ীর কর্মচারী আহত হয়।

১৯৮৯- নজরুল ইসলাম মিলনায়তনের সামনে সন্ধ্যায় জাসদ ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের ওপর শিবিরের বোমা হামলায় বাবু, রফিক সহ ১০ জন আহত হয়।

১৯৯০- ছাত্রমৈত্রীর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ সভাপতি ফারুকুজ্জামানকে শিবিরের ক্যাডাররা জবেহ করে হত্যা করে।

১৯৯২- শহিদ জননী জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযমের বিচারের দাবিতে গড়ে ওঠা আন্দোলনে হরতাল কর্মসূচি সফল করার লক্ষ্যে জাসদের মিছিল চলাকালে শিবিরের সশস্ত্র হামলায় সাহেব বাজার জিরো পয়েন্টে জাসদ নেতা মুকিম মারাত্মক আহত হন এবং ২৪ জুন তিনি মারা যান।

১৯৯৩- রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবির সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর সশস্ত্র হামলা চালালে ছাত্রদল ও সাবেক ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ মিলে গঠিত সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের উপর শিবিরের হামলায় ছাত্রদল নেতা বিশ্বজিৎ, সাধারণ ছাত্র নতুন এবং ছাত্র ইউনিয়নের তপন সহ ৫ জন ছাত্র নিহত হয়।

১৯৯৪- পরীক্ষা দিতে আসার পথে তৃতীয় বিজ্ঞান ভবনের সামনের রাস্তায় ছাত্রমৈত্রী নেতা প্রদুৎ রুদ্র চৈতীর হাতের কব্জি কেটে নেয় শিবির কর্মীরা।

১৯৯৫- জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের নেতা-কর্মীদের উপর সশস্ত্র শিবির কর্মীরা হামলা করে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছাত্রনেতা ফরহাদের হাতের কব্জি কেটে নেয়। এ হামলায় প্রায় ২৫ জন ছাত্রদল নেতা-কর্মীর হাত পায়ের রগ কেটে নেয় শিবির ক্যাডাররা।

১৯৯৬- জাসাস রাবি শাখার সাধারণ সম্পাদক আমান উল্লাহ আমানকে কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির সামনে প্রকাশ্য দিবালোকে কুপিয়ে হত্যা করে এবং ছাত্রদল নেতা ডুপ্লের হাত পায়ের রগ কেটে দেয়। এদের বাঁচাতে এসে দুইজন সহপাঠি ছাত্রী এবং একজন শিক্ষকও আহত হয়।

১৯৯৭- চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট দখল করার জন্য শিবির ক্যাডাররা ছাত্র সংসদের ভিপি মোহাম্মদ জমির ও কলেজ ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক ফরিদউদ্দিন আহমদকে গুলি করার পর পায়ের রগ কেটে হত্যা করে।

১৯৯৮- শিক্ষক সমিতির মিটিং থেকে ফেরার পথে রাবি শহিদ মিনারের সামনে অধ্যাপক মোঃ ইউনুসের ওপর সশস্ত্র হামলা চালায় ছাত্র শিবির। ছাত্র-কর্মচারীদের প্রতিরোধে অধ্যাপক ইউনুস প্রাণে বেঁচে গেলেও মারাত্মক আহত হন তিনি।

১৯৯৯- রাবিতে অবস্থিত ৭১ এর গণকবরে স্মৃতিসৌধ নির্মানের জন্য স্থাপিত ভিত্তি প্রস্তর রাতের আঁধারে ছাত্র শিবির ভাঙ্গতে গেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কর্মচারী বাধা দেন। ফলে শিবির ক্যাডাররা তাকে কুপিয়ে আহত করে এবং ভিত্তিপ্রস্তর ভেঙ্গে ফেলে।

২০০০- চট্টগ্রামের বদ্দরহাটে শিবির ক্যাডাররা মাইক্রোবাসের মধ্যে থাকা ৮ ছাত্রলীগ নেতাকর্মীকে প্রকাশ্য দিবালোকে ব্রাশফায়ার করে নৃশংসভাবে হত্যা করে।

২০০১- রাবি ছাত্রী হলে বহিরাগত অনুপ্রবেশকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত ছাত্রী বিক্ষোভে সশস্ত্র ছাত্র শিবির কমীরা কমাণ্ডো হামলা চালায় এবং ছাত্রীদেরকে লাঞ্ছিত ও রক্তাক্ত করে।

২০০২- রাবি সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট নেতা সুশান্ত সিনহাকে প্রকাশ্য দিবালোকে পিটিয়ে হাত-পা ভেঙ্গে দেয় শিবির কর্মীরা।

২০০২- হাওয়া ভবনের খুনীরা খুন করে প্রকৌশলী শফিক উল মাওলা টিপুকে।

২০০৪- অধ্যাপক মোঃ ইউনুসকে ফজরের নামাজ পড়তে যাবার সময় কুপিয়ে হত্যা করা হয়। যদিও এই হত্যা মামলায় জেএমবির দুইজন সদস্যকে ফাঁসি দেয়া হয়েছে। তারপরও এলাকাবাসী অনেকেরই মতামত হচ্ছে ছাত্র শিবিরের ক্যাডাররাই তাকে হত্যা করেছে। উল্লেখ্য, ১৯৮৮ ও ১৯৯৮ সালে দুই দফায় ছাত্র শিবির তাকে হত্যার চেষ্টা করেছিল।

২০০৪- জামাআতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ জেএমবির সশস্ত্র জঙ্গীরা নওগাঁ জেলার রানীনগর উপজেলার সিম্বা গ্রামের ইদ্রিস আলী ওরফে খেজুর আলী ও আব্দুল কাইয়ুম বাদশাকে নৃশংস ভাবে হত্যা করে। খুনীরা হত্যা করেই ক্ষান্ত হয়নি, বাদশার মরদেহ

উল্টো করে গাছে ঝুলিয়ে রাখে আর খেজুর আলীকে টুকরো টুকরো করে রানীনগরের ভেটি জেএমবির ক্যাম্পে মাটিতে পুতে রাখে।



২০০৪- বরিশালের বাবুগঞ্জের আগরপুর ইউনিয়নের ছাত্রমৈত্রীর সভাপতি শামীম আহমেদকে শিবির ক্যাডাররা হত্যা করে।

২০০৪ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারী একুশে বই মেলা থেকে ঘরে ফেরার পথে ডঃ হুমায়ুন আজাদের উপর বর্বরোচিত হামলা চালায় জোট সরকারের পোষা জামাতুল মুজাহিদীন ও হরকাতুল জিহাদ নামের ইসলামি জঙ্গীরা। চাপাতি'র আঘাতে রক্তাক্ত হয়েছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই শিক্ষক! দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে'র একজন শিক্ষকের উপর এমন আক্রমন জাতি হিসেবে আমাদের জন্য লজ্জা'র।



২০০৪ সালের ২১ আগষ্ট বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে সারা দেশে সন্ত্রাসী গ্রেনেড-বোমা হামলার প্রতিবাদে আয়োজিত সমাবেশে বর্তমান প্রধানমন্ত্রীকে লক্ষ্য করে সুপরিকল্পিত ও ঘৃন্য গ্রেনেড হামলা চালিয়ে বীভৎসময় মৃত্যুপুরীতে পরিণত করেছিল বি এন পি জামাতের ভাড়াটিয়া গুন্ডারা। ঐ পৈশাচিক হামলায় প্রাণ হারিয়েছিলেন মহিলা আওয়ামী লীগ নেত্রী আইভী রহমান সহ চব্বিশ জন। আর আহত হয়েছিলেন প্রায় ৪০০ নেতা কর্মী।



২০০৫- সন্ধ্যায় জুবেরী ভবনের সামনে রাবি ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি এস এম চন্দনের ওপর হামলা চালিয়ে তার রগ কেটে নেয়ার চেষ্টা চালায় শিবির ক্যাডাররা।

২০০৫- ১৭ আগষ্ট সারা দেশের ৬৩ জেলার ৫শ স্থানে প্রায় একই সময়ে বোমা হামলা চালায় জঙ্গি সংগঠন জামায়াতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ বা জেএমবি। এই হামলায় মারা যান ২ জন, আহত হয় প্রায় শতাধিক। দেশ বিদেশে আলোচিত এই বোমা হামলার পরবর্তীতে দেশের বিভিন্ন স্থানে জেএমবির আত্মঘাতি বোমা হামলায় বিচারক আইনজীবি পুলিশসহ নিহত হন ৩৩ জন।

২০০৬- বিশ্ববিদ্যালয়ের জামাতপন্থী শিক্ষক মহিউদ্দিন এবং রাবি ছাত্র শিবির সভাপতি মাহবুব আলম সালেহীন সহ আরো দুইজন শিবির ক্যাডার মিলে একযোগে অতর্কিতে হামলা চালিয়ে রাবির ভূতত্ত্ব ও খনিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক আবু তাহেরকে হত্যা করে।

২০০৬- রাবিতে অনুষ্ঠিত সেকুলারিজম ও শিক্ষা শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য দেয়ার অপরাধে অধ্যাপক হাসান আজিজুল হককে ক্যাম্পাসে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে শিবির। প্রকাশ্য সমাবেশে তারা অধ্যাপক হাসান আজিজুল হকের গলা কেটে বঙ্গোপসাগরে ভাসিয়ে দেয়ার ঘোষণা দেয়।

২০১০-রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগ কর্মী ফারুক হোসেনকে হত্যা করে ম্যানহোলের মধ্যে ফেলে রাখে শিবিরের ক্যাডাররা।

রাজশাহীতে শিবিরের বর্বরতা

ফেব্রুয়ারি ২০১৩, ইসলামী ছাত্রশিবিরের খুনীরা গণজাগরণ মঞ্চের কর্মী ব্লগার আহমেদ রাজীব হায়দারকে ছুরি দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে।



জামাত বি এন পি'র মিথ্যা ও প্রোপাগান্ডার দুষ্ট রাজনীতির খেলায় আওয়ামী লীগ এক অসম খেলোয়াড়। সুচতুর মাহমুদুর রহমান, তার 'আমার দেশ পত্রিকা' ও 'বাঁশের কেল্লা' ব্লগের নোংরা অপপ্রচারের বিপরীতে আওয়ামী লীগের কোন প্রচারসেল নেই, কোন কার্যকরী প্রতিরোধ নেই। তাদের প্রচার সেল বলতে আসলেই বোধ হয় কিছু নেই। ধর্মের নামে সারা দেশ জুড়ে যখন অধর্ম চলছে আওয়ামী লীগ তখন নিজের মুসলমানিত্ব প্রমাণে ব্যস্ত। রোম যখন পুড়ে নিরো তখন বাঁশি বাজায়। প্রচারণার অভাবেই আওয়ামী লীগের সাফল্যগুলো মানুষের নজর এড়িয়ে যায়, এবং বিরোধী শিবিরের ব্যাপক প্রচারণার ফলে আওয়ামী লীগের ইমেজ নষ্ট হয়। যে দেশের শতশত মানুষকে রাত প্রভাতে মাইকে ঘোষণা দিয়ে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলে 'আকাশের চাঁদে সাঈদীকে দেখা গেছে' বিশ্বাস করানো যায়, সেই সকল মানুষকে অবহেলা করে, তাদের থেকে দূরে থেকে, জনবিচ্ছিন্ন হয়ে নির্বাচনে জয়ী হওয়া সম্ভব নয়। প্রতিনিয়ত নিজ দলের কঠোর সমালোচনা করা দেখে আমার সহকর্মী বন্ধুরা মাঝেমাঝে আমাকে প্রশ্ন করেন, তাহলে আমি কেন আওয়ামীলীগ সমর্থন করি। আমি বলি বঙ্গবন্ধুর প্রতিষ্ঠিত, স্বাধীনতাযুদ্ধে নেতৃত্ব দানকারী, ধর্মনিরপেক্ষবাদী আর অসাম্প্রদায়িক চেতনা ধারনকারী

দল হিসেবে আওয়ামী লীগ সমর্থন করি। বাংলাদেশে এর বিকল্প বৃহৎ কোন দল এখন পর্যন্ত গড়ে উঠেনি তাই আওয়ামী লীগকে ঘিরে এখনও সপ্ন দেখি।

এই বিপর্যয়, এই দূরবস্থা থেকে উত্তরণে আওয়ামী লীগকে কী করতে হবে? কাঙ্গালের কথা হয়তো কেউ কানে তুলবেনা, তবে কথাগুলো বাসী হলে ফলতেও পারে। উত্তরণের চাবি কাঠিটা আছে শেখ হাসিনার হাতে-

- নিরংকুশ ক্ষমতার দম্ভ, অহংকার ত্যাগ করে জনগনের কাছে পৌছুতে হবে।
- অসম্পূর্ণ কাজগুলো সম্পন্ন না হওয়ার যৌক্তিক ব্যাখ্যা দিতে হবে।
- বিরোধী দলের সকল অপপ্রচার, মিথ্যাচার, প্রোপাগান্ডার জবাব সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরতে হবে।
- নিজেকে ধার্মিক পরিচয় দেয়ার কালচার থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।
- ডঃ ইউনুস উপাখ্যান নির্বাচনী প্রচারণায় দূর রাখতে হবে।
- গ্যাস-বিদ্যুত উৎপাদনের অগ্রগতি বিগত সরকারের সাথে তুলনামূলক ব্যবধান জনসমক্ষে তুলে ধরতে হবে।
- চার পাশে ঘিরে থাকা চাটুকারদের ঝেটিয়ে বিদায় করতে হবে।
- অযথা অকারণে বঙ্গবন্ধুর গুনগান করা, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস কপচানো বন্ধ করতে হবে।

আওয়ামী লীগ ছাড়া যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এই দেশে আর কেউ করবেনা বা করতে পারবেনা, তা আওয়ামী লীগের জনম শত্রুরাও স্বীকার করবে। আওয়ামী লীগ নেই মা'নেই তো হাওয়া ভবন, ছেড়া গেঞ্জি ভাঙ্গা সুটকেসের ঔরসে যুবরাজ। তারেক, ফালু, মামুন, সাকার ইতরামী। হিংস্র লাল চক্ষুর বাংলা ভাই, মুফতি হান্নান, শায়েখ আব্দুর রহমান। জে এম বি, হরকাতুল জিহাদ, ১৭ আগষ্ট, ২১ আগষ্ট, বাবর, মুজাহিদ, জজ মিয়া নাটক, মাজারে, আদালতে, সিনেমা হলে বোমা। চার সিটি করপোরেশন নির্বাচনের

পরে অনেকেই আগামী সাধারণ নির্বাচনে সিট গণনা করে বলে দিচ্ছেন আওয়ামী লীগের অবস্থান। কেউ বলছেন ত্রিশ আর কেউ বলছেন তিন। কেউ কেউ আরেকটু আগ বাড়িয়ে এমনও মন্তব্য করছেন যে, গোপালগঞ্জের সিটটাও এবার গেল। অনেকেই দাবী করছেন, তারা আওয়ামী লীগের বিদায় ঘণ্টাধ্বনি স্পষ্টই শুনতে পাচ্ছেন। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, অমুসলিম অবাঙ্গালী সম্প্রদায়, পাহাড়ের আদিবাসিদের মানসপটে জোটসরকারের শাসনামলের নৃশংস বিভৎস চিত্রগুলো আবার ভেসে উঠতে শুরু করেছে। আন্তর্জাতিক ট্রাইবুনালে যুদ্ধাপরাধীদের বিরোদ্ধে সাক্ষী দাতাগণ তাদের প্রাণের নিরাপত্তা নিয়ে ভাবিত হচ্ছেন। আজ যারা মানবতা বিরোধী জঘন্য অপরাধের জন্যে দন্ডিত হচ্ছেন, শাস্তি পাচ্ছেন, কাল তারা হয়তো সেই বিচারক, সেই যুদ্ধাপরাধী বিচারের দাবী উত্তোলনকারীদেকেই ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে দিবে। তাই আজ সঙ্গত কারণেই শঙ্কিত হই, তবে কি ফিরে আসছে সেই ভয়াবহ দিনগুলো?

মাননীয় প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা সমীপে

মাননীয় প্রধান মন্ত্রী,

১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ শনিবার টেলিভিশনে দেখলাম, নিহত ব্লগার আহমেদ রাজীব হায়দারের পরিবারকে সমবেদনা ও সান্ত্বনা দিতে আপনি মিরপুরের পলাশনগরে তাদের বাড়িতে গিয়েছিলেন। আসার পথে সাংবাদিকদের সামনে বলেছেন- জামায়াত-শিবিরের এদেশে রাজনীতি করার কোনো অধিকার নেই। কথাটা আমার পছন্দ হয় নাই, তাই আরেকটা লেখা মধ্যপথে থামিয়ে এই চিঠিটি লিখতে হলো। জামাতকে যখন তখন নিষিদ্ধ করার ক্ষমতা যে আপনার আছে বা ছিল তা আমি ভাল করেই বুঝি। বুঝলাম না শুধু ৯৬ এ কেন নয়, ২০০৮ এ কেন নয়, হঠাৎ করে ২০১৩ তে এসে এই আইডিয়াটা আসলো কেন আপনার মস্তিষ্কে? শাহবাগ আন্দোলন? এই কাজটা করতে রাজীব খুন হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হলো? আপনি রাজনীতির দুনিয়ার মানুষ,ভোটের হিসেবে কথা বলেন। আপনি হয়তো টেকনিক্যাল কারণে ৯৬ এ ২০০৮ এ ধরনের পদক্ষেপ নেয়া থেকে বিরত থেকেছেন। আগে জামায়াতকে নিষিদ্ধ করলে এদের সকল কর্মী বিএনপিতে যোগদান করতো এবং আওয়ামী লীগের জন্যে খতরনাগ হয়ে যেতো। এখন আর সেই অবস্থা নেই, শাহবাগ আন্দোলন রাস্তা ক্লিয়ার করে দিয়েছে। তা মাননীয় প্রধান মন্ত্রী,আপনি নিশ্চয়ই প্রজন্ম চত্বরের ‘‘জয় বাংলা’’ শ্লোগানের মর্মকথা অনুধাবন করতে পেরেছেন? এর অর্থ হলো-৭১এর চেতনা/ হারিয়ে যেতে দেবোনা। এই চেতনাকে সমূলে বিনষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে চল্লিশটি বছর যাবত। ধংসস্তুপের মাঝেও এই চেতনার সুপ্ত অংকুরটি বিকশিত হওয়ার পরিবেশ খুঁজছিল বারবার। এবার নিশ্চয়ই বুঝেছেন যে, তাসবিহ হাতে ঘুরা আর হেজাব নেকাব পরার আপনার কোনোই প্রয়োজন ছিলনা? কোনো প্রয়োজন ছিলনা শরিয়া আইন নিয়ে কথা বলার। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নের সকল সুযোগ সুবিধে আপনাকে সংবিধান

দিয়েছিল। কিন্তু আপনি নতুন প্রজন্মকে চিনতে ভুল করেছিলেন। আওয়ামী লীগের শত্রুরাও বিশ্বাস করে এই দেশে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার একমাত্র আওয়ামী লীগের পক্ষেই সম্ভব। ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করার ক্ষমতা একমাত্র আওয়ামী লীগই রাখে। বাহাত্তরের সংবিধান হাতে ফিরে পেয়েও আপনি কেন আজ শুধু জামাতকে নিষিদ্ধ করবেন, 'ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ' কেন নয়? জামাত ছাড়া কোন্ ইসলামী দলটা গনতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাস করে? কোন্ ইসলামী দলটা আর কোন মাদ্রাসার ওস্তাদ-ছাত্র মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহন করেছিল, বা আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে নাই? চল্লিশটা বছর যাবত এতো বোমা, এতো খুন, এতো সন্ত্রাস, সবটার পেছনেই জামাতে ইসলাম ছিল, আর কোনো ইসলাম ছিলনা?

ইসলামী ঐক্যজোট, খেলাফতে মজলিস, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম, উলামা মশায়েখ পরিষদ, খতমে নবুওত সহ বাংলাদেশের কোনো ইসলামিক দলই বাংলাদেশের সংবিধান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাস করেনা। রাজনৈতিক ইসলাম একটা মারাত্বক বিষধর সাপ, এক বিষবৃক্ষ। এই বিষবৃক্ষকে উপড়ে ফেলার, সমূলে ধ্বংস করার, কেটে ফেলার সুযোগ আপনার হাতে এসেছিল, আপনি সেই সুযোগ নেন নি। আজও আপনি মূল শেকড় জীবিত রেখে বৃক্ষের ডাল-পালা কাটছেন।

পঁচাত্তর থেকে ছিয়ান্নব্বই, অনেক দেরি করে ফেলেছেন। ৭৫ এ জন্ম নেয়া শিশু ৯৬ এ পূর্ণ যুবক। জন্মের পর থেকে মুক্তিযুদ্ধের বিকৃত ইতিহাস, সংবিধানে সাম্প্রদায়ীক শ্লোগান 'ইসলামি রাষ্ট্র' আর 'বিসমিল্লাহ' দেখে এসেছে। একুশ বছর নর্দমায় বসত করে আওয়ামী লীগও সেই দুর্গন্ধে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। একজন আওয়ামী মেয়র তো মরার আগে বলেই গেছেন যে, ধর্মনিরপেক্ষতায় তিনি বিশ্বাস করেন না। কথাটা আসলেই ঠিক। একজন মুসলমান ধর্মনিরপেক্ষ হয় কীভাবে? সে তো তার ধর্মের পক্ষেই থাকবে। যাক সেদিকে আজ যাবোনা। মনে আছে, বাহাত্তরের সংবিধানের মাধ্যমে ধর্ম ভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করার সুযোগ আপনার হাতে দুইবার এসেছিল, কিন্তু আপনি

তা দূরে ঠেলে দিয়েছিলেন। ভন্ড জিয়ার পঞ্চম সংশোধনী বাতিল হওয়ার পরেও পঞ্চদশ সংশোধনীতে ৩৮ অনুচ্ছেদের টেইলারিং করে তার উপর ছুরি চাকু চালানোর কোনো দরকার ছিল? সংবিধানে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম আর বিসমিল্লাহ রেখে কী লাভটা হলো? কিচ্ছুই হয় নাই। আপনার হেজাব, নেকাব, তাসবিহ শো-আপ শরিয়ার আইনে যুদ্ধাপরাধীর বিচার, নারী উন্নয়ন নীতিতে শরিয়া বহির্ভুত আইন না করা, কোরান বিরোধী বিল পাশ না করার অঙ্গীকার, শাহজালালের নামে ইয়ার্পোর্ট, ওলি আউলিয়ার নামে বিশ্ববিদ্যালয়, সংবিধানে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম আর বিসমিল্লাহ রাখা, এই সমস্তের কোনোই প্রয়োজন ছিলনা।

জাতীয় ঐক্যের জুজু দেখায়ে কাল ক্ষেপন করা সঠিক হবেনা। জামাতে ইসলামের স্থান অন্য ইসলাম দখল করে নিবে, তখন আবার পস্তায়ে লাভ হবেনা। ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করার কথা উঠলে কাদের গায়ে ফোসকা উঠে সেটা আপনি ভালই জানেন। হিন্দু নয়, বৌদ্ধ নয়, খ্রিস্টান নয়, গায়ে জ্বালা ধরে রাজনৈ্তিক ইসলামের। আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, ১৯৭২ সালে মূল সংবিধানে ‘ধর্মভিত্তিক বা ধর্মীয় নামযুক্ত’ কোনো রাজনৈতিক দল গঠনের সুযোগ ছিল না। এ সম্পর্কে ‘৭২ সালের সংবিধানের ৩৮ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছিল, “জনশৃংখলা ও নৈতিকতার স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ সাপেক্ষে সমিতি বা সঙ্ঘ গঠন করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে; তবে শর্ত থাকে যে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসম্পন্ন বা লক্ষ্যানুসারী কো্নো সাম্প্রদায়িক সমিতি বা সঙ্ঘ কিংবা অনুরূপ উদ্দেশ্যসম্পন্ন বা লক্ষ্যানুসারী ধর্মীয় নামযুক্ত বা ধর্মভিত্তিক অন্য কোনো সমিতি বা সঙ্ঘ গঠন করিবার বা তাহার সদস্য হইবার বা অন্য কো্নো প্রকারে তাহার তৎপরতায় অংশগ্রহণ করিবার অধিকার কোনো ব্যক্তির থাকিবে না।” মূল সংবিধানের এই বিধানের কারণে মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলামী ইত্যাদি রাজনৈতিক দলগুলো নিষিদ্ধ ছিল। ১৯৭৩ সালে প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কো্নো ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশগ্রহণের

সুযোগ পায়নি। পরবর্তীতে জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসে রাজনৈতিক দল বিধিমালা নামে অধ্যাদেশ জারি করে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোকে রাজনীতি ও নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেন। একইসঙ্গে পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে জেনারেল জিয়া ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানের ৩৮ অনুচ্ছেদকে বদলে দেন। পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে সংযোজিত ৩৮ অনুচ্ছেদে বলা হয়, "জনশৃংখলা ও নৈতিকতার স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ–সাপেক্ষে সমিতি বা সঙ্ঘ গঠন করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে।" ধর্মভিত্তিক রাজনীতির উপর নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত যে শর্তাংশ ছিল জিয়াউর রহমান তা ১৯৭৮ সালে দ্বিতীয় সামরিক ফরমান আদেশ নং–৪ এর মাধ্যমে বাতিল এবং পরবর্তীতে পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে তা সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করেন। এর ফলে ১৯৭৯ এর সংসদে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলো অংশগ্রহণের সুযোগ পায়।

আপনি জানেন মাননীয় প্রধান মন্ত্রী, হাইকোর্ট ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট হতে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল পর্যন্ত জিয়াউর রহমান সরকারের জারিকৃত বিভিন্ন সামরিক আইন ফরমান আদেশ দ্বারা সংবিধানের যে সকল বিধান সংশোধন করা হয়েছিল সেগুলো অবৈধ ও বাতিল বলে ঘোষণা করে। পরবর্তীতে আপিল বিভাগ কতিপয় মার্জনা সাপেক্ষে হাইকোর্টের আদেশ বহাল রাখে। তবে আপিল বিভাগ জিয়া সরকার কর্তৃক সংযোজিত ৩৮ অনুচ্ছেদের কোনো মার্জনা দেয়নি। আপিল বিভাগের রায় অনুযায়ী ২০১১ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি সংবিধান পুনর্মুদ্রণ করা হয়। পুনর্মুদ্রিত সংবিধানে ৩৮ অনুচ্ছেদটি '৭২ সালের মূল সংবিধানে যে রূপে ছিল সে রূপেই পুনঃস্থাপিত হয়। অর্থাৎ যে বিধানের কারণে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলো নিষিদ্ধ হয়ে যায় সে বিধানটি সংবিধানে ফেরত আসে। পুনর্মুদ্রিত সংবিধান প্রকাশের পর আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোর আর রাজনীতি করার কোনো সুযোগ নেই। ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলো নিষিদ্ধ

বলেই গণ্য হবে। কিন্তু আপনি, হ্যাঁ আপনি এক সমাবেশে বলেছিলেন, আপনার সরকারের ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধের কোনো চিন্তা নেই। কেন? কেন আপনি বারবার একই ভুল করেন? পরবর্তীতে পঞ্চদশ সংশোধনীতে '৭২ সালের সংবিধানে 'ধর্মভিত্তিক ও ধর্মীয় নামযুক্ত' রাজনৈতিক দলের উপর নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত যে শর্তাংশ ছিল তা বাতিল করে দেয়া হয়। তার স্থলে অন্য কয়েকটি শর্ত জুড়ে দেয়া হয়। এতে বলা হয়, "জনশৃংখলা ও নৈতিকতার স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে সমিতি বা সঙ্ঘ গঠন করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে; তবে শর্ত থাকে যে, কোনো ব্যক্তির উক্তরূপ সমিতি বা সঙ্ঘ গঠন করিবার কিংবা উহার সদস্য হইবার অধিকার থাকিবে না, যদি– (ক) উহা নাগরিকদের মধ্যে ধর্মীয়, সামাজিক এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়; (খ) উহা ধর্ম, গোষ্ঠী, নারী-পুরুষ, জন্মস্থান বা ভাষার ক্ষেত্রে নাগরিকদের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়; (গ) উহা রাষ্ট্র বা নাগরিকদের বিরুদ্ধে কিংবা অন্য কোন দেশের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী বা জঙ্গি কার্য পরিচালনার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়। বা (ঘ) উহার গঠন ও উদ্দেশ্য এই সংবিধানের পরিপন্থী হয়।"

রাজনৈ্তিক ইসলামের লক্ষ্য উদ্দেশ্য বুঝতে এতো বছর অপেক্ষা করতে হলো? আপনার মনে আছে, জাসদ, ওয়ার্কার্স পার্টি ও ন্যাপ এর 'নোট অব ডিসেন্ট' এর কথা? মহাজোটের শরীক বামপন্থি দলগুলো ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ সংক্রান্ত '৭২ সালের ৩৮ অনুচ্ছেদ সংযোজন ও রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম এই বিধানটি বাতিলের জোর দাবি জানিয়েছিল? কিন্তু আপনি আপনার সিদ্ধান্তে অনড় রইলেন।

১৭ আগষ্ট, ২১ আগষ্ট, সাতক্ষী্রায় আগুন, রামু ধ্বংস, উদীচি, আদালত, সিনেমা, থিয়েটার, মাজারে বোমা, তাসলিমা, দাউদ হায়দা্রকে দেশ থেকে বিতাড়ন, হুমায়ুন আজাদ, রাজিব হত্যা, শামসুর রহমান, আহমেদ শরিফ, আসিফকে খুনের চেষ্টা, লালন ভাস্কর্য, শাবির ভাস্কর্য ভাঙ্গা এর কোথাও অন্য ধর্ম আছে কি না? সুতরাং ধর্মভিত্তিক

রাজনীতি নিষিদ্ধ করার কথা বললে রাজনৈতিক ইসলামের গায়ে আগুন লাগবে এটাই স্বাভাবিক। আপনার সাথে আছে বাহাত্তরের সংবিধান আর দুনিয়া কাঁপিয়ে দেয়ার মত ক্ষমতাধর প্রজন্ম চত্বরের সৈনিকেরা। জামাতে ইসলামের রাজনীতি নয়,নিষিদ্ধ করুন ধর্মভিত্তিক রাজনীতি।

এক শাফিলিয়ার শোকগাঁথা

“I don’t pretend like we’re the perfect family no more,
desire to live is burning,
my stomach is turning,
but all they think about is honour,”– শাফিলিয়া



চঞ্চল মতির সুন্দর চেহারার একজন মেধাবী ছাত্রী ছিল ১৭ বছরের তরুণী শাফিলিয়া। আজ থেকে ৯ বছর পূর্বে ২০০৩ সালে এই নিরপরাধ মেয়েটিকে নির্মম ভাবে খুন করে তার আপন মা ও বাবা। আরো পাঁচ-দশটা মেয়ের মতো তার চোখেও সপ্ন ছিল। সাধ ছিল বড় হয়ে আইনজীবী হবে। পরাধীন নারী নয়, স্বাধীনভাবে একজন মানুষ হয়ে বাঁচতে চেয়েছিল শাফিলিয়া। ২০১০ সালে প্রকাশিত বাংলাদেশের ইত্তেফাক পত্রিকা থেকে ঘটনার কিছু কিছু বিবরণ এখানে তোলে দেয়া হলো।

পাকিস্তানি এই পরিবারটির বাস উত্তর পশ্চিম ইংল্যান্ডের চেশায়ারে। ৫০ বছর বয়স্ক ইফতিখার আহমেদ ও তার স্ত্রী ফারজানা আহমেদের (৪৭) চার কন্যা ও এক পুত্র নিয়ে

সংসার। ছেলেমেয়েরা জন্মসূত্রে ব্রিটেনের নাগরিক। ২০০৩ সালের ১১ সেপ্টেম্বর খুন করা হয় বড় মেয়ে শাফিলিয়া আহমেদকে। কিন্তু অসীম দক্ষতায় ইফতিখার আহমেদ তার মেয়ের লাশ গুম করে ফেলেন। ছেলেমেয়েদের শাসিয়ে দেন তারা যেন এ ব্যাপারে মুখে টু শব্দ না করে। শাফিয়ালা স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিলে কয়েকদিন পর তার স্কুলের পক্ষ থেকে যোগাযোগ করা হয় ইফতিখার দম্পতির সঙ্গে। স্কুল কর্তৃপক্ষকে তারা জানিয়ে দেন শাফিলিয়া 'নিখোঁজ' হয়েছে। আর নীরব থাকা নিরাপদ হবে না মনে করে তারা পুলিশের কাছে মেয়ের নিখোঁজ হওয়া নিয়ে একটা সাধারণ ডায়েরি করেন। শাফিলিয়ার স্কুলের পক্ষ থেকেও পুলিশের কাছে বিষয়টি অবহিত করা হয়। মাঠে নামে ব্রিটেনের পুলিশ ও গোয়েন্দারা। হন্য হয়ে তারা শাফিলিয়ার 'অপহরণকারীদের' পিছু ছুটে।

পরের বছর ইফতিখারদের আবাসস্থান থেকে ১১০ কিলোমিটার দূরে কাম্ব্রিয়ায় কেন্ট নদীতে বন্যায় ভেসে আসা কার্টনে ভর্তি একটি লাশের দেহাবশেষ পাওয়া যায়। তার সাথে থাকা ব্রেসলেট ও আংটি এনে পুলিশ ইফতিখার দম্পতিকে দেখান। তারা সনাক্ত করেন এটা তাদের মেয়েরই লাশ। কিন্তু কেবল হাড়গোড় থেকে পুলিশ কিছু বুঝে উঠতে পারে না। এক দফা ময়না তদন্ত হয়। কিছুই উদ্ধার করা গেল না। আরেক দফা ময়নাতদন্ত হয়। অভিমত দেয়া হয়, শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে। লাশ থেকে দাঁত এনে শাফিলিয়ার ডেন্টিস্টকে দেখানো হয়। তিনিও কিছু মনে করতে পারেন না। শেষে পরিচয় নিশ্চিত করতে ডিএনএ টেস্‌ট করা হয়। ডিএনএ টেস্টে প্রমাণ হয় এটা ইফতিখার দম্পতির 'গুম' হওয়া কন্যা শাফিলিয়া।

এবার পুলিশের সামনে দ্বিতীয় বিপদ। মা-বাবার চোখে কুমিরের অশ্রু। তারা দাবি তুললেন, আমাদের মেয়ের খুনিদের বের করে দিতে হবে, খুনের বিচার করতে হবে। পুলিশের উপর তারা চাপ দিতে থাকেন। জলজ্যান্ত আদরের মেয়েটা 'গুম' হয়ে গেল আর পুলিশ গোয়েন্দারা করছে কী! এভাবে কেটে যায় টানা সাত বছর। চরম লজ্জায়

পড়ে যায় বাঘা বাঘা ব্রিটিশ গোয়েন্দারা। কারণ দেশটিতে এভাবে দীর্ঘদিন খুনির লুকিয়ে থাকা কিংবা খুনের রহস্য উদঘাটন না হওয়া অনেকটা অবিশ্বাস্য। সব রাস্তাতেই চেষ্টা করে গোয়েন্দারা। কিন্তু কোনো ক্লু খুঁজে পায় না। এই ক্লু খুঁজে না পাওয়ার আরেকটা কারণ হলো সাক্ষীদের উর্দু ভাষা ও মা বাবার অনবরত নাটকীয় মিথ্যাচার। কিন্তু ঘটনা দেরিতে হলেও উদঘাটন হয় ছোট মেয়ে আলিশার এক অদভুত আচরণের মাধ্যমে। ২০১০ সালের ২৫ আগস্ট শাফিলিয়ার বাবা ইফতেখার আহমেদ এশার নামাজ পড়তে মসজিদে যান। তার ছোট মেয়ে আলিশা তার দুই বন্ধুকে নিয়ে তাদের নিজের বাড়িতেই ডাকাতি করে বসেন! মুখে কালো মুখোশ পরিহিত আলিশা ও তার দুই সঙ্গী তাদের বাড়িতে ঢুকে তার মা, দুই বোন এবং ভাইকে অস্ত্রের মুখে বেঁধে তাদের মুখে টেপ লাগিয়ে দেন। তারা ঘর থেকে প্রায় ৫০ হাজার মার্কিন ডলার সমমূল্যের নগদ অর্থ এবং স্বর্ণালংকার নিয়ে পালিয়ে যান। কয়েক দিনের মধ্যেই পুলিশ আলিশাকে সন্দেহ করে তাকে গ্রেফতার করে। জিজ্ঞাসাবাদে তিনি ঘটনার সাথে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেন। তার দুই সহযোগী লাপাত্তা হয়ে যায়। নিজের বাড়িতে ডাকাতি, এই অস্বাভাবিক ঘটনার কারণে আলিশাকে জিজ্ঞাসাবাদে মনোঃরোগ বিশেষজ্ঞের সহায়তা নেয়া হয়। এক পর্যায়ে আলিশা সাত বছর ধরে বুকের মাঝে যে কষ্ট লুকিয়ে রেখে বেড়ে উঠেছেন তা প্রকাশ করে হাউমাউ করে কেঁদে ওঠেন। কীভাবে তাদের ছোট ছোট ভাই-বোনের সামনে মা-বাবা তাদের বড় বোনকে হত্যা করেছিলেন সেই কাহিনি শোনান। কিন্তু তার কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করা ঠিক হবে না, এমন মনে করে পুলিশ তার বাবা ইফতিখার আহমেদ, মা ফারজানাসহ সব ভাই বোনের ফোনে আঁড়িপাতা শুরু করে। তাদের কথাবার্তা থেকে এই হত্যাকান্ডে জড়িত থাকার স্পষ্ট আলামত পেয়ে ২০১০ সালের ২ সেপ্টেম্বর গ্রেফতার করা হয় এই দম্পতিকে।

পুলিশ আদালতে জানায়, ২০০৩ সালে মেয়ে নিখোঁজ হওয়া সত্ত্বেও ইফতিখার পুলিশে খবর দেননি। তাদের কল লিস্ট চেক করে দেখা গেছে, তারা মেয়ের মোবাইলে কল

দেয়ারও চেষ্টা করেননি! তার মানে তারা জানতেন কল দিয়ে লাভ হবে না। অথচ এর আগে একবার শাফিলিয়া রাগ করে তার বান্ধবীর বাসায় চলে গেলে তাকে খুঁজে বের করতে হেন কোনো চেষ্টা বাকি রাখেননি তারা। একারণে এই দম্পতিকে সন্দেহভাজন হিসেবে ২০০৪ সালে একবার গ্রেফতার করা হয়েছিল। তবে তারা চমৎকার অভিনয় করে পুলিশকে বিশ্বাস করতে বাধ্য করেন যে তারা নির্দোষ। পরে তাদের ছেড়ে দেয়া হয়। পুলিশ যখনই তাদের ধার ভিড়তে চেয়েছে, সুচতুর ইফতেখার ও তার পাকিস্তানি ফ্যামিলি আত্মীয়রা পুলিশকে বর্ণবাদী, মুসলিম বিদ্বেষী অপবাদ দেয়ার চেষ্টা করেছেন। আলিশার কাছে আদালত প্রশ্ন করেন, কেন তার মা বাবা তার সম্ভাবনাময়ী বোনকে এভাবে খুন করলেন। জবাবে আলিশা জানান-

‘ঘটনার সময় আপা ছিলেন ১৭ বছরের তরুণী। পড়তেন এ লেভেলে। তুখোড় মেধাবী ছিলেন। তার স্বপ্ন ছিল পড়াশোনা শেষ করে বড় আইনজ্ঞ হবেন। ব্রিটেনের স্থানীয় মেয়েদের মতো স্বাধীনচেতা ছিলেন। কিন্তু মা বাবার চাওয়া ছিল আপা রক্ষণশীল ঘরানার মেয়ে হোন। সব সময় তার উপর চলতো মা বাবার গোয়েন্দাগিরি। আপা স্কুল থেকে ফিরলে গোপনে তার স্কুলব্যাগ চেক করা হতো। মোবাইল ফোনের কললিস্ট চেক করা হতো। ছেলেদের নাম্বারে কথা বলার প্রমাণ পেলে বকাঝকা করা হতো। বড় আপা পছন্দ করতেন জিন্সের প্যান্ট, টি শার্টসহ ব্রিটেনের নতুন প্রজন্মের সব পছন্দের পোশাক। চুলে রং লাগাতেন, ঠোঁটে লিপস্টিক পরতেন। কিন্তু আম্মা আব্বা এসব পছন্দ করতেন না। এক পর্যায়ে তারা সিদ্ধান্ত নেন, তাকে কৌশলে পাকিস্তানে নিয়ে সেখানে একটা ধর্মভীরু পরিবারের ছেলের সাথে তার বিয়ে দিয়ে দিবেন। একদিন তাকে পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে বিয়ে সাব্যস্ত হওয়ার পর আপা একদিন ওয়াশিং ব্লিচ পান করে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। আব্বা আম্মা ডাক্তারের কাছে মিথ্যা সাক্ষী দিলেন এই বলে যে, ঘরে ইলেক্ট্রিক ছিলনা তাই অন্ধকারে পানি মনে করে আপা ব্লিচ পান করেছেন। রুগ্ন, মৃতপ্রায় অবস্থায় আপাকে আবার ব্রিটেনে নিয়ে আসা হয়। ফিরে

এসে সুস্থ হয়ে তিনি আবার পড়াশোনায় মনোযোগী হোন। আপা ছিলেন স্কুলের সকলের প্রিয় মুখ। মেধাবী হবার কারণে শিক্ষকরা খুব স্নেহ করতেন। সব বিষয়ে এক শো পার্সেন্টের কাছাকাছি নম্বর পেতেন। সুন্দরী হবার কারণে বন্ধুরা তাকে 'অ্যাঞ্জেল' বা পরী বলে ডাকতো। রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে অগণিত সমাজ কল্যান কর্ম, চ্যারিটি সংস্থার কর্মসূচিতে অংশ নিতেন। বড় হয়ে সমাজকর্মী হওয়ার, মানুষের সেবা করার সপ্ন দেখতেন। পড়াশোনার মাঝে পার্টটাইম চাকরি করতেন একটি টেলিমার্কেটিং কোম্পানিতে। সেই উপার্জনের অর্থের একটা অংশ দাতব্য কর্মসূচিতে খরচ করতেন। লেটেস্ট ফ্যাশনের পোশাক, নতুন ডিজাইনের জুতা পছন্দ করতেন আর একই সাথে রান্না-বান্না এবং ঘরকন্যার কাজেও আপা ছিলেন সমান পটু। আপা ভাল ইংরেজি কবিতাও লিখতেন। তার ডাইরি ভরা প্রচুর ইংরেজি কবিতা ছিল'।



সব চেয়ে অবিশ্বাস্য কান্ডটা হলো, খুনের সিদ্ধান্তটা এসেছিল জন্মধারিনী মায়ের মুখ থেকে। আলিশা খুনের বর্ণনা দিচ্ছেন-

‘আপার দুই হাত শক্ত করে ধরে রেখেছেন আব্বা। আম্মা বললেন-অনেক হয়েছে, আর নয়। এখানেই খেলা শেষ করে দেয়া যাক! মার কথা শুনে বাবা তাকে বললেন একটা পলিথিন ব্যাগ আনার জন্য। মা তাই করলেন। এরপর বাবা জোরে একটা ধাক্কা মেরে আপাকে ঘরের মেঝের ওপর ফেলে দেন। বাবা তার দুই হাটু আপার দুই উরুর উপর তুলে দিয়ে তাকে অনড়ভাবে ধরে রাখেন। আর দুই হাত দিয়ে ধরে রাখেন আপার দুই বাহু। বাবার শক্তিশালী বিশাল শরীরের কাছে আপার কেবল মোচড়ামুচড়িই সার! পরে বাবা তাড়াতাড়ি পলিথিন ব্যাগটা আপার নাকে মুখে ‘সুন্দর করে’ চেপে ধরতে বলেন। মা তাই করেন। আপা জোরে জোরে নিঃশ্বাস টেনে দম নেয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু পলিথিন ব্যাগের কারণে সেটা সম্ভব হয় না। সে সর্বশক্তি দিয়ে গোঙানি দেয়ার চেষ্টা করে। আর মা সর্বশক্তি দিয়ে পলিথিনের ব্যাগটা নাকে মুখে অনড়ভাবে চেপে ধরে রাখার চেষ্টা করেন। কষ্টে আপার চোখ দুটো যেন গর্ত থেকে বের হয়ে আসছিল। একদিকে প্রাণে বাঁচার সর্বোচ্চ চেষ্টা, আরেক দিকে নাকমুখ বন্ধ করে নিঃশ্বাস বন্ধ করার জোর চেষ্টা। আমরা সকল ভাইবোন এই হত্যার দর্শক। অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি। একপর্যায়ে দেখা গেল, আপা রণে ভঙ্গ দিয়েছে! আর দাপাদাপি করছেন না। তারপর আপা নিঃশ্বাস নেয়ার চেষ্টা বন্ধ করে দিলেন। পা ছোড়াছুড়ি থামিয়ে দিলেন। বুঝলাম সব শেষ! মা মুখ থেকে পলিথিন ব্যাগটা সরিয়ে নিলেন। তারপর কোনো কারণ ছাড়াই আপার নিথর শরীরটার বুকের উপর বাবা কষে একটা লাথি দিলেন। আপাকে নির্মমভাবে হত্যা করতে দেখে আমি উপরের তলায় চলে যাই। কিছুক্ষণ পর আবার নিচে এসে উঁকি মেরে দেখার চেষ্টা করি, আব্বা আম্মা কী করছেন। দেখি মা একটি কার্টনে স্কচটেপ লাগাচ্ছেন আর বাবা আপার লাশ কার্টনে ভরার উপযুক্ত করার জন্য কেটে খন্ড খন্ড করছেন! বিভৎস এই দৃশ্য দেখে আমি আবার উপরে চলে যাই। কিছুক্ষণ পর দরজা খোলার শব্দ পেয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখি আব্বা কার্টনটা পাজাকোলা করে ধরে বাড়ির বাইরে নিয়ে যাচ্ছেন। এরপর গাড়িতে করে বাবা কার্টনটা কোথায় নিয়ে গিয়েছিলেন তা কেউ জানেনা’।

চোখের সামনে বড় বোনের নৃসংশ হত্যাকান্ড ও লাশ টুকরা করার দৃশ্য দেখে শাফিলিয়ার ভাই বোনদের মধ্যে মৃত্যুভয় ঢুকে যায়। তারা সীমাহীন কষ্টে নিজেদের মধ্যে ঘটনাটি গোপন রাখে। তাদের হুমকি দেয়া হয়েছিল, কেউ জানতে পারলে তাদের পরিণতিও শাফিলিয়ার মতো হবে। ইফতেখার আহমেদ ও তার স্ত্রী ফারজানা তাদের সন্তানদের এমন ভাবে মিথ্যা বলার ট্রেইনিং দিয়েছিলেন তা শুনে অবাক হতে হয়। বেশ কয়েকবার ছোট ছেলে ও ছোট মেয়ে খুব দক্ষতার সাথে পুলিশকে ধোকা দিতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু কোন নোংরা মিথ্যাই পবিত্র সত্যটাকে ঢেকে রাখতে পারেনি।

ডাকাতি মামলায় তাদের ছোট মেয়ে আলিশাকে গ্রেফতার করার পর আলিশাই জানিয়ে দেন ওই খুন তার মা বাবা করেছেন। তার কথা পুরোপুরি বিশ্বাস না হওয়ায় বাড়ির সবার ফোনে আঁড়ি পাতা হয়। ফোনে একদিন ফারজানা (শাফিলিয়ার মা) স্বামীর কাছে জানতে চান, 'আমরা ধরা পড়বোনা তো, আমাদের শাস্তি হবেনা তো'? ইফতিখার তার স্ত্রীকে অভয় দিয়ে বলেন, 'চিন্তা করো না। আমাদের অপরাধ আদালতে প্রমাণ করার কোনো সুযোগই রাখিনি।'



আরেকদিন তিনি স্ত্রীকে বলেন, ‘ব্রিটেনে খুনের ঘটনা শতভাগ নিশ্চিত না করতে পারলে সাজা হয় না। তুমি যদি ৪০ জনকেও খুন করো, তুমিই যে খুন করেছো এটা শতভাগ প্রমাণ না করা পর্যন্ত কিছুই করতে পারবে না আদালত!’

পুলিশ শতভাগ নিশ্চিত হয়েই তাদেরকে গ্রেফতার করেছিল। এখান থেকে তাদের মুক্তির কোনো উপায় ছিলনা, শুধু প্রমাণের জন্যে সময়ের অপেক্ষাই এই দেরির কারণ। সে দিন আদালতে মা বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে কন্যা আলিশা আবেগপ্রবণ হয়ে সাক্ষ্য দেয়া বন্ধ করে দিতে পারে, এই আশঙ্কায় তার কাঠগড়ার সামনে একটি পর্দা ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছিল যাতে সে তার মা-বাবার মুখ দেখতে না পারে। আলিশার মুখে, জন্মদাতা পিতা ও গর্ভধারিনী মায়ের হাতে নিজের আপন সন্তান খুনের লোমহর্ষক এই হত্যাকান্ডের অবিশ্বাস্য ঘটনার বর্ণনা শুনে সেদিন চেশ্যেয়ার আদালতই নয় সারা দুনিয়া হতবাক হয়ে গিয়েছিল। আজ ৩রা আগষ্ট শুক্রবার ২০১২ আদালত সেই দুই ঘাতক খুনীদের ২৫বছরের কারাদন্ড শাস্তি দিয়েছেন। সারা দুনিয়া অবাক বিষ্ময়ে তাকিয়ে দেখলো কেমন করে সামাজিক প্রথা, অন্ধ বিশ্বাস আর তথাকথিত পারিবারিক ঐতিহ্যের কাছে হার মানলো রক্তসম্পর্কের পবিত্র ভালবাসা।

www.youtube.com/watch?v=suCtN-e9Gkc

আরো তথ্যাবলি-

দ্যা ইনডিপেন্ডেন্ট-

দ্যা টেলিগ্রাফ-

দৈনিক ইত্তেফাক-

ইয়োর্কশ্যার পোষ্ট-

ঈশ্বরের ভাষা

"The mind of a bigot is like the pupil of the eye; the more light you pour upon it, the more it will contract."

-Oliver Wendell Holmes

আল্লাহর বাণী বলে মুহাম্মদ কোরানে যা কিছু বলেছেন, তার সর্বপ্রথম বাক্যটি ছিল কোরানের ৯৬ নম্বর সুরা আলাক এর প্রথম বাক্য- 'পাঠ করুন আপনার পালনকর্তার নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন'। আর সর্বশেষ বাক্য ছিল ৫ নম্বর সুরা মায়েদা এর ৩ নম্বর বাক্য- 'আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্নাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম'। এই প্রথম ও শেষ সুরা, প্রথম বাক্য ও শেষ বাক্য নিয়েও তাফসিরকারকদের মধ্যে প্রচুর মতভেদ মতানৈক্য আছে। প্রথম সুরা 'আলাক' কীভাবে কোরানের ৯৬ নম্বর সুরা হলো, আর ৫ নম্বর সুরা মায়েদার ৩ নম্বর আয়াতের পরে কোরানে এতো সুরা এতো বাক্য আসলো কোত্থেকে সে প্রশ্ন তো আছেই। আরাফাতের ময়দানে শেষ বাক্যগুলো উচ্চারণের পর মুহাম্মদ যে সময়টুকু বেঁচে ছিলেন, সেই সময়ে কোরান সংকলন করা তার পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়। তিনি তা কল্পনাও করেন নি।

সুরা আলাকের প্রথম বাক্যের পর বলা হয়েছে- *'সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে। পাঠ করুন, আপনার পালনকর্তা মহা দয়ালু, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন, শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না। সত্যি সত্যি মানুষ সীমালংঘন করে, এ কারণে যে, সে নিজেকে অভাবমুক্ত মনে করে। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তার দিকেই প্রত্যাবর্তন হবে'।* এ পর্যন্ত বাক্যগুলো পড়ে স্পষ্টই বুঝা যায়, এখানে বক্তা

জিব্রাইল। সম্পূর্ণ সুরায় আল্লাহ সব সময়ই থার্ড পার্সন, (তিনি, যিনি, তোমার পালনকর্তা)। আর 'আমরা' বলতে জিব্রাইল না আল্লাহ, না উভয় তা'ও বুঝা মুশকিল।

বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর, উপরোল্লিখিত আটটি আয়াত নিয়ে মুহাম্মদ মক্কার কা'বা ঘরে ঢুকলেন। কোরায়েশ নেতা আবু জেহেল, মুহাম্মদকে বললেন যে, কা'বা ঘর ভন্ডামীর জায়গা নয়। এর পর আবু জেহেলকে উদ্দেশ্য করে মুহাম্মদ আবৃতি করলেন এই সুরার পরবর্তি বাক্যগুলো- 'আপনি কি তাকে দেখেছেন, যে নিষেধ করে, এক বান্দাকে যখন সে প্রার্থনা করে? আপনি কি দেখেছেন যদি সে সৎপথে থাকে। অথবা খোদাভীতি শিক্ষা দেয়। আপনি কি দেখেছেন, যদি সে মিথ্যারোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়। সে কি জানে না যে, আল্লাহ দেখেন? কখনই নয়, যদি সে বিরত না হয়, তবে আমরা তাকে মস্তকের সামনের কেশগুচ্ছ ধরে হেঁচড়াব, মিথ্যাচারী, পাপীর কেশগুচ্ছ। অতএব, সে তার সভাসদদেরকে আহবান করুক। আমরাও আহবান করব জাহান্নামের প্রহরীদেরকে। কখনই নয়, আপনি তার আনুগত্য করবেন না। আপনি সেজদা করুন ও নৈকট্য অর্জন করুন'।

কা'বা ঘরে ৩৬০ দেবতার উপস্থিতিতে মুহাম্মদ কীভাবে, কার প্রার্থনা করেন? কেউ কেউ বলেন মুহাম্মদ সেখানে নামাজ পড়তে গিয়েছিলেন। কিসের নামাজ, কোরান নেই, আলহামদু নেই, সুরা নেই, কী দিয়ে, কীভাবে তিনি নামাজ পড়লেন? আবু জেহেল মুহাম্মদকে নিষেধ করার পর, কা'বা ঘরের ভিতরে মুহাম্মদের সাথে যে ঘটনা ঘটেছিল, যে ঘটনায় মুহাম্মদ জড়িত ছিলেন, তাকে আবার আল্লাহ কেন জিজ্ঞেস করেন 'আপনি কি তাকে দেখেছেন, যে নিষেধ করে, এক বান্দাকে যখন সে প্রার্থনা করে? আপনি কি দেখেছেন যদি সে সৎপথে থাকে, অথবা খোদাভীতি শিক্ষা দেয়। আপনি কি দেখেছেন, যদি সে মিথ্যারোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়'? আল্লাহ বা জিব্রাইল কেন মানুষের মত ধমক দেন? অন্যান্য সুরায় দেখা যায় আল্লাহ প্রায়ই মানুষকে চ্যালেঞ্জ করেন, মানুষের বিরুদ্ধে ষঢ়যন্ত্র করেন, মানুষের কাছে কর্জ চান, মানুষ তীর নিক্ষেপ করলে আল্লাহও

তীর মারেন, মানুষে হাসাহাসি করলে আল্লাহও হাসাহাসি করেন। কেন আল্লাহ মানুষের মত চুল ছিড়াছিড়ি করতে চান? বদর যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে ফিরে এসে সেই যুদ্ধের ফিডব্যাক করা হলো, বলা হলো- 'আমার ইচ্ছা ছিল তোমরা জয়ী হবে'। আবু জেহেলের নেতৃত্বে কোরায়েশগণ, আবু সুফিয়ানের বণিকদলকে উদ্ধার করতে যদি বদরের মাঠে না আসতেন, সুরা আনফাল কি লেখা হতো? আর যদি এ যুদ্ধের ঘটনা আগে থেকেই লাওহে মাহফুজে লেখা থাকে, তাহলে কোরায়েশদের দোষটা কোথায়? সমস্ত কোরান জুড়ে কেন, কোন ঘটনা ঘটার পরে, ঘটনার ফলাফল জেনে, সেই অনুযায়ী বাক্য বসানো হলো?

আমাদের হাতের কাছে কোরান নামক বইখানি যে, মানুষের হাতের লেখা তা বিশ্বাস না করার কোন উপায় নেই। আমরা জানি, জিব্রাইল স্বর্গ থেকে আল্লাহর হাতের লেখা কোরানের পৃষ্ঠা ছিড়েছিড়ে এনে মুহাম্মদের হাতে তুলে দিতেন না। মুহাম্মদের চোখের সামনে যখন কোনো ঘটনা ঘটেছে, সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট বাক্যসমুহ পূর্বে লিখিত লাওহে মাহফুজে রাখা কোরান থেকে আল্লাহ কি জিব্রাইলকে মুখস্ত করায়ে পৃথিবীতে পাঠাতেন মুহাম্মদকে শুনাতে? জিব্রাইলের কাছ থেকে শুনে মুহাম্মদ তা মানুষকে শুনাতেন? আসল ঘটনা হলো মানুষ মুহাম্মদের কাছ থেকে শুনে, যে যেভাবে শুনতেন, বুঝতেন ঘটনা সেই ভাবে লিখে রাখতেন, পাতলা পাথরে, বৃক্ষের ছালায়, খেজুর পাতায় কিংবা পশুর চামড়ায়। সুতরাং বুঝা গেল মানুষের হাত ছাড়া কোরান লেখা হয় নাই। কী আশ্চর্য, একশো পার্সেন্ট গ্যারান্টি দিয়ে বলা হয়, এই কোরানে কোনো ভুল থাকতে পারেনা। মানুষ তো ফেরেস্তা নয়, শয়তান নয়, আল্লাহও নয় যে তাদের ভুল হবেনা। যে সকল মানুষের জন্মই হয়নি, যে সকল ঘটনা তখনো ঘটেনি, তা কীভাবে সেই মানুষের জন্মের পূর্বে, সেই ঘটনা ঘটার পূর্বে লিখে রাখা হলো? যেমন আয়েশার উপর অসতীর অপবাদ, জয়নাবের ঘরে মধু কেলেংকারী, হাফসার ঘরে মুহাম্মদ ও ম্যারিয়ার নারী কেলেংকারী ঘটনা, বদরের যুদ্ধ, হোনায়েনের যুদ্ধ, তাবুকের

যুদ্ধ ইত্যাদি যদি হাজার বছর আগেই আল্লাহ কোরানে লিখে রাখেন, তাহলে বলতে হবে জগতের সকল অমঙ্গল, অশুভ কাজ আল্লাহর ইচ্ছায়ই হয়েছে, এখানে মানুষের কোনো দায়ভার নেই। কারণ ঐ সমস্ত অশুভ, অঘটন না ঘটলে আল্লাহর কোরান লেখা মিথ্যে হয়ে যেত। তাহলে যাদের দ্বারা জগতে অশুভ ঘটনা ঘটলো তাদের দোষটা কোথায়? আল্লাহ সরাসরি কোরানে সমসাময়িক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থিত জনতাকে প্রশ্ন করেছেন, ধমক দিয়েছেন, 'বর্তমান কাল' এর বাক্য ব্যবহার করে। আয়েশার উপর লোকে যখন অসতীর অপবাদ দিল, আল্লাহ বললেন, 'হে মুমিনগণ তোমরা কেন বললে না, এ ঢাহা মিথ্যা'? কিংবা, আবু লাহাব যখন বললেন, 'মুহাম্মদ তুমি উচ্ছন্নে যাও' আর আল্লাহ বললেন 'তাব্বাত ইয়াদা আবি লাহাব– আবু লাহাব তুমি ধ্বংস হও'; এরকম 'বর্তমান কাল' ব্যবহার করে বাক্য আগে থেকে লাওহে মাহফুজে লিখে রাখা সম্ভব নয়। কোরান বলছে, আল্লাহ যখন বলেন 'হও' তখনই তা ঘটে যায় বা হয়ে যায়। আল্লাহ বললেন 'আবু লাহাব তুমি ধ্বংস হও' তখন তাতক্ষণিকভাবে আবু লাহাবের মৃত্যু হলোনা কেন? আবু লাহাব যদি মুহাম্মদকে বলতেন না, 'মুহাম্মদ তুমি উচ্ছন্নে যাও' তাহলে কি সুরা লাহাব লেখা হতো? এ সকল প্রশ্নের একটাই উত্তর, আর তা হলো, কোরানে যা বলা হয়েছে সবই মুহাম্মদের মুখের কথা। আর সেই কারণে পৃথিবীর অন্যান্য সব বই নিয়ে যেমন আলোচনা সমালোচনা করা যায়, কোরানের সত্যতা, এর ভাষাগত, ব্যাকরণগত মান, ও জাগতিক ব্যাপারে কোরানের বক্তব্য নিয়ে গঠনমূলক যৌক্তিক আলোচনা সমালোচনা করাও অবশ্যই অন্যায় কিছু হতে পারেনা।

জীবনের শেষ ২২ বৎসর ৫ মাস ১৪ দিনে মুহাম্মদ যে কথাগুলো বিভিন্ন সময়ে, সামাজিক, পারিবারিক, ব্যক্তিক, রাজনৈতিক পরিবেশের মুখোমূখী হয়ে, আল্লাহর বাণী বলে মানুষকে বিশ্বাস করতে বলেছিলেন, সেগুলো মুহাম্মদের জীবদ্দশায় সংগ্রহ করা আদৌ সম্ভব ছিলনা। প্রথম শাসনকর্তা আবু বকর থেকে ওমর, উসমান, আলি হয়ে মুয়াবিয়ার শাসনকাল পর্যন্ত সময়ে, ধাপে ধাপে কোরান সংকলন কমিটি করে, যথেষ্ঠ

সময় ও অর্থ ব্যয় করে, সীমাহীন মতানৈক্য, ঝগড়া-বিবাদ, তর্কবিতর্কের মাধ্যমে, যথাসম্ভব ব্যাকরণগত ভুলসমুহ সংশোধন করে, প্রচুর দাড়ি, কমা, অক্ষর, শব্দ ও বাক্য বিলুপ্ত ও সংযোজন করে, কোরানকে বর্তমান রূপে উপস্থাপন করা হয়েছে। এতো কিছুর পরেও ব্যাকরণগত ভুল, বস্তুজগতের স্বাভাবিক নিয়মের পরিপন্থী, পদার্থ বিজ্ঞানের সাথে সাংঘর্ষিক অনেক কিছুই কোরানে রয়ে গেছে। এ নিয়ে মুক্তমনায় বেশ কিছু লেখা বাংলা ও ইংরেজিতে দেয়া আছে।

আমি এই প্রবন্ধে সংক্ষিপ্তাকারে কোরানের কিছু ব্যাকরণগত ভুলসমুহ তুলে ধরবো।

ব্যাকরণগত ১ম ভুল-

কোরানের ৫ নং সুরা মায়েদার ৬৯ নং বাক্যটি লক্ষ্য করুন-

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّابِؤُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وعَمِلَ صَالِحًا
فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ

'নিশ্চয় যারা মুসলমান, যারা ইহুদি, সাবেয়ি, খ্রিস্টান, তাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে আল্লাহর প্রতি, কিয়ামতের প্রতি এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না'। (সুরা ৫ মায়েদাহ, আয়াত ৬৯)

এবার নিচের বাক্যটি দেখুন-

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ
بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

‘নিশ্চয় যারা মুসলমান, যারা ইহুদি, সাবেয়ি, খ্রিস্টান অগ্নিপুজক এবং যারা মুশরেক, কেয়ামতের দিন আল্লাহ অবশ্যই তাদের মধ্যে ফায়সালা করে দেবেন। সবকিছুই আল্লাহর দৃষ্টির সামনে’। (সুরা ২২ হাজ্জ্, আয়াত ১৭)

হুবহু আরেকটি আয়াত হলো ২নং সুরা বাকারার ৬২ নং আয়াত। সেখানেও وَالصَّابِئِينَ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, এবং উভয় জায়গায় শুদ্ধভাবেই বলা হয়েছে। কিন্তু ব্যাকরণের ক্রীয়াপদ, ক্রীয়াপদের ধাতুরূপ (To conjugate a verb) আর (nominative বা indicative) কর্তৃকারক, কর্মকারক (accusative বা subjunctive) শব্দের শুদ্ধ ব্যবহার পদ্ধতি না জানার কারণে মুহাম্মদ, ৫ নং সুরা মায়েদার ৬৯ নং বাক্যে وَالصَّابِؤُونَ ‘সাবিয়ূন’ বলে যে ভুল করেছেন, ঠিক তার উল্টা দ্বিতীয় ভুলটি করেছেন এখানে-

لَّـكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلاَةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أُوْلَـئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ‘

কিন্তু যারা তাদের মধ্যে জ্ঞানপক্ষ ও ঈমানদার, তারা তাও মান্য করে যা আপনার উপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে আপনার পূর্বে। আর যারা নামাজে অনুবর্তিতা পালনকারী, যারা জাকাত দানকারী এবং যারা আল্লাহ ও কেয়ামতে আস্থাশীল। বস্তুতঃ এমন লোকদেরকে আমি দান করবো মহাপুণ্য’। (সুরা ৪ নিসা, আয়াত ১৬২)

ব্যাকরণ অনুযায়ী এখানে ‘ওয়ালমুকিমিনা’ শব্দটি ‘ওয়ালমুকিমুনা’ হবে, হওয়া উচিৎ। সুরা মায়েদায় ‘ওয়াও’ বর্ণ ব্যবহার করে ‘সবিয়ূন’ বলে যে ভুল করেছিলেন, এখানে ‘ওয়াও’ ব্যবহার না করে ‘ওয়ালমুকমিনা’ বলে একই ভুল করলেন।

৩য় ভুল-

لْمُثْلَىا بِطَرِيقَتِكُمُ وَيَذْهَبَا بِسِحْرِهِمَا أَرْضِكُم مِّنْ يُخْرِجَاكُم أَن يُرِيدَانِ لَسَاحِرَانِ هَذَانِ إِنْ قَالُوا
'

তারা বললঃ এই দুইজন নিশ্চিতই যাদুকর, তারা তাদের যাদু দ্বারা তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বহিস্কার করতে চায় এবং তোমাদের উৎকৃষ্ট জীবন ব্যবস্থা রহিত করতে চায়'। (সুরা ২০ তোয়া-হা, আয়াত ৬৩)

এখানে ঠিক আগের (nominal Sentence) বাক্যগুলোর মত 'হাজানি' শব্দের আগে 'ইন্না' ব্যবহার করার কারণে (nominal sign) 'ইয়া' বসায়ে শুদ্ধ শব্দটি হবে 'হাজাইন'। বাক্যটি 'কালু ইন্না হাজানি লাসা-হিরান' না হয়ে শুদ্ধ বাক্যটি হবে 'কালু ইন্না হাজাইনি লাসা-হিরান'।

জালালাইন ব্যাখ্যা দিচ্ছেন-

They said, to each other, 'These two men (hādhān, হাজান this [form] concords with the forms used by those [grammarians] who use the alif [ending] for all three cases of the dual person; Abū 'Amr has [the variant reading] hādhayn হাজাইন) are indeed sorcerers who intend to expel you from your land by their sorcery, and do away with your excellent traditions (muthlā, the feminine form of amthal, meaning 'the noblest') in other words, [they will do away with the loyalty of] the noblemen among you, because these [latter] will prefer the two of them [Moses and Aaron] on account of their triumph.

৪র্থ ভুল-

وْمِوَالْيَ بِاللّهِ آمَنَ مَنْ الْبِرَّ وَلَـكِنَّ وَالْمَغْرِبِ الْمَشْرِقِ ◌َ قِبَلَ وُجُوهَكُمْ تُوَلُّواْ أَن الْبِرَّ لَّيْسَ
وَابْنَ لْمَسَاكِينَوَا وَالْيَتَامَى الْقُرْبَى ذَوِي حُبِّهِ عَلَى الْمَالَ وَآتَى يِّينَوَالنَّبِ وَالْكِتَابِ الآخِرِوَالْمَلآئِكَةِ

السَّآئِلِينَ وَفِي السَّبِيلِوَ الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ
وَالصَّابِرِينَ فِيالْبَأْسَاء والضَّرَّاء وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَـئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

‘সৎকর্ম শুধু এই নয় যে, পূর্ব কিংবা পশ্চিমদিকে মুখ করবে, বরং বড় সৎকাজ হল এই যে, ঈমান আনবে আল্লাহর উপর কিয়ামত দিবসের উপর, ফেরেশতাদের উপর এবং সমস্ত নবী-রসূলগণের উপর, আর সম্পদ ব্যয় করবে তাঁরই মহব্বতে আত্নীয়-স্বজন, এতীম-মিসকীন, মুসাফির-ভিক্ষুক ও মুক্তিকামী ক্রীতদাসদের জন্যে। আর যারা নামাজ প্রতিষ্ঠা করে, জাকাত দান করে এবং যারা কৃত প্রতিজ্ঞা সম্পাদনকারী এবং অভাবে, রোগে-শোকে ও যুদ্ধের সময় ধৈর্য্য ধারণকারী তারাই হল সত্যাশ্রয়ী, আর তারাই পরহেজগার’। (সুরা ২ বাকারা, আয়াত ১৭৭)

এখানে মোট পাঁচটি ব্যাকরণগত ভুল আছে। চারটিতে ক্রীয়াপদে ভুল Tense (কাল) ব্যবহার করা হয়েছে। বাক্যটি শুরু হয়েছে ‘তুয়াল্লু’ (মুখ করো) Present Tense (বর্তমান কাল দিয়ে), অথচ পরবর্তি চারটি ক্রীয়াপদে Past Tense (অতীত কাল) ব্যবহার করা হয়েছে। উপরের আরবি বাক্য যেভাবে বলা হয়েছে, যদি হুবহু তার ইংরেজি অনুবাদ করা হয় তাহলে বাক্যটি দাঁড়ায় এ রকম-

"It is not righteousness that ye turn your faces to the East and the West; but righteousness is he who believed in Allah and the Last day and the angels and the Book and the Prophets; and gave his wealth,... and performed prayer and paid the alms."

অনুবাদকগণ ভুল টের পেয়েই Tense পরিবর্তন করে believed, gave, performed এবং paid না লিখে Present Tense দিয়ে অনুবাদ করেছেন। শুদ্ধ আরবি ব্যাকরণে-

মান আ-মানা বিল্লাহি ওয়াল ইয়াওমিল আ-খেরি –

এখানে সঠিক বাক্য হবে- মান তু'-মিনু বিল্লাহি ওয়াল ইয়াওমিল আ-খেরি–

ওয়া আ-তাল মা-লা আ'লা- হুব্বিহি

এখানে সঠিক বাক্য হবে- ওয়া তু'-তুল মা'-লা আ’ লা-হুব্বিহি–

ওয়া আকা-মাস সালা-ত

এখানে সঠিক বাক্য হবে- ওয়া তু'-কিমুস সালাত–

ওয়া আ-তাজ জাকাত

এখানে সঠিক বাক্য হবে- ওয়া তা'-তুজ জাকাত–

উপরোক্ত বাক্যের শেষের দিকে ওয়াসসা'-বিরি-না শব্দটি হবে ওয়াসসা'-বিরু-না, যেমন প্রথম শব্দ, ওয়াল মু-ফু-না দিয়ে শেষের লাইন শুরু হয়েছে। অর্থাৎ ‘ওয়াল মু-ফু-না বিআহদিহিম ইজা আ-হাদু ওয়াস সা-বিরিন’ না হয়ে, শুদ্ধ বাক্যটি হবে- ‘ওয়াল মু-ফু-না বিআহদিহিম ইজা আ-হাদু ওয়াস সা-বিরুন’।

এবার সুরা বাকারার ২৮৫ নং বাক্যটি দেখুন- আ'-মানা ররাসু-লু বিমা- উনজিলা ইলাইহি- –

The Messenger has believed in what was revealed to—

লক্ষ্য করুন, ইংরেজি অনুবাদে Past Tense দিয়ে অনুবাদ করা হয়েছে। অথচ এই সুরার ১৭৭ নং আয়াত মান আ-মানা বিল্লাহি – আয়াতের ইংরেজি অনুবাদে Present Tense ব্যবহার করা হয়েছে।

৫ম ভুল-

إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثِمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ

নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত হচ্ছে আদমেরই মতো। তাকে মাটি দিয়ে তৈরি করেছিলেন এবং তারপর তাকে বলেছিলেন হয়ে যাও, সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেলেন। (সুরা ৩ ইমরান, আয়াত ৫৯)

"The likeness of Jesus, in God's sight, is as Adam's likeness; He created him of dust, then said He unto him, 'Be,' and he was." একমাত্র Pickthall তার অনুবাদে লিখেছেন, ‘He created him of dust, then He said to him 'Be,' and he is’.

আরবি বাক্যটি যেভাবে কোরানে লেখা হয়েছে, সেই অনুসারে Pickthall এর অনুবাদটাই সঠিক। ‘ইয়াকুন’ present tense ইংরেজিতে “is”, আর ‘কা-না’ past tense ইংরেজিতে "was"

এবার নিচের আয়াতটি দেখুন-

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

তিনি যখন কোন কিছু করতে ইচ্ছা করেন, তখন তাকে কেবল বলে দেন, ‘হও’ তখনই তা হয়ে যায়। (সুরা ৩৬ ইয়াসিন, আয়াত ৮৩)

Verily, His Command, when He intends a thing, is only that He says to it,” Be!” and it is! এখানে He says to it, ”Be!” and it is! ইংরেজি অনুবাদ ঠিকই আছে। কিন্তু উভয় জায়গায় (সুরা ইমরান, আয়াত ৫৯ এবং সুরা ইয়াসিন,

আয়াত ৮৩) ফায়াকুন শব্দের কোনো পরিবর্তন নাই। একই শব্দের ইংরেজি অনুবাদে এক জায়গায় “Is” আর এক জায়গায় “Was” লিখা হয়েছে।

৬ষ্ঠ ভুল-

هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ

These two opponents (believers and disbelievers) dispute with each other about their Lord——

এই দুই বাদী বিবাদী, তারা তাদের পালনকর্তা সম্পর্কে বিতর্ক করে। অতএব যারা কাফের, তাদের জন্যে আগুনের পোশাক তৈরি করা হয়েছে। তাদের মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দেয়া হবে। (সুরা ২২ হাজ্ব, আয়াত ১৯)

আরবিতে বচন তিন প্রকার, যথা- একবচন, দ্বৈত বা যুগ্ম-বচন ও বহুবচন, singular, dual, আর plural

এখানে দুই বাদী বিবাদী বলতে দুই ব্যক্তি নয় বরং দুই দল বাদী বিবাদী বুঝানো হয়েছে, একদল বিশ্বাসী আর একদল কাফির। সেই অনুসারে ইখতাসামু- শব্দটি ইখতাসামা- হবে।

৭ম ভুল-

وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ

আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি, তা থেকে মৃত্যু আসার আগেই ব্যয় কর। অন্যথায় সে বলবেঃ হে আমার পালনকর্তা, আমাকে আরও কিছুকাল অবকাশ দিলে না কেন? তাহলে

আমি সদকা করতাম এবং সৎকর্মীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। (সুরা ৬৩ মুনাফিকুন, আয়াত ১০)

এখানে ওয়া আকুম মিনাস সা-লিহি-ন এর ‘আকুম’ ক্রীয়াপদটি subjunctive তাই নিয়মানুসারে শব্দের শেষ ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে স্বর বর্ণ থাকতে হয়। যেমন বাক্যের ফা-আসাদ্দাকা (আ) । ওয়া আকুম এর ‘আকুম’ ক্রীয়াপদ এর শেষ ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে স্বর বর্ণ (আ) যুক্ত করে এভাবে বলা উচিৎ ছিল- ফা-আসাদ্দাকা ওয়া আ-আকুনা (আ) মিনাস সা-লিহিন। উল্লেখ্য এখানে 'আকুম' শব্দটি আসলে 'আকুন' থেকে এসেছে।

৮ম ভুল-

" وَالسَّمَاء وَمَا بَنَاهَا

By the heaven and that which built it."

কসম আকাশের এবং যিনি তা নির্মাণ করেছেন, তাঁর। (সুরা ৯১ আশ-শামস, আয়াত ৫)

এখানে مَا (মা) এবং مَن (মান) শব্দ দুটো নিয়ে কিছু কথা বলা প্রয়োজন বোধ করি। مَا (মা) এর অর্থ হলো, ‘কী’, ‘ওটা’, ‘ইহা’ ‘যা’, বা ‘যাহা’ (What, That, Which) আর مَن (মান) এর অর্থ হলো, ‘যিনি’, ‘যে’ (Who, Him) এবার ১০১ নং সুরা আল-কারিয়াহ এবং ৯১ নং সুরা আশ-শামস ভালভাবে লক্ষ্য করুন। উল্লেখিত শব্দদ্বয় উভয় সুরাতে বহুবার ব্যবহার করা হয়েছে। مَا (মা) এর অর্থ ‘যে’ ‘যিনি’ (Who) নয়, তা বুঝেই ইংরেজী অনুবাদকগণ বেশ তালগোল পাকিয়েছেন। ৯১ নং সুরা আশ-শামস এর ৫, ৬, এবং ৭ নং বাক্যে। এই তিনটি বাক্যের ইংরেজী অনুবাদ দেখুন-

আয়াত ৫-

Yusuf Ali

By the Firmament and its (wonderful) structure;

Shakir

And the heaven and Him Who made it,

আয়াত ৬-

Yusuf Ali

By the Earth and its (wide) expanse:

Shakir

And the earth and Him Who extended it,

আয়াত ৭-

Yusuf Ali

By the Soul, and the proportion and order given to it;

Shakir

And the soul and Him Who made it perfect

যে সকল অনুবাদকগণ এই তিনটি বাক্যে مَا (মা) এর অর্থ ‘যিনি’ (Who) করেছেন তারা সকলেই অন্য সব যায়গায় مَا (মা) এর অর্থ ‘কী’, ‘যা’, ‘ইহা’, ‘তাহা’, ‘It’, ‘Which’, ‘That’ করেছেন। মুহাম্মদের ভুলটাকে ঢাকতে গিয়ে বাধ্য হয়ে দুই জালাল (জালালাইন) জোড়াতালি মার্কা একটি ব্যাখ্যা এখানে দিয়েছেন-

and [by] the soul, that is to say, [by] all souls, and the One Who proportioned it, in its created form (mā مَا (মা) in all three instances relates to the verbal action, or functions as man مَن (মান), ‘the one who’)

এবার নিচের বাক্যটি দেখুন-

وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى

এবং (কসম) তাঁর, যিনি নর ও নারী সৃষ্টি করেছেন। (৯২ নং সুরা আল-লাইল, আয়াত ৩) আল্লাহ নিজের নামে কসম খাচ্ছেন!

এবার ইংরেজি অনুবাদটা লক্ষ্য করুন-

Pickthall

And Him Who hath created male and female,

Yusuf Ali

By (the mystery of) the creation of male and female

জালালাইন এসে মুহাম্মদকে উদ্ধার করার চেষ্টা করলেন এভাবে-

Tafsir al-Jalalayn and [by] the One Who (‘mā’ either functions as ‘man’ مَن(মান), ‘the One Who’, or it is related to a verbal action) created the male and the female, Adam and Eve, or every male and female — the hermaphrodite, although problematic for us, is [in fact] either male or female according to God, and therefore a person [actually] commits perjury if he speaks with one [thinking that] because he has sworn not to speak with a male or a female; [he may do so with a hermaphrodite].

তদ্রূপ আরেকটি বাক্য যেমন-

إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ

তোমাদের প্রদত্ত ওয়াদা অবশ্যই সত্য। (সুরা ৫১ আজ-জারিয়াহ, আয়াত ৫)

ইংরাজি অনুবাদে (mā مَا (মা) এর অর্থ দেখুন।

Yusuf Ali

Verily that which ye are promised is true;

Shakir

What you are threatened with is most surely true,

(এবার এর সাথে তুলনা করুন সুরা ৯১ আশ-শামস এর ৫নং আয়াত) এই 'মা' এর ভুল ব্যবহার জেনেই জালালাইন সব সময় ব্র্যাকেটে ব্যাখ্যা দিতে বাধ্য হয়েছেন-

Tafsir al-Jalalayn-

assuredly what you are promised (mā, 'what', relates to the verbal action), in other words, the promise given to them of resurrection and other matters, is true, is indeed a true promise,

প্রাসঙ্গীক বিধায় এখানে و 'ওয়াও' বর্ণ নিয়ে কিছু কথা বলে নেয়া ভাল। তার আগে পাঠকবৃন্দকে অনুরোধ করবো, কোরানে ব্যবহৃত و 'ওয়াও', مَن (মান), مَا (মা) এগুলোর অর্থ জানার জন্যে।এবং এর ব্যবহার দেখার জন্যে ৯১ নং সুরা আশ-শামস, ৯২ নং সুরা আল-লাইল এবং ১০১ নং সুরা আল-কারিয়ায়। অনেকে বলে থাকেন, কোরানের কোনো নির্দিষ্ট বাক্য আলাদা করে তর্জমা করা যায় না, কারণ প্রত্যেকটা বাক্য নাকি একটা আরেকটার সম্পূরক, আর এর প্রমাণ হিসেবে তারা বাক্যের প্রথমে و 'ওয়াও' দেখান। و 'ওয়াও' এর অর্থ হলো, 'এবং', 'আর', 'শপথ', 'কসম'। উপররোক্ত তিনটি সুরায় এর প্রচুর ব্যবহার, আর আল্লাহ শুধুমাত্র এই সুরাগুলোতেই কতবার যে কতপ্রকার বস্তুর কসম খেয়েছেন তা দেখতে পাবেন। ইহজগতের মেঘ, নৌকা, আকাশ, বাতাস ইত্যাদি তুচ্ছ বস্তু ও নিজের নামে কসম খাওয়ার হয়তো মুহাম্মদের প্রয়োজন থাকতে পারে, আল্লহর নিশ্চয়ই ছিল না। আল্লাহ কি নিজেকে 'মিথ্যাবাদী নয়' প্রমাণ করার জন্যে এতোবার কসম খেলেন?

৯২ নং সুরা আল-লাইল, ৯৩ নং সুরা 'আদ-দোহা' শুরু হয়েছে و 'ওয়াও' দিয়ে। 'কসম রাত্রির-'। 'কসম মধ্যদিনের', সুতরাং و 'ওয়াও' এর অর্থ শুধু 'আর' এবং 'অতঃপর'

নয়, و ‘ওয়াও’ এর অর্থ শপথ, কসমও। উল্লেখ্য ৯৩ নং সুরা ‘আদ-দোহা’ এর সব বাক্যে স্পষ্টই বক্তা জিব্রাইল অথবা মুহাম্মদ, আর আল্লাহ সব সময়ই থার্ড পার্সন।

৯ম ভুল-

ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اِئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ

অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোযোগ দিলেন যা ছিল ধুম্রকুঞ্জ, অতঃপর তিনি তাকে ও পৃথিবীকে বললেন, তোমরা উভয়ে এসো ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়। তারা বল্লো, আমরা স্বেচ্ছায় আসলাম। (সুরা ৪১ হা-মীম, আয়াত ১১)

এবার প্রথমেই জালালাইনের বক্তব্য দেখে নিই- Then He turned to the heaven when it was smoke, [consisting of] rising vapours, and He said to it and to the earth, “Come both of you, to what I desire from you, willingly, or unwillingly!” (taw‘an aw karhan, their [syntactical] locus is that of a circumstantial qualifier, in other words, ‘[Come] being obedient or coerced’). They said, “We come, together with all those inhabiting us, willingly!” (tā’i‘īna mainly indicates masculine rational beings; it may also be that they are referred to in this way because they are being addressed thus).

শাকির ও ইউসুফ আলীর অনুবাদ-

Yusuf Ali

Moreover He comprehended in His design the sky, and it had been (as) smoke: He said to it and to the earth: "Come ye together, willingly or unwillingly." They said: "We do come (together), in willing obedience."

Shakir

Then He directed Himself to the heaven and it is a vapor, so He said to it and to the earth: Come both, willingly or unwillingly. They both said: We come willingly.

মাটির ভাঙ্গা কলসি জোড়া লাগাতে জালালাইন কিছু অতিরিক্ত মসলা এখানে যোগ করলেন- They said, “We come, together with all those inhabiting us, willingly!”

আরবিতে আকাশ এবং পৃথিবী উভয়ই স্ত্রীলিঙ্গ, এবং একত্রে দ্বৈত বা যুগ্মবচন, (বহুবচন নয়)। এমতাবস্থায় قَالَتَا (কা-লাতা They said) ঠিকই আছে, কিন্তু বাক্যের শেষ শব্দ طَائِعِين (তা-ইয়িন) বিশেষণ adjective পুংলিঙ্গ এবং বহুবচন। সুতরাং বাক্যের বিশেষ্য পদ, বচন, ও লিঙ্গের সাথে বিশেষণের মিল করে, ব্যাকরণ অনুযায়ী আয়াতের শেষ শব্দটি ‘তা-ইতায়িন’ হওয়া উচিৎ।

১০ম ভুল-

وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى

আর আমি পৃথক পৃথক করে দিয়েছি তাদের বারো জন পিতামহের সন্তানদেরকে বিরাট বিরাট দলে, এবং নির্দেশ দিয়েছি মুসাকে–-

এখানে ‘আসবা-তান’ শব্দটি আরবি ব্যাকরণানুযায়ী ভুল। আরবিতে দশ সংখ্যার উপরে নামবাচক শব্দ একবচনে লেখা হয়। শুদ্ধ শব্দ হবে ‘আশারাতা সিবতান’। কোরানের অন্যান্য আয়াতে এই নিয়ম অনুসরণ করা হয়েছে, যেমন- ৭-১৪২, ২-৬০, ৫-১২, ৯-৩৬, ১২-৪।

আমরা প্রবন্ধ দীর্ঘায়িত করবোনা। এ ছিল কোরানে শতাধিক ব্যাকরণগত ভুলের কিছু উদাহরণ মাত্র। কোরানে বিদেশি শব্দের অনুপ্রবেশ এর ব্যাপারে শুধু বলবো, Al Suyuti কোরানে ১০৭ টি এবং Arthur Jeffery ২৭৫টি বিদেশি শব্দ খুঁজে পেয়েছেন। উৎসাহী নিচের ইন্টারনেট লিংকসমুহ থেকে আরো বিস্তারিত জেনে নিতে পারেন।

এখন কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করা যাক।

এ ভুল কার?

এ প্রশ্নের শুধুমাত্র দুটো উত্তরই হতে পারে।

(১) কোরান ভুল ভাবেই লেখা ছিল লাওহে মাহফুজে।

(২) মানুষ কোরান লেখার সময় ভুল ভাবে লিখেছিল।

প্রথম উত্তর কোনোভাবেই গ্রহনযোগ্য হতে পারেনা। আর দ্বিতীয় উত্তর যুক্তিসঙ্গত হলেও প্রমাণ করে যে, বর্তমানে আমাদের হাতের কাছে কোরান ত্রুটিমুক্ত বিশুদ্ধ নয়।

ততকালীন আরবের বিখ্যাত কবি, সাহিত্যিক, ইতিহাসবিদগণ কি কোরানের এ ভুল সম্মন্ধে অবগত ছিলেন না?

অবশ্যই ছিলেন। প্রথম অবস্থায় কেউ তা কানেই তুলেন নি। সে যুগে হীরা পাহাড়ের ঝোপে ঝাড়ে, মাঝে মধ্যে মুহাম্মদের মত ঘর ত্যাগী এমন সন্যাসীর আবির্ভাব স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। রাষ্ট্রীয় অব্যবস্থার শিকার, সমাজ বঞ্চিত, হাতাশাগ্রস্থ যারা অন্ধভাবে মুহাম্মদের কথা আল্লাহর বাণী বলে বিশ্বাস করেছিলেন, তারা কোরানের ভাষার দিকে তাকিয়ে নয়, মুহাম্মদের নবুওত পূর্ব জীবনের দিকে তাকিয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করেছিলেন। আর যারা ভুল ধরার ক্ষমতা রাখতেন বা চেষ্টা করেছেন, মুহাম্মদ তাদেরকে দুনিয়া থেকে উঠিয়ে দিয়েছিলেন।

(৩) খলিফা উসমানের আমলে কোরান সংকলন কমিটি ভুল সংশোধন করলেন না কেন?

অনেক ভুল সংশোধন করা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত উসমান যখন টের পেলেন, লোম খুটতে খুটতে কম্বল খালি হয়ে যাবে, নিষেধ করে দিলেন, আর যেন পরিবর্তন করা না হয়। তবুও এর পরে পরিবর্তন পরিবর্ধন হয়েছে, যখন জের, জবর, পেশ, নোখতা, তাশদিদ ইত্যাদি যোগ করা হয়।

(৪) পনেরো শো বৎসর যাবত এতো ভুল মানুষের চোখে পড়েনা কেন, মানুষ এ ভুল মেনে নেয় কেন?

কারণ কোরানকে যারা বিনা প্রশ্নে আল্লাহর বাণী বলে মেনে নিয়েছেন, তারা আল্লাহর ভুলকে ভুল বলা পাপ মনে করেন। তাই আল্লাহ যদি বলেন-‘বালকটি বল খেলিতেছে’, আর ‘তাহারা বল খেলিতেছিল’ বাক্যদ্বয় সমান অর্থ বুঝায়, অথবা আল্লাহ যদি বলেন- "I am going to eat" এবং " I am going to will eat কিংবা "I did go to

ate" .তাহলে মেনে নিতে হবে বাক্যসমুহ ব্যাকরণগতভাবে শুদ্ধ। আল্লাহর সৃষ্ট ভাষা আল্লাহ যেভাবে মন চায় ব্যবহার করবেন, তাতে ভুল ধরা পাপ।

সহায়ক তথ্যাবলী-

www.answering-islam.org/Books/Jeffery/Vocabulary/index.htm

বিজ্ঞানময় কিতাব অভজিৎ রায়

Who Authored the Qur'an? Abul Kasem

বোকার স্বর্গ- আকাশ মালিক

আল্লাহ, মুহম্মদ সাঃ এবং আল-কোরআন বিষয়ক কিছু আলোচনার জবাবে.. নাস্তিকের ধর্মকথা

বেহেস্তের পরী

কোরান হাদিস পড়ে আমরা মোটামুটি সবাই বেহেস্ত সম্পর্কে অবগত। বেহেস্তের বাসিন্দা, বিশেষ করে প্রবাল ও পদ্মরাগ সদৃশ রমণীগণের আকর্ষণীয় বিবরণ শুনে আমরা অবাক হয়েছি, তারা দেখতে কেমন? ছোটবেলা সুরা আর রাহমান পড়ে এমনটাই চিন্তা করেছি বহুদিন। অনেকদিন মুরুব্বীদের পরামর্শে এই সুরা পড়ে বুকে ফু দিয়ে ঘুমিয়েছি। ওয়াজ মাহফিলে হুজুরদের মুখ থেকে বেহেস্তী পরীদের রূপের বর্ণনা শুনে বুড়ো মানুষদেরও নড়েচরে বসতে দেখেছি। সুরা আর রাহমান পড়ে বেহেস্তের সিটিজেনসিপ নিয়ে পরীদের সঙ্গ পাওয়ার সপ্ন মনে জাগে নাই এমন মানুষ বোধ হয় দুনিয়ায় খুব কমই আছেন। এই সপ্ন দেখে কতো চুর ডাকাত সন্ত্রাসী যে মসজিদমূখী হলো তার সীমা সংখ্যা নাই। ইন্টারনেটের বদৌলতে পরীদের চেহারার একটি নমুনা পেলাম।আজ তাদের চেহারা সুরত দেখে আমি একটু ভয় পেয়ে গেছি, এখন সেই সুরা আর রাহমান পড়তেও আমার ভয় লাগে। চলুন আল রাহমান-সুরাটির ফজিলতি আয়াতগুলো আরেকবার তেলাওত করা যাক।

সুরা আল রাহমান-

(শুরু করছি পরম করুণাময় আল্লাহ মাবুদ পালনকর্তার নামে, যিনি বেহেস্ত দোজখ সৃষ্টি করে রেখেছেন মানুষ সৃষ্টির আগে।)

আয়াত-

৫) সূর্য ও চন্দ্র হিসাবমত চলে।

৬) এবং তৃণলতা ও বৃক্ষাদি সেজদারত আছে।

৭) তিনি আকাশকে করেছেন সমুন্নত এবং স্থাপন করেছেন তুলাদন্ড। And the heaven He raised and imposed the balance

১৪) তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পোড়া মাটির ন্যায় শুষ্ক মৃত্তিকা থেকে।

১৭) তিনি দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচলের মালিক।

১৯) তিনি পাশাপাশি দুই দরিয়া প্রবাহিত করেছেন।

২০) উভয়ের মাঝখানে রয়েছে এক অন্তরাল, যা তারা অতিক্রম করেনা।

২২) উভয় দরিয়া থেকে উৎপন্ন হয় মোতি ও প্রবাল।

২৪) দরিয়ায় বিচরণশীল পর্বতদৃশ্য জাহাজসমূহ তাঁরই (নিয়ন্ত্রনাধীন)।And to Him belong the ships [with sails] elevated in the sea like mountains.

(পর্বতদৃশ্য জাহাজ! আল্লাহর উপমার তুলনা হয়না)

২৯) নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের সবাই তাঁর কাছে প্রার্থী। তিনি সর্বদাই কোনো না কোনো কাজে রত আছেন। (আল্লাহ সব সময় ব্যস্ত! নো ব্রেইক টাইম, নো হলিডে, নো পেনশন?)

৩১) হে জিন ও মানব! আমি শীঘ্রই তোমাদের জন্যে কর্মমুক্ত হয়ে যাব। (হঠাৎ থার্ড পার্সন থেকে ফার্ষ্ট পার্সনে? তিনি তিনি করতে করতে তিনিই এখন আমি?)

৩৭) যেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে তখন সেটি রক্তবর্ণে রঞ্জিত চামড়ার মত হয়ে যাবে।

৪১) অপরাধীদের পরিচয় পাওয়া যাবে তাদের চেহারা থেকে; অতঃপর তাদের কপালের চুল ও পা ধরে টেনে নেয়া হবে।

৪৪) তারা জাহান্নামের অগ্নি ও ফুটন্ত পানির মাঝখানে প্রদক্ষিণ করবে।

৪৬) যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে পেশ হওয়ার ভয় রাখে, তার জন্যে রয়েছে দুটি উদ্যান।

৪৮) উভয় উদ্যানই ঘন-শাখা-পল্লববিশিষ্ট।

৫০) উভয় উদ্যানে আছে বহমান দুই প্রস্রবন।

৫২) উভয়ের মধ্যে প্রত্যেক ফল বিভিন্ন রকমের হবে।

৫৪) তারা তথায় রেশমের আস্তরবিশিষ্ট বিছানায় হেলান দিয়ে বসবে। উভয় উদ্যানের ফল তাদের নিকট ঝুলবে।

৫৬) তথায় থাকবে আনতনয়ন রমনীগন, কোনো জিন ও মানব পূর্বে যাদের ব্যবহার করেনি। In them are women limiting [their] glances, untouched before them by man or jinn

৫৮) প্রবাল ও পদ্মরাগ সদৃশ রমণীগণ। As if they were rubies and coral.

৬২) এই দুটি ছাড়া আরও দুটি উদ্যান রয়েছে।

৬৪) ঘাড়ো-ঘন সবুজ।

৬৬) তথায় আছে উদ্বেলিত দুই প্রস্রবণ।

৬৮) তথায় আছে ফল-মূল, খেজুর ও বেদানা।

৭০) সেখানে থাকবে সচ্চরিত্রা সুন্দরী রমণীগণ।

৭২) তাঁবুতে অবস্থানকারিণী হুরগণ। Houris (beautiful, fair females) reserved in pavilions

৭৪) কো্নো জিন ও মানব পূর্বে তাদেরকে স্পর্শ করেনি।

৭৬) তারা সবুজ মসনদে এবং উৎকৃষ্ট মূল্যবান বিছানায় হেলান দিয়ে বসবে।

৭৮) কতো পূণ্যময় আপনার পালনকর্তার নাম, যিনি মহিমাময় ও মহানুভব।

বেহেস্তের বর্ণনা সাহাবিগন রাসুলের কাছে প্রায়ই জানতে চাইতেন।

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ {يَوْمَ نَحْشُرُ
المتقين إلى الرحمن وفدا} قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ————————

একদিন হজরত আলি (রাঃ) রসুলুল্লাহকে (দঃ) কোরানের ১৯ নং সুরা মরিয়মের ৮৫ নং আয়াত নিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন। আয়াতটি হলো-

نَحْشُرُ يَوْمَ وَفْدًا الرَّحْمَنِ إِلَى الْمُتَّقِينَ ‘সেদিন দয়াময়ের কাছে পরহেজগারদেরকে অতিথিরূপে সমবেত করবো’। নবি এর উত্তরে কী জবাব দিয়েছিলেন তা আমরা পরে জেনে নিব। সুরা মরিয়মে সুরা ‘আল রাহমান’ এর মতো ‘রাহমান’ শব্দ বেশ কয়েকবার ব্যবহৃত হয়েছে এবং বেহেস্তের বর্ণনা দেয়া আছে। সম্পূর্ণ সুরাটি পড়লে বিভ্রান্ত হওয়ার সমুহ সম্ভাবনা থাকে যে, এখানে বক্তা কে? আল্লাহ না মুহাম্মদ না জিব্রাইল? আচ্ছা, সুরা মরিয়মের কিছু আয়াত দেখা যাক-

৭৬) যারা সৎপথে চলে আল্লাহ তাদের পথপ্রাপ্তি বৃদ্ধি করেন এবং স্থায়ী সৎকর্মসমূহ তোমার পালনকর্তার কাছে সওয়াবের দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ এবং প্রতিদান হিসেবেও শ্রেষ্ট। (‘তোমার পালনকর্তা’ কথাটা কার?)

৭৭) আপনি কি তাকে লক্ষ্য করেছেন যে, আমার নিদর্শনাবলীতে বিশ্বাস করেনা এবং বলেঃ আমাকে অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি অবশ্যই দেয়া হবে। (‘আমার নির্দেশনাবলী’ আমি কে?)

৭৮) সে কি অদৃশ্য বিষয় জেনে ফেলেছে, অথবা দয়াময় আল্লাহর নিকট থেকে কোনো প্রতিশ্রুতি প্রাপ্ত হয়েছে? (‘সে’ কে? প্রশ্নটা কে কাকে করছেন? প্রশ্নকারীর কি উত্তর জানা নেই? এই আয়াত বা বাক্য বুঝি আল্লাহ সকল সৃষ্টির আগে লাওহে মাহফুজে লিখে রেখেছিলেন?)

৭৯) না, এটা ঠিক নয়। সে যা বলে আমি তা লিখে রাখব এবং তার শাস্তি দীর্ঘায়িত করতে থাকব। (‘আমি তা লিখে রাখব এবং তার শাস্তি দীর্ঘায়িত করতে থাকব’ এটা আল্লাহর কথা? এই বাক্যটি লেখা হয়েছিল কখন? যার কথা এখানে আল্লাহ রাসুল ফেরেস্তা মিলে আলাপ করছেন তার তো তখন জন্মই হয়নি।)

৮০) সে যা বলে, মৃত্যুর পর আমি তা নিয়ে নেব এবং সে আমার কাছে আসবে একাকী।

৮১) তারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য ইলাহ গ্রহণ করেছে, যাতে তারা তাদের জন্যে সাহায্যকারী হয়।

৮২) কখনই নয়, তারা তাদের এবাদত অস্বীকার করবে এবং তাদের বিপক্ষে চলে যাবে।

৮৩) আপনি কি লক্ষ্য করেননি যে, আমি কাফেরদের উপর শয়তানদেরকে ছেড়ে দিয়েছি। তারা তাদেরকে বিশেষভাবে (মন্দকর্মে) উৎসাহিত করে।

৮৪) সুতরাং তাদের ব্যাপারে আপনি তাড়াহুড়া করবেন না। আমি তো তাদের গণনা পূর্ণ করছি মাত্র।

৮৫) সেদিন দয়াময়ের কাছে পরহেজগারদেরকে অতিথিরূপে সমবেত করব,

৮৬) এবং অপরাধীদেরকে পিপাসার্ত অবস্থায় জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাব।

৮৭) যে দয়াময় আল্লাহর কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে, সে ব্যতীত আর কেউ সুপারিশ করার অধিকারী হবে না।

৮৮) তারা বলেঃ দয়াময় আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন।

৮৯) নিশ্চয় তোমরা তো এক অদ্ভুত কান্ড করেছ।

৯০) হয় তো এর কারণেই এখনই নভোমন্ডল ফেটে পড়বে, পৃথিবী খন্ড-বিখন্ড হবে এবং পর্বতমালা চূর্ণ-বিচুর্ণ হবে। ('হয় তো'! বাহ, এই বাক্য আবার লেখা হয়েছিল আল্লাহর আকাশে সহস্র বৎসর পূর্বে?)

হজরত আলি (রাঃ) জানতে চেয়েছিলেন (৮৫ নং আয়াত) বাহন ছাড়া অতিথিদের কীভাবে সমেবেত করা হবে? রসুলুল্লাহ বললেন- 'যার হাতে আমার প্রাণ তার শপথ, তারা যখন কবর থেকে বের হবে তখন ফেরেস্তারা পাখাওয়ালা সাদা উষ্ট্রী নিয়ে তাদের স্বাগত জানাবে, তার উপর থাকবে স্বর্ণের আসন। তাদের জুতার ফিতা হতে ঝলমলে আলো নির্গত হবে। সেই উষ্ট্রীগুলো প্রতি পদক্ষেপে দৃষ্টির পলক যতদূর যায় ততদূর গমণ করবে। এভাবে তারা জান্নাতের দরজার নিকট পৌছে যাবে। সেখানে দুটি ঝর্ণা প্রবাহিত থাকবে। যখন তারা সে দুটির একটি হতে পান করবে, তাদের চেহারার মধ্যে প্রশান্তির চিহ্ন ফুটে উঠবে। তারা অন্য ঝর্ণাটির পানি দিয়ে ওজু করবে। এর পর তাদের চুল আর কখনও এলোমেলো হবে না। এর পর তারা জান্নাতের দরজায় কড়াঘাত করবে। সেই কড়াঘাত শুনে সকল হুর বুঝতে পারবে যে তার স্বামী আগমণ করেছে। অতিরিক্ত তাড়াহুড়ার কারণে তার হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলার মতো অবস্থা হবে। সে একজন চাকরকে পাঠাবে দরজা খুলে দেওয়ার জন্য। উক্ত চাকরের সৌন্দর্য ও উজ্জলতা এতোটাই বেশি হবে যে, যদি আল্লাহ উক্ত জান্নাতীর নিকট এই চাকরকে পরিচয় না করিয়ে দিতেন তবে তাকে দেখে সে সেজদায় পড়ে যেতো। সে দরজা খুলে বলবে, আমি আপনার সেবক যাকে আপনার দেখাশুনার ভার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। উক্ত জান্নাতী ঐ খাদেমকে অনুসরণ করে যখন তার স্ত্রীর নিকট পৌছাবে, অতিরিক্ত তাড়াহুড়ার কারণে তার স্ত্রী স্বম্ভিত হারিয়ে ফেলবে। সে তাবু থেকে বের হয়ে উক্ত ব্যক্তির সাথে আলিঙ্গন করবে এবং বলবে 'তুমি আমার ভালবাসা আমি তোমার ভালবাসা। আমি তুষ্ট কখনও রুষ্ট হবো না। আমি প্রসন্ন কখনও বিষন্ন হবো না। আমি চিরজীবী কখনও মৃত্যুবরণ করবো না'। তার পর সে এমন একটি বাড়িতে প্রবেশ

করবে যার নিচ হতে উপর পর্যন্ত এক লক্ষ গজ। তা স্থাপিত হবে মনি মানিক্যের পাথরের উপর। বাড়িটির ভিতরে যাওয়া আসার রাস্তাসমূহ লাল, সবুজ, হলুদ ইত্যাদি বিভিন্ন রঙের হবে, কোনো একটি রাস্তা অন্যটির মতো হবে না। উক্ত ব্যাক্তি যখন শোবার ঘরে প্রবেশ করবে তখন সেখানে একটি পালঙ্ক দেখতে পাবে। তার উপর ৭০ টি তোষক থাকবে তোষকের উপর ৭০টি স্ত্রী থাকবে। প্রতিটি স্ত্রীর পরনে ৭০ টি পোশাক থাকবে। উক্ত স্ত্রীর সৌন্দর্য ও উজ্জলতা এমন হবে যে, পোশাক ও অলংকার ভেদ করে তার হাড়ের মজ্জা পর্যন্ত দেখা যাবে। সে এক রাত পর্যন্ত সময় তাদের সহিত মিলিত হবে'।



হুরিদের শরীরের গড়-গঠন, আকৃতি-প্রকৃত, রূপ-রং, মন-তনের পরিচয় বর্ণনায় প্রচুর হাদিস রয়েছে। কিছু হাদিস দেখা যাক।

A houri is a most beautiful young woman with a transparent body. The marrow of her bones is visible like the interior lines of pearls and rubies. She looks like red wine in a white glass. She is of white color, and free from the routine physical disabilities of an ordinary woman such as menstruation, menopause, urinal and offal discharge, child bearing and the related pollution. A houri is a girl of tender age, having large breasts which are round (pointed), and not inclined to dangle. Houris dwell in palaces of splendid surroundings."[56] তিরমিজি শরিফ হাদিস নং ৮২৪-৮৯২।

The houris, (who will be so beautiful, pure and transparent that) the marrow of the bones of their legs will be seen through the bones and the flesh." (Sahih Bukhari, Book 54 "The Beginning of Creation," Hadith number 476)

আর এই হুর পরীদের সাথে বেহেস্তবাসীদের সঙ্গমের ব্যাপারে ইবনে কাথিরের বর্ণনায় পাওয়া যায়- 'Muhammed said that men in heaven would have sex with one hundred virgins in one day'

আমরা হাদিস শরিফ থেকে জানি বেহেস্তের এক দিন দুনিয়ার কয়েক বছরের সমান। এই সুদীর্ঘ সময় স্থায়ী পরীদের সাথে সঙ্গম আর পরীদের স্তনের বর্ণনা চিরদিন জিহাদিদের প্রেরণা হয়ে থাকবে।

হজরত আয়েশার (রাঃ) সাথে এক রজনী

(কোরান, হাদী্স, তাফসীর ও অন্যান্য ইসলামী বই থেকে
নেয়া তথ্য অবলম্বনে কাল্পনিক সাক্ষাৎকার)

- আয়েশা, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমার সাথে কিছুক্ষণ সময় দেয়ার জন্যে। অনেকের মুখে সেই কিশোরকাল থেকে আপনার রূপ, মেধা, প্রজ্ঞা ও প্রতিভার কথা শুনে আসছি। কিন্তু বাস্তবে কোনোদিন দেখিনি বিধায়, মনের মানসপটে আপনার অবয়ব কল্পনা করেছি কখনো দূর্গা, কখনো সীতা, কখনো পার্বতী, কখনো রাজলক্ষী, কখনো ম্যেরী মাগডিলান আবার কখনো ব্রুকশীল্ড এর রূপে। সাক্ষাৎ দর্শনের আশা নিয়ে নিদ্রা যাপন করেছি বহু রজনী। আজ নিশীতে আপনাকে পেয়ে আমি সত্যিই আনন্দিত। আমার কল্পনা একেবারে মিথ্যে হয়নি, আপনি সত্যিই সুন্দর। ১৫ শত বৎসর অতিবাহিত প্রায়, আজও ইসলামী জগতে মুসলিম নারীদের মধ্যে সম্ভবত আপনাকে নিয়েই সব চেয়ে বেশি জল্পনা, কল্পনা, আলোচনা সমালোচনা হয়। আজ নিশ্চয়ই আপনার কাছ থেকে আসল সত্যটা জানতে পারবো।

- আপনাকেও ধন্যবাদ। কথা হলো আপনার সকল প্রশ্নের উত্তর দেয়ার আমি চেষ্টা করবো, তবে সকলেই আমার কথা বিশ্বাস করবে এমনটা আশা করবেন না।

- কেন?

- এই বিশ্বাস অবিশ্বাস, মানা না মানার সমস্যাটা ইসলামের প্রাথমিক যুগে যেমন ছিল, আজো তেমনই আছে। হজরত আলি আমার বাবাকে, হজরত ওমরকে, হজরত উসমানকে মানতেন না, আমি আলিকে মানতাম না, মুয়াবিয়াও আলিকে মানতেন না। সত্যি কথা বলতে কি, আমাদের যুগের ইসলামের তুলনায় আপনাদের যুগের ইসলাম অনেক শান্তি পূর্ণ, অনেক মানবিক।

- আচ্ছা থাক, আমরা সেদিকে যাচ্ছিনা, আপনার সাথে কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো-

- আমি জানি।

- কী জানেন?

- আমার বিয়ের বয়স আর জঙ্গে জামাল।

- জানলেন কীভাবে?

- ঐ যে বললেন, মনের মানসপটে আমার অবয়ব কল্পনা করে সাক্ষাৎ দর্শনের আশায় নিদ্রা যাপন করেছেন বহু রজনী?

- হ্যাঁ, বিয়ের বয়স আর জঙ্গে জামাল আলোচনায় আসবে তবে আজ আপনার কাছ থেকে মে' রাজের কাহিনি ও অন্যান্য কিছু বিষয়ও জানতে চাইবো। আচ্ছা এবার পাঠকদের অবগতির জন্যে আপনার সংক্ষিপ্ত বংশ-পরিচয় দিয়ে শুরু করা যাক।

- আমার নাম আয়েশা বিনতে আবু বকর। বাবার আসল নাম আবুল কা' বা, ডাক নাম আবু বকর। দাদার নাম উসমান, (খলিফা উসমান নন) দাদার আরেক নাম ছিল আবু কাহাফা। আমার দাদীর নাম সালমা (উম্মে সালমা নন) লোকে তাঁকে উম্মুল কাহির বলে ডাকতো। কোরায়েশ বংশের বনি তায়িম গোত্রে ৬১৪ খৃষ্টাব্দে আমার জন্ম। লোকে আমাকে আয়েশা সিদ্দিকা বলে ডাকেন। সিদ্দিকা (সত্যবাদী নারী) আমার উপাধি। এই উপাধি আমার স্বামী মুহাম্মদ আমাকে দিয়েছিলেন, লোকে যখন আমার উপর ব্যভিচারিণীর অপবাদ রটনা করেছিল। আমার বাবা ছিলেন আমার স্বামী মুহাম্মদের দুই বৎসরের ছোট, আর আমি ছিলাম স্বামীর চুয়াল্লিশ বৎসরের ছোট।

- অর্থাৎ মুহাম্মদ (দঃ) কর্তৃক ইসলাম ঘোষণার চার বৎসর পর আপনার জন্ম, আপনি জন্ম সুত্রে মুসলমান?

- জ্বী, আমি জন্ম সুত্রেই মুসলমান, আমার স্বামী ৬১০ খ্রিস্টাব্দে ইসলাম ধর্ম ঘোষণা দিয়েছিলেন।

- আপনি কি কোনোদিন তাঁর সাথে আপনার বিয়ের কথা ভেবেছিলেন?

- বিয়ের পরেও ভাবতে পারিনি যে আমার বিয়ে হয়েছে, আগে ভাববো কোত্থেকে?
- কতো ছিল বয়স?
- আট বৎসর। আসলে ওখানে আমার বিয়ে হওয়ার কথা ছিলনা।
- আপনার কোনো বয়ফ্রেন্ড ছিল?
- ঠিক বয়ফ্রেন্ড নয় তবে একজন মানুষকে আমি জানতাম, তাকে আমার ভাল লাগতো। বয়সে আমার চেয়ে সামান্য বড় ছিল।
- নামটা জানতে পারি?
- জুবায়ের ইবনে মোতা'ম।
- তার সাথে বিয়ে হলোনা কেন?
- বাবা নিজেই তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে রাজি হলোনা।
- মুহাম্মদের কাছে আপনি, না আপনার বাবা বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে গিয়েছিলেন?
- আমি প্রস্তাব দেবো কি? আট বছরের মেয়ে একান্ন বছরের পুরুষকে বিয়ের প্রস্তাব দিতে শুনেছেন কোনোদিন? আমার বাবাও তাঁর কাছে যান নি, মুহাম্মদ নিজেই বাবার কাছে প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলেন।
- আপনার বাবা রাজি হয়ে গেলেন?
- প্রথমে রাজি হন নি। উনি তো আবার সম্পর্কে আমার চাচা ছিলেন। মুহাম্মদকে আমি চাচা ডাকতাম। প্রস্তাব শুনে হতভম্ব বাবা উনাকে যখন বললেন, ‘কিন্তু মুহাম্মদ, আমি যে তোমার ভাই হই, আয়েশা যে তোমার ভাতিজী!’! উনি বললেন, ‘আল্লাহর কিতাব ও ধর্মানুযায়ী আপনি আমার ভাই হন, কিন্তু আয়েশা আমার জন্যে বৈধ।
- ব্যস, আপনার বাবা মেনে নিলেন?
- না, তবুও মানেন নি, কিন্তু এরপর উনি (মুহাম্মদ) যে কথা বললেন তা আমার বাবার ধর্ম-বিশ্বাস, মান-সম্মান, জীবন-মরণ, আত্মমর্যাদার ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।
- প্রাণ নাশের হুমকি?

- আরে না, উনি বোকা নাকি, আমার বাবাকে হুমকি দেবেন? আর হুমকি দেয়ার মতো বাহুবল, জনবল তাঁর তখনও ছিলনা। তিনি বললেন, আল্লাহর নাকি আমাকে পছন্দ লেগে গেছে, স্বয়ং আল্লাহই ঘটক হয়ে তাঁর কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছেন।

- আপনার বাবার কাছে?

- দূর ছাই। আমার বাবা কি ইব্রাহীম পয়গাম্বর ছিলেন নাকি যে, সপ্নে দেখবেন আপন ছেলে কোরবানি দিতে? একবার নয়, দুইবার নয়, পুরো তিনবার মুহাম্মদ আমাকে সপ্নে দেখেছেন। তিনি সপ্নে দেখলেন, একেবারে বেহেস্তি সিল্কী রেশমী কাপড় দিয়ে আমাকে সাজিয়ে কোলে করে নিয়ে জিব্রাইল তাঁর সামনে হাজির হয়ে বলছেন- 'মুহাম্মদ তোমার জন্যে বেহেস্তি উপহার'। মুহাম্মদ জিব্রাইলকে বললেন, 'কাপড় উঠাও'। অমনি দেখতে পেলেন, নব বধুর সাজে ঘোমটা মাথায় আমি জিব্রাইলের কোলে বসে আছি।

- আপনার বাবা বিশ্বাস করে ফেললেন? তিনি বুঝি খুবই সরল প্রকৃতির ছিলেন?

- বাবাকে সরল প্রকৃতির বলবোনা, কারণ তিনি একাধারে একজন সফল ব্যবসায়ী, কম্যুনিটি লিডার ও সর্বোপরি একজন রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন। সরল প্রকৃতির মানুষের পক্ষে ওগুলো সম্ভব হয়না। তবে বাবা একজন অন্ধবিশ্বাসী ছিলেন।

- কী রকম?

- বাবা কেমন অন্ধবিশ্বাসী ছিলেন তার একটা উদাহরণ দিচ্ছি। ইসলাম ঘোষণার তখন দশ বৎসর চলছিল, আমার বয়স তখন ছয়। দশ বৎসর পূর্বে অতি নীরবে মক্কায় মুহাম্মদ তাঁর নতুন ধর্ম ইসলাম ঘোষণা করেছিলেন। এ নিয়ে উথাল পাতাল অনেক ঝড়ো হাওয়া বয়ে গেছে ধুলি ধুসরিত মরুভুমির উপর দিয়ে। হঠাৎ একদিন প্রত্যুষে মানুষ শুনতে পেলো, মুহাম্মদ বলছেন যে, তিনি বিগত রাতে এই সীমাহীন আকাশ, অগণিত তারা-নক্ষত্র, গ্রহ-উপগ্রহ, ধুমকেতু, নিহারীকা অতিক্রম করে, সাত আকাশ সাত জগত পাড়ি দিয়ে, স্বর্গ-নরক পরিদর্শন করে, আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ বৈঠক করে দুনিয়ায় ফিরে এসেছেন। অনেকেই ভাবলেন, মুহাম্মদ এবার নিজ হাতে তাঁর ধর্মের উপর কাফন পরিয়ে দিয়েছেন। কিছু লোক আমার বাবার কাছে এসে বললেন, 'আবু

বকর, এখন বুঝলেন তো আপনার বন্ধুটি যে আপাদমস্তক এক পাগল ছাড়া আর কিছু নয়, শুনেছো সে কী বলছে? তার পায়ে এবার জিঞ্জির পরাও'। বাবা বললেন, 'মুহাম্মদ মিথ্যে বলেন নি'।

- আপনার বাবা জিজ্ঞাসাই করেন নি, মুহাম্মদ কী বলছেন?

- না, বাবা চোখ বন্ধ করে তাদেরকে বলে দিলেন যে, নবি যা বলছেন তা একশো ভাগই সত্য। লোকে বললো, বাবার ব্রেইন ওয়াশড হয়ে গেছে।

- নবি যদি বলতেন যে, তিনি আঙ্গুলের ইশারায় চাঁদ দ্বিখন্ডিত করতে পারেন?

- সকল আগে চাঁদের দিকে না তাকিয়েই আমার বাবা বলতেন, হ্যাঁ নবি তা পারেন।

- কিন্তু এটা তো অন্ধবিশ্বাস।

- সে কারণেই তো বাবা সেদিন হতে নবির কাছ থেকে সিদ্দিক (সত্যবাদী) উপাধি লাভ করেন। আজ আপনারা জানেন, এক সৌরজগত থেকে আরেক সৌরজগতে পৌছুতে সব চেয়ে গতিশীল আলোর তিরিশ বিলিয়ন আলোকবর্ষ সময় লাগে। আপনাদের আজিকার সময়ের মানুষের মতো সে যুগের মানুষ মহাকাশের পরিধি, এক গ্যালাক্সী থেকে আরেক গ্যালাক্সীর দুরত্ব, শব্দ ও আলোর গতি, আলোকবর্ষ এসমস্ত জানতোনা। ঘটনা শুনার জন্যে কৌ্তুহলী মানুষ দূর দূরান্ত থেকে এসে জড়ো হলো। অনেক সন্দিহান মুসলমান ভাবলেন,নবিজি হয়তো সপ্নযোগে আকাশ ভ্রমন করেছেন। কিন্তু তিনি যখন দাবি করলেন যে, তিনি স্বশরীরে মাসজিদুল আকসা হয়ে সপ্তম আকাশ ভ্রমন করে এসেছেন, লোকে প্রশ্ন করলো- 'মাসজিদুল আকসার দরজা জানালা কয়টা দেখেছেন'।

- মুহাম্মদ সঠিক বলে দিলেন?

- না, তিন দিন সময় নিয়েছিলেন।

- কেন, এখানে সময়ের কী প্রয়োজন?

- আরে সাহেব, সেখানে বড়বড় ইহুদি খ্রিস্টান ধর্মযাজকগন উপস্থিত ছিলেন। হুট করে একটা উত্তর দেয়া কি সঠিক হতো?

- আচ্ছা, শেষ পর্যন্ত নবি কি সঠিক উত্তর দিতে পেরেছিলেন?

- যে আল্লাহর নিমন্ত্রণ রাখতে গিয়ে এমন সমস্যার সৃষ্টি হলো, তিন দিন পরে সেই আল্লাহই তার বন্ধুকে উদ্ধার করতে এগিয়ে আসলেন। জিব্রাইলকে অর্ডার দিলেন, সম্পূর্ণ জেরুজালেম শহর সহ মাসজিদুল আকসা অর্থাৎ বায়তুল মোকাদ্দাসের ছবি তার বন্ধুর চোখের সামনে তোলে ধরতে। ছবি দেখে নবি এক এক করে গুনে গুনে বলে দিলেন বায়তুল মোকাদ্দাসের কয়টা দরজা জানালা ছিল।

- আয়েশা, মাসজিদুল আকসা অর্থাৎ বায়তুল মোকাদ্দাস এর মা'নেটা কী? মাসজিদুল আকসা আর বায়তুল মোকাদ্দাস কি একই জায়গা?

- হ্যাঁ, ঐ রাতে মাসজিদুল হারাম অর্থাৎ মক্কা থেকে মাসজিদুল আকসা অর্থাৎ বায়তুল মোকাদ্দাস মসজিদে গিয়ে নবিজি নিজে ইমাম হয়ে দু'রাকাত নফল নামাজ পড়েছিলেন। সেই রাতে তার পেছনে মুক্তাদি ছিলেন দুই লক্ষ তেইশ হাজার নয় শত নিরান্নব্বইজন পয়গাম্বর ও সাত আকাশ সাত জমিনের ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ফেরেস্তা।

- কিন্তু আয়েশা, মাসজিদুল আকসা অর্থ তো বায়তুল মোকাদ্দাস মসজিদ নয়, আর ঐ নামে তখন জেরুজালেম শহরে বা বেতলিহামে কোনো মসজিদই ছিলনা।

- কোরানিক প্রমান চান? সুরা বনি ইসরাইলের প্রথম আয়াতটি দেখুন- ‘সকল মহিমা তাঁর যিনি তাঁর বান্দাকে ভ্রমন করিয়েছিলেন মসজিদুল হারাম থেকে দূরবর্তি মসজিদে, যার পরিবেশ আমি করেছিলাম মঙ্গলময়, যেন আমরা তাঁকে আমার কিছু নিদর্শন দেখাতে পারি। নিশ্চয়ই তিনি স্বয়ং সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা’।

- আয়েশা এ একটা বাক্য হলো? ‘সকল মহিমা তাঁর যিনি তাঁর বান্দাকে ভ্রমন করিয়েছিলেন মসজিদুল হারাম থেকে দূরবর্তি মসজিদে, যার পরিবেশ আমি করেছিলাম মঙ্গলময়’। এখানে তাঁর কে, যিনি কে, আর আমি কে? এর পরে ‘নিশ্চয়ই তিনি স্বয়ং সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা’। এখানে তিনি কে, আর সমস্ত বাক্যে বক্তা কে? আল্লাহ কি নিজেই নিজের প্রশংসা করছেন, নিজেই নিজেকে বলছেন আমি, তিনি, যিনি, সে, তার? আচ্ছা যাক, আমরা আলোচনা করছিলাম মাসজিদুল আকসা অর্থ কি বায়তুল মোকাদ্দাস

মসজিদ নিয়ে। কোরান যদি ইতিহাস বিকৃত করে তাহলে একদিন ধরা পড়ার সমুহ সম্ভাবনা আছে তাই বিষয়টা ক্লিয়ার করতে চাই। আমরা ইতিহাসে পাই, ৭০ খ্রিস্টাব্দে সুলাইমানের মন্দির রোমানগন ধ্বংস করে ফেলেছিল। এর পর থেকে সেখানে কোনো গীর্জা, মসজিদ, মন্দির নির্মিত হয়নি। ৬২১/২২ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মদ যখন তার মে'রাজের ঘটনা কোরানে লেখেন তখন জেরুজালেম ছিল খ্রিস্টানদের করতলে। ঐ সময় সেখানে কোন মুসলমানের বসতি ছিলনা। হজরত ওমর (রাঃ) কর্তৃক জেরুজালেম দখল করার পর, আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান ৬৯১ খ্রিস্টাব্দে নবি মুহাম্মদের মৃত্যুর ৫৭ বৎসর পরে মাসজিদুল আকসা নির্মিত করেন। আচ্ছা, কোরানে কি মে'রাজের ঘটনার বিষদ বর্ণনা আছে?

- জ্বী না, বিস্তারিত নেই তবে তার উল্লেখ আছে।

- আপনি নিশ্চয়ই ঐ অত্যাশ্চর্য ঘটনাটি জানেন?

- শুনবেন? রজনী ভোর হয়ে পূবাকাশের সূর্য মাথার উপরে এসে যাবে, কাহিনি শেষ হবেনা।

- আপনার কাছ থেকে ঘটনাটি শুনার লোভ সামলাতে পারছিনা।

- ওকে। ‘নক নক, হু ইজ দেয়ার? ইটস মি, জিব্রাইল–’

- আয়েশা, প্লিজ উই হেভ নো টাইম ফর জৌক। রাত শেষ হয়ে যাচ্ছে—

- একটা প্রশ্ন করি।

- অবশ্যই।

- আরব্য উপন্যাস পড়েছেন?

- জ্বী পড়েছি।

- সিন্দবাদের কাহিনি?

- হ্যাঁ পড়েছি।

- পাতালপূরী রাজকন্যার কেচ্ছা?

- জ্বী।

- শুয়োরাণী-দুয়োরাণী?

- তাও শুনেছি।

- ঠাকুর মা'র ঝুলি?

- জ্বী পড়েছি।

- কমলা রাণীর দীঘি?

- ওটা আবার কী?

- ওমা, বলেন কী, সিলেটের মানুষ হয়ে সিলেটের ইতিহাস জানেন না?

- ও আচ্ছা, সেই কমলা রাণীর দীঘি? সেটা তো ইতিহাসে থাকেনা।

- আপনাকে মে'রাজের কাহিনি শুনাবো না।

- কেন?

- আপনি বাংলার মানুষ, ঐ সমস্ত কেচ্ছা কাহিনি জানার পর মে'রাজের কাহিনি শুনে বিশ্বাস করবেন না।

- আমার জন্যে নয় তো, নতুন প্রজন্মকে জানাতে চাই।

- ওকে, ইফ ইউ ইনসিস্ট। হেয়ার উই গো-

'কসম সেই সকল নক্ষত্রের যারা অস্তমিত হয়' ——- আপনি হাসলেন কেন?

- কাম অন আয়েশা, নক্ষত্র তো কখনো অস্তমিত হয়না। ওরা সব সময়েই আকাশে আছে। দিনের বেলায় সূর্যের আলোয় নক্ষত্র দেখা যায়না। পূর্ণ সূর্য-গ্রহণকালে দিনের বেলায়ও কিন্তু তারা দেখা যায়।

- আরে সাহেব, ওটা আমার মুখের কথা নয়, সুরা নজম পড়ে দেখুন ওটা কোরানের আয়াত। ঐ সুরায় মে'রাজের কাহিনি লেখা আছে। আমি জানি আপনাদের যুগের মানুষকে কনভিন্স করা মুশকিল।

- স্যরি, আমি আর আপনাকে ইনটারাপ্ট করবো না, প্লিজ ক্যারি অন।

- 'কসম সেই সকল নক্ষত্রের যারা অস্তমিত হয়'

তোমাদের সাথী পথভ্রস্ট হোন নি, বিপথগামীও হোন নি

এবং তিনি প্রবৃত্তির তাড়নায় কথা বলেন না।
ইহাই কোরান যা প্রত্যাদেশ হয়,
তাঁকে শিক্ষা দান করেন যিনি এক মহা শক্তিশালী,
সে সহজাত শক্তি সম্পন্ন, নিজ আকৃতিতে প্রকাশ পায় উর্দ্ধ দিগন্তে।
তারপর সন্নিকটস্থ হয়ে অবনত হলেন।
তখন ব্যবধান ছিল দুই ধনুকের কিংবা তার চেয়েও কম।
তখন আল্লাহ তার বান্দার প্রতি যা প্রত্যাদেশ করার তা করলেন।
রাসুল মিথ্যে বলেন নি, তিনি যা দেখেছেন
তোমরা কি তর্ক করবে তাঁর সাথে, যা তিনি দেখেছেন?
নিশ্চয়ই সে তাকে আরেকবার দেখেছিল
সিদরাতুল মুনতাহার অতি সন্নিকটে
যার ধারে অবস্থিত স্বর্গোদ্দান।
সিদরাতুল মুনতাহা বৃক্ষটিকে আচ্ছাদিত করে রেখেছিল
যা আচ্ছাদিত করার।
তাঁর দৃস্টি বিভ্রান্তি ঘটেনি, এবং সীমা লঙ্গনও করেন নি–

- আয়েশা, একটু দাঁড়ান প্লিজ। ঘটনার এই কাব্যিক বর্ণনা বুঝতে আমার কষ্ট হচ্ছে। আল্লাহ প্রথমে তার নিজের সৃষ্টি তারকার কসম খাচ্ছেন কেন? পরবর্তি সবগুলো বাক্যই যেন তৃতীয় কোনো ব্যক্তির সাক্ষী মনে হয়। না হলে আল্লাহ কেন বলবেন- তখন আল্লাহ তার বান্দার প্রতি যা প্রত্যাদেশ করার তা করলেন। বাক্যটা তো এভাবে হওয়া উচিৎ ছিল- তখন আমি আমার বান্দার প্রতি যা প্রত্যাদেশ করার তা করলাম। এই সুরার প্রত্যেকটা বাক্যেই দেখা যায় আল্লাহ নিজেকে তিনি, যিনি, তার, সে, বলে উল্লখ করেছেন।

- আপনি যদি এভাবে প্রশ্ন করেন তাহলে তো মে'রাজের কাহিনি বলা হবেনা।

- ওকে, আই এম স্যরি, প্লিজ গো এহেড।

- সুরা নজমে মে'রাজের কথা এইটুকুই বলা হয়েছে। আর সুরা বনি ইসরাইলে যা বলা হয়েছে তা তো আগেই উল্লেখ করেছি যেমন- 'সকল মহিমা তাঁর যিনি তাঁর বান্দাকে ভ্রমন করিয়েছিলেন মসজিদুল হারাম থেকে দূরবর্তি মসজিদে, যার পরিবেশ আমি করেছিলাম মঙ্গলময়'। এখানে আপনি আবার প্রশ্ন করে বসবেন না যেন, সুরা নজম মক্কায় নাজিল হওয়ার এতো বৎসর পরে সুরা বনি ইসরাইল মদিনায় নাজিল হয়ে কোরানে তা ১৭ নম্বর, আর সুরা নজম ৫৩ হলো কীভাবে? সপ্নে যদি কোনোদিন খলিফা উসমানের দেখা পান, আপনি তাকে কোরান নিয়ে প্রশ্ন করবেন।

- জ্বী আচ্ছা, কোরান নিয়ে আর আপনাকে কোন প্রশ্ন করবোনা, প্রমিজ। আপনি মে'রাজের কাহিনি বলে যান।

- জিব্রাইলকে অর্ডার দেয়া হলো- 'হে জিব্রাইল, সত্তর হাজার ফেরেস্তা নিয়ে এক্ষুনি সোজা আমার বন্ধু মুহাম্মদের দরজার সামনে গিয়ে উপস্থিত হও। আর তুমি মিকাইল, জ্ঞানভান্ডার থেকে সকল অপ্রকাশ্য বাতিনী জ্ঞান নিয়ে সত্তর হাজার ফেরেস্তা সহ মুহাম্মদের দরজার সম্মুখে স্টান্ড-বাই থাকবে। আজরাইল আর ইসরাফিল, তোমরা দুই জন জিব্রাইল আর মিকাইলকে ফলো করবে। জিব্রাইল, চাঁদের আলো বাড়িয়ে দাও সূর্যের মতো করে, আর নিহারীকার সকল নক্ষত্রের আলো বাড়িয়ে দাও চাঁদের আলো দিয়ে।

- আয়েশা, ওয়েইট এ মিনিট প্লিজ। বিজ্ঞানের বারোটা বেজে যাচ্ছে। 'চাঁদের আলোয় প্রজ্বলিত হবে নক্ষত্র' এর মা'নেটা কী। চাঁদের কি আলো আছে?

- শেল আই স্টপ হেয়ার?

- নো, নো, প্লিজ ক্যারি অন।

- জিব্রাইল জিজ্ঞেস করলেন, 'প্রভু কিয়ামত কি আসন্ন'? আল্লাহ বললেন 'জিব্রাইল আজ আমি আমার বন্ধু মুহাম্মদকে সর্বকালের, সর্ববৃহৎ, সর্বশ্রেষ্ঠ রিসেপশন দেবো। তাঁকে আমার কছে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করো। আমি তাঁকে অতি গোপন অন্তরদৃস্টি জ্ঞান দান করবো'। জিব্রাইল জিজ্ঞেস করলেন 'প্রভু, জানতে পারি, গোপন জ্ঞানটা কী'?

আল্লাহ বললেন ‘দাসের কাছে মনিবের গোপন কথা বলা যায়না। আর একটা বাক্য ব্যয় না করে, তোমাকে যা আদেশ দেয়া হয়েছে তুমি তা'ই করো’। আল্লাহর নির্দেশ পেয়ে আকাশের কোটিকোটি ফেরেস্তা অপরূপ সাজে সেজে জিব্রাইলকে অনুসরণ করলেন। যথা সময়ে জিব্রাইল তাঁর ফেরেস্তাদল নিয়ে নবিজির দরজার সম্মুখে এসে উপস্থিত হলেন। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে জিব্রাইল ডাক দেন- ‘কুম ইয়া সাইয়্যিদী- ওঠো হে সরদার ঘুম থেকে ওঠো। নিমন্ত্রণ এসেছে রাজাধিরাজ প্রভুর কাছ হতে। মহাকাশের সীমানা পেরিয়ে বহুদূর যেতে হবে, যেথায় যাওয়ার কোন প্রাণীর সাধ্য নেই। আজ রাতে আসাধ্য সাধন হবে, আসুন মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন’। নবিজি চোখ মেলে তাকান। আকাশের সীমানায় যতদূর চোখ যায়,নবিজি তাকিয়ে দেখলেন, কোথাও এক তিল পরিমান যায়গা শুন্য নেই। আকাশ থেকে ভূ-পৃষ্ঠ পর্যন্ত চতুর্দিক শুভ্রবস্ত্র পরিহিত লক্ষকোটি ফেরেস্তায় ঘেরা। দরজার সামনে জিব্রাইলের পেছনে লাইন বেঁধে দাঁড়িয়ে আছেন হরেক রকমের প্রেজেন্টেস হাতে ৭০ হাজার স্বর্গদূত। সামনেই অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে আছে অত্যাশ্চর্য সাজে সজ্জিত একটি স্বর্গীয় জীব। জীবটির নাম ‘বোরাক’। দেহ তার ঘোড়ার আকৃতির, চেহারা যেন ষোলকলায় পরিপূর্ণ এক যুবতি রমণী। ঘাড়ের কেশব যেন মেঘ বরণ কন্যার রেশমী কালো চুল, হরিণীর মতো টানাটানা কাজল কালো দুটো আঁখি। ধনুকের মতো অধর দুটি আবীর রাঙ্গায় রঞ্জিত, স্ফটিকের মতো সাদা, তুলার মতো তুলতুলে নরম দুটি কান। রেশমী কাপড়ে সোনার ডোরা দিয়ে তৈরি তার পিঠের চাদর। চাদরের নিচে নরম গালিচা, যার চতুর্দিকে ঝুলে আছে সবুজ ঝিনুক পাথরের মালা। লেজে তার ময়ূর পুচ্ছ। সোনার চেইনের দুই দিকে হীরা পাথর দিয়ে তৈরি করা হয়েছে তার লাগাম। হলুদ রঙ্গের ডায়মন্ড দিয়ে তৈরি তার মাথার মুকুট যার চারিদিকে আছে চকচকে চুন্নি পাথর বা রক্তবর্ণ মাণিক। স্বর্ণালী রঙের ঝিনুক পাথর দিয়ে মুকুটে লেখা আছে- ‘দেয়ার ইজ নো গড বাট আল্লাহ, এন্ড মুহাম্মদ ইজ দ্যা মেসেঞ্জার অফ গড’। নবিজি কেঁদে উঠলেন। জিব্রাইল জিজ্ঞেস করেন ‘হে আল্লাহর রাসুল আপনি কাঁদছেন কেন’। রাসুল বললেন ‘জিব্রাইল আমার উম্মতগণকে ছেড়ে

আমি কোথায় যাচ্ছি'? জিব্রাইল সান্তনা দিয়ে বলেন 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, শুধু আপনার উম্মতদের মঙ্গলার্থেই আজ রাতের পার্লামেন্ট অধিবেশন'। শুনে নবিজি যারপর নেই খুশি হলেন। এ পর্যায়ে এসে ফেরেস্তাগণ নবিজির শানে একটি ওয়েলকাম বন্দনা গাইলেন-

স্বর্গ হতে এনেছি মালা
তব নূরে ভুবন উজালা
পরহে গলে এ ফুলমালা
হে নবিজি কামলিওয়ালা।

এই নির্দিষ্ট বোরাকটিকে চয়েস করেছিলেন জিব্রাইল নিজে। সংবর্ধনা অনুষ্ঠান আয়োজনের প্রস্তুতিকল্পে জিব্রাইল বোরাক ফ্যাকটোরিতে গিয়ে দেখেন, একটি জায়গায় ১৪ কোটি বোরাক খুশি মনে আল্লাহর নাম জপ করছে। প্রতিটি বোরাকের মাথার মুকুটে লেখা- 'দেয়ার ইজ নো গড বাট আল্লাহ, এন্ড মুহাম্মদ ইজ দ্যা মেসেঞ্জার অফ গড'। জিব্রাইল লক্ষ্য করলেন, অদূরে একটি বোরাক একাএকা বসে কাঁদছে। তিনি বোরাকটিকে জিজ্ঞেস করলেন 'হে বোরাক, তুমি এতো বিষণ্ন মনে কাঁদছো কেন'? বোরাক উত্তর দিল 'ওহে জিব্রাইল, ৪০ হাজার বছর আগে এই বেহেস্তে আমি একজন মানুষের পবিত্র নাম শুনেছিলাম। সেদিন থেকে ঐ মানুষটিকে দেখার তৃষ্ণায় আমার দানা-পানি বন্ধ হয়ে গেছে, আমি কোনো কিছু খাওয়ার রুচী হারিয়ে ফেলেছি'। জিব্রাইল বললেন 'আমি তোমার প্রীয় সেই মানুষটিকে তোমার পিঠেই সওয়ার করাবো'।

জিব্রাইলের একহাতে একটি বেহেস্তি মুকুট, অন্য হাতে একটি পেয়ালা। জিব্রাইল মুকুটটি নবিজির হাতে তুলে দিলেন। নবিজি জিজ্ঞেস করেন 'জিব্রাইল, এটা কী'? জিব্রাইল বলেন, হুজুর, যখন এই মহাবিশ্বের কিছুই ছিলনা, তখন এই মুকুটটি তৈরি করে আল্লাহ বেহেস্তের দারোয়ান রেদওয়ান ফেরেস্তার তত্বাবধানে রেখেছিলেন

বেহেস্তের একটি রুমে, একদিন আপনার মাথায় মুকুটটি পরানোর জন্যে। চল্লিশ হাজার প্রহরী ফেরেস্তা চল্লিশ হাজার বৎসর ঐ রুমকে সর্বক্ষণ পাহারা দিয়েছেন।

- কেন, কেন? বেহেস্তে পাহারাদারের কী দরকার? চুরি ডাকাতির ভয় ছিল বুঝি?

- আমি জানিনা। ওটা আপনি আল্লাহকে জিজ্ঞেস করবেন।

- আচ্ছা তারপর কী হলো বলুন।

- নবিজি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন 'আর তোমার হাতের এই পেয়ালায় কী জিব্রাইল'? জিব্রাইল বললেন, 'স্বর্গীয় সুধা। রেদওয়ান ফেরেস্তা চল্লিশ হাজার বছর পাহারা দিয়েছেন এই পেয়ালা। আজ রাতে আল্লাহর অনুমতিক্রমে রেদওয়ান এই পেয়ালা থেকে এক চুমুক সুরা পান করে ইসরাফিলের হাতে দেন। ইসরাফিল এক চুমুক সুরা পান করে পেয়ালা মিকাইলের হাতে দেন, মিকাইল এক চুমুক সুরা পান করে আজরাইলের হাতে দেন। আজরাইল এক চুমুক সুরা পান করে পেয়ালা নিয়ে যান বেহেস্তের হুর-গেলেমানদের কাছে। চল্লিশ হাজার হুর-গেলেমান এই পেয়ালার সুরা দিয়ে আজ রাতে স্নান করে সুন্দর থেকে আরো সুন্দরতম হয়েছেন। তাদের শরীর বিধৌত শরাব পুনরায় পেয়ালায় ভরে নিয়ে এসেছি আপনাকে এই শরাব দিয়ে গোসল করায়ে কিছুটা শরাব পান করাবো বলে'। নবিজি ঐ স্বর্গীয় সুরা দিয়ে গোসল করে, কিছুটা সুরা পান করে যখন বোরাকে আরোহন করলেন, সঙ্গে সঙ্গে অগণিত ফেরেস্তাদের গগন বিদারী করতালিতে আকাশ থেকে মর্ত্য-পূরী ভেদ করে গর্জন-ধ্বনি ভেসে উঠলো।

বোরাকের লাগাম হাতে ড্রাইভার জিব্রাইল ইঞ্জিনে স্টার্ট দিলেন। বোরাক মহাশুন্যে পা বাড়ালো। চোখের পলকে মধ্য-মরুভুমির এক জায়গায় এসে জিব্রাইল ব্রেইক কষলেন। 'আমরা কোথায় এলাম জিব্রাইল'। বিষ্ময়ভরা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন মুহাম্মদ। জিব্রাইল বললেন, 'নেমে আসুন হে সম্মানিত অথিতি। এই জায়গার নাম ইয়াতরিব। একদিন এর নাম হবে মদিনা, আর এটাই হবে ক্যাপিটাল সিটি অফ ইসলাম। এখান থেকেই সারা পৃথিবীতে আপনি ইসলাম বিস্তার করবেন'। যাত্রার সিডিউল অনুযায়ী এক সেকেন্ডেরও কম সময়ে বোরাক দ্বিতীয় স্টপে এসে থামলো। নবি জিজ্ঞেস করেন, 'এ

কোন্ জায়গা জিব্রাইল'। জিব্রাইল বলেন 'এর নাম সিনাই। আসুন, ঘুরে দেখুন সেই ঐতিহাসিক পবিত্র স্থান, যেথায় এসে আপনার প্রভু, মুসা নবির সাথে সরাসরি কথা বলেছিলেন'। তারপর আরো এক সেকেন্ডে বোরাক পৌছুলো তৃতীয় স্টপেজে। নবি জিজ্ঞেস করলেন 'এবার আমরা কোথায় এলাম জিব্রাইল'। জিব্রাইল বলেন 'এখন আমরা এসেছি ঈসা নবির জন্মভূমি জেরুজালেমের বেতলিহাম শহরে'। ঈসা নবির জন্মভূমি নবিজি খুশি মনে ঘুরে ঘুরে দেখলেন। বেহেস্তি কাপড় পরিহিত একজন যুবক আর একজন যুবতী এসে নবিজির কপালের মধ্যবর্তিস্থানে চুম্বন দিয়ে গেলো। নবিজি জিজ্ঞেস করলেন 'ওরা কারা ছিল'। জিব্রাইল বললেন 'আপনার দুজন বেহেস্তি উম্মত'। পরক্ষণেই উপস্থিত হলেন শারাবখানার সা'কীর বেশে একটি থালায়, দুধ, পানি ও শরাব ভর্তি তিনটি পেয়ালা হাতে অপরূপ সুন্দরী এক যুবতী নারী ফেরেস্তা। মুহাম্মদ থালা থেকে দুধের পেয়ালা তুলে নিলেন। নারী ফেরেস্তা পানি ও শারাবের পেয়ালা হাতে নিয়ে নবিজির কপালে চুম্বন দিয়ে চলে যায়। তারপর একটি স্বর্গীয় থালায় তিনটি রেশমী রুমাল নিয়ে উপস্থিত হলেন আরেকজন যুবতী ফেরেস্তা। নবিজি সাদা ও সবুজ রুমাল তুলে নিলেন। যুবতী কালো রুমাল ফেরত নিয়ে নবিকে সালাম জানিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। বনি-ইসরাইলদের মাটিতে হাটতে নবির বেশ ভাল লাগলো। হাটতে হাটতে তিনি জেরুজালেমের সুলাইমান মন্দিরে এসে উপস্থিত হলেন। এরই নাম মসজিদুল আকসা বা বাইতুল মোকাদ্দাস। মুহাম্মদ লক্ষ্য করলেন, তাঁর পেছনে দুই লক্ষ তেইশ হাজার নয় শত নিরান্নব্বইজন পয়গাম্বর দাঁড়িয়ে আছেন। আর প্রত্যেক নবির পেছনে চল্লিশ হাজার ফেরেস্তা। এখানে উল্লেখ্য যে, হজরত নুহের (আঃ) কিসতি বা নৌকা দুই লক্ষ তেইশ হাজার নয় শত নিরান্নব্বইটি তক্তা দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল। প্রত্যেকটি তক্তায় এক একজন পয়গাম্বরের নাম লিখা ছিল, আর গলুইয়ের উপর লেখা ছিল আমাদের নবি মুহাম্মদের নাম। যাই হউক, আগত সকল নবি ও ফেরেস্তাদের উদ্দেশ্যে জিব্রাইল এখানে একটি স্বাগতম বক্তব্য প্রদান করলেন-

‘এই সেই মহা মানব, যার জন্ম না হলে আকাশ-জমিন, স্বর্গ-নরক, গাছ-বৃক্ষ, জীব-জন্তু, জল-বায়ূ, জিন-ফেরেস্তা, নবি-পয়গাম্বর, কোন প্রকার জলীয়-বায়বীয় পদার্থের সৃষ্টি হতোনা। ইনিই আখেরি নবি, রাসুলগনের সর্দার, জগতের শান্তির প্রতীক, সৃষ্টির সেরা, আল্লাহর শ্রেষ্ট বন্ধু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (দঃ)। তার সম্মানে আয়োজিত সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে আপনাদেরকে জানাই উষ্ণ স্বাগতম’।

তারপর বক্তব্য নিয়ে আসেন আদি পিতা হজরত আদম (আঃ)। নাতিদীর্ঘ বক্তব্যে বাবা আদম আল্লাহর আদেশ অমান্য করে গন্দম খাওয়ার কথা উল্লেখ করে দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে, ৩৬০ বৎসর কাঁদাকাঁটি করে সেদিন আরাফাতের ময়দানে যদি নবি মুহাম্মদের দোহাই না দিতাম, আল্লাহ হয়তো আমাকে আর বিবি হাওয়াকে কোনদিনই মাফ করতেন না। তারপর পর্যায়ক্রমে কিনান শহরের মহাপ্লাবন, নমরুদের অগ্নিপরীক্ষা, নীলনদে ফেরাউনের শলীল সমাধি/পাহাড়ে প্রভু দর্শন, অন্ধের চক্ষুদান/মৃতের প্রাণ দান, এ সমস্ত বিষয়াদীর উপর সংক্ষিপ্তাকারে বক্তব্য নিয়ে আসেন যথাক্রমে হজরত নুহ (আঃ), হজরত ইব্রাহীম (আঃ),হজরত মুসা (আঃ) ও হজরত ঈসা (আঃ)। সব শেষে নবি মুহাম্মদ (দঃ) তাঁর সমাপনী ভাষনে সকলের প্রতি সাধুবাদ জানিয়ে, নিজে ইমাম হয়ে সকলকে নিয়ে দু' রাকাত নামাজ পড়েন। নামাজ শেষে নবিজি যেই মাত্র পুনরায় বোরাকে আরোহন করলেন, মহাশুন্য থেকে এক বিকট ধ্বনি নবিজির কানে আসলো-

‘জান্নাত এবং জান্নাতের সকল বাগান সমুহ, দুধের নদ নদীগুলো, বৃক্ষের পাতা সমুহ, সকল ফেরেস্তা ও হুর-পরী-গেলেমানগণ, চুড়ান্ত সাজে সজ্বিত হয়ে মুহাম্মদের সম্মানে মাথা নত করো। সৃষ্টি আজ স্বার্থক হউক’।

নবিজি প্রশ্ন করেন, ‘জিব্রাইল এ কার কণ্ঠ’? জিব্রাইল বলেন ‘ইনি হজরত ইস্রাফিল। এই আওয়াজ-ধ্বনি যদি জগতের কোন জীব শুনতে পেতো, মানুষ সহ সকল জীব একসাথে বধীর হয়ে যেতো’। এর পরপরই মুহাম্মদ আরো একটি বিরাট আওয়াজ শুনতে পেলেন- ‘হে স্বর্গের সিড়িগুলো, জীবনে প্রথমবারের মতো মুক্তি পেয়েছো,

তাড়াতাড়ি শুইয়ে পড়ো'। নবিজি জিজ্ঞেস করেন 'এ কার কণ্ঠ জিব্রাইল'? জিব্রাইল উত্তর দেন 'ইনি হজরত ইসমাইল'। চকচকে সোনা দিয়ে তৈরি স্বর্গের সিড়িগুলোর একপাশে লালচে আর ওপরপাশে সবুজ মুক্তা দিয়ে সাজানো। সিড়িগুলো প্রথম বেহেস্তের দরজা থেকে বাইতুল মোকাদ্দাসের দরজা পর্যন্ত বিস্তৃত হলো। মোট সিড়ির সংখ্যা একশো। এক সিড়ি থেকে ওপর সিড়িতে পৌছুতে সূর্যের আলোর সময় লাগে পাঁচশো হাজার বৎসর। বরণমালা হাতে প্রত্যেক সিড়িতে সত্তর হাজার করে লাইন বেঁধে দাঁড়িয়ে আছেন একএক রঙের কাপড় পরে একশো রঙের ফেরেস্তা। এই সিড়ির উপর আলো বিকিরণ করার জন্যে, চল্লিশ হাজার বছর আগে একটি লাইট-হাউস স্থাপন করা হয়েছিল প্রথম বেহেস্তের সদর দরজার সামনে। চল্লিশ হাজার বছর পর আজ রাতে এই প্রথম লাইটের সুইচ অন করা হলো। সাত আকাশ সাত জমিন ভেদ করে সেই লাইটের আলো এসে পড়লো বাইতুল মোকাদ্দাসের সিড়িতে– --কী হলো মালিক সাহেব? একেবারে নিশ্চুপ, কোনো কথা নেই। আপনার ঘুম পেয়েছে বুঝি?

- না, না, ঘুম নয় আয়েশা। আমি একটা জায়গায় আটকা পড়ে গেছি। ঐ যে বললেন, স্বর্গীয় পেয়ালার শরাব দিয়ে চল্লিশ হাজার বেহেস্তি হুর-পরী গোসল করলো আর তাদের শরীর নির্গত শরাব দিয়ে মুহাম্মদ গোসল করলেন এবং কিছু শরাব পানও করলেন, এর মধ্যকার কেরামতিটা আমি বুঝি নাই।

- গঙ্গাস্নান করেছেন কোনোদিন?

- জ্বী না, শুনেছি মেয়েরা নাকি ওখানের জলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পেশাব করেন।

- আপনি আস্ত একজন বোকা।

- জ্বী, আমারও তাই মনে হয়। আচ্ছা আয়েশা, বাইতুল মোকাদ্দাস থেকে প্রথম বেহেস্তের দূরত্ব কতো মাইল জানেন?

- আমি জানবো কিসে? সে যুগে ক্যালকুলেটার, কম্পিউটার তো ছিলনা, তবে হিসেবটা খুবই সহজ। আপনি কি জানেন, আলোর গতি প্রতি ঘন্টায় কতো মাইল?

- জ্বী জানি। ভকিইয়্যুমে আলোর গতি প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ১৮৬,২৮২,৪ মাইল কিংবা প্রতি ঘন্টায় ৫৭০৬১৬৬২৯,৩৮ মাইল।

- ব্যস। ৫৭০৬১৬৬২৯,৩৮ মাইল টাইমস ২৪ টাইমস ৩৬৫ টাইমস পাঁচশো হাজার টাইমস একশো মাইল, সমান বাইতুল মোকাদ্দাস থেকে প্রথম বেহেস্তের দূরত্ব। হিসেব মিলেছে?

- জ্বী না, জলতল বর্ষা হয়ে গেছে।

- আমি জানি আপনি অংকে কাঁচা। এবার বুঝুন, বোরাকের স্পিড সেকেন্ডে কতো মাইল ছিল। সে যাই হউক, এক এক করে একশোটি সিড়ি অতিক্রম করে মুহাম্মদ প্রথম বেহেস্তের দ্বারপ্রান্তে এসে হাজির হলেন। ফেরেস্তাগন প্রত্যেক সিড়িতে দাঁড়িয়ে ফুলের তোড়া ও হাজার প্রকারের প্রেজেন্ট দিলেন। বোরাকের পিঠে, জিব্রাইলের কাঁধে পাহাড়সম উঁচু প্রেজেন্ট এর স্তুপ জমা হলো। নবিজি বললেন 'জিব্রাইল, এই প্রেজেন্ট গুলো আমি দুনিয়ায় ফিরে গিয়ে আমার উম্মতগণকে বিলিয়ে দেবো'। প্রথম বেহেস্তের সামনে এসে মুহাম্মদ দেখলেন, গেইটের সম্মুখে স্বর্ণাক্ষরে লেখা 'দারুস সালাম'। বেহেস্তের দরজা বন্ধ। জিব্রাইল দরজায় নক করলেন। নক, নক। ভিতর থেকে আওয়াজ আসলো, 'হু ইজ দেয়ার'? জিব্রাইল বললেন 'ইটস মি, জিব্রাইল'। দরজা খুলে গেল। সাথে সাথে চল্লিশ হাজার বেহেস্তি যুবতী ফেরেস্তা সুরেলা কণ্ঠে গেয়ে উঠলো-
'ও নবি সা–লাম বা–রে বা–র–-'
কী ব্যাপার, চমকে উঠলেন যে?

- কিছু না, বেদের মেয়ে জোছনা মনে পড়ে গেলো।

- আরে সাহেব, ওটা কি বাংলাদেশের বাইদানীদের সুর ছিল? সেই সুর, তাল, লয়, জগতের কোন মানুষ পশু পক্ষী শুনতেও পারবেনা, জানতেও পারবেনা।

- দরকার নেই, প্লিজ ক্যারি অন।

- 'দারুস সালাম' বেহেস্তের দরজা ছিল দুই লক্ষ তেইশ হাজার নয় শত নিরান্নব্বইটি। প্রত্যেক দরজায় এক একজন নবির নাম লেখা। সামনেই ফুলেফলে সুসজ্বিত স্বর্গোদ্যান।

পাখির কণ্ঠে সুমধুর গান, নদীর কলতান যেন নারী কণ্ঠে গানের ব্যাকগ্রাউন্ডে মধুর হ্যামিং, বৃক্ষপল্লবীতে সুরের লহরী। অসংখ্য ছোটবড় সাইজের ডানাকাটা পরী নৃত্যের তালেতালে শুন্যাকাশে উড়ে বেরাচ্ছে। বাগানটির নাম 'সামাউদ্দুনিয়া'। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বেহেস্তি শিল্পীগণ মুহাম্মদের মনোরঞ্জনে কয়েকটি গান পরিবেশন করলেন। পাঁচশো হাজার আলোকবর্ষ পথ এক সেকেন্ডে পাড়ি দিয়ে বোরাক দ্বিতীয় বেহেস্তের সম্মুখে এসে দাঁড়ালো। দরজা বন্ধ, জিব্রাইল দরজায় নক করলেন। নক নক। ভেতর থেকে আওয়াজ আসলো, 'হু ইজ দেয়ার'? জিব্রাইল বললেন 'ইটস মি, জিব্রাইল'। দরজা খুলে গেল। এ ভাবে প্রত্যেকটি বেহেস্তে স্বর্গীয় রিসেপশন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। দ্বিতীয় বেহেস্তের নাম 'দারুল কারার' তৃতীয়টি 'দারুল খুলদ' চতুর্থটি 'জান্নাতুল মাওয়া' পঞ্চমটি 'জান্নাতুল নাঈম' ষষ্ঠটি 'জান্নাতুল ঈদান'। ছয়টি বেহেস্তই বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মতো। নবিজি দেখলেন সকল মন্ত্রণালয়ের দফতরগুলোতে ওয়ার্কার, সেক্রেটারি সবাই নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত। আমলাগণ আগেভাগেই সকল ফাইলপত্র ঠিকঠাক করে রেখেছিলেন। মুহাম্মদ সবগুলো ফাইলে চোখ বুলায়ে দেখলেন কোথাও কোনো ত্রুটি বিচ্যুতি নেই। আদম থেকে আজ পর্যন্ত কতোজন মানুষ জন্ম নিল, কতোজন মারা গেল, কতোজন আগামীতে জন্ম নিবে, কোথায় ঝড়-বৃষ্টি, কলেরা-মহামারী, প্লাবন-ভুমিকম্প হবে সবকিছু পুঙ্খানুপুংখরুপে লিপিবদ্ধ করা আছে। ষষ্ঠ বেহেস্তে হুজরত মুসা (আঃ) বললেন 'নবিজি' সংসদ অধিবেশনে আইন পাস করার সময় আপনার উম্মতের কথা স্মরণ করে বুঝেসুঝে দস্তখত দিবেন'।

বোরাক মুহাম্মদকে সপ্তম বেহেস্তে নিয়ে এলো। দরজা বন্ধ, জিব্রাইল দরজায় নক করলেন। নক নক। ভেতর থেকে আওয়াজ আসলো, 'হু ইজ দেয়ার'? জিব্রাইল বললেন 'ইটস মি, জিব্রাইল'। দরজা খুলে গেল। এই বেহেস্ত অন্যসব বেহেস্ত থেকে আলাদা। খাঁটি মররুত মণি, পোখরাজ, চকচকে মুক্তা আর বিভিন্ন রঙের হীরা দিয়ে সাজানো তার চতুর্দিক। এখানে কতোজন ফেরেস্তা আছেন, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেনা। তবে অনুমান করে বলা যায়, মহাবিশ্বের সকল সৃষ্টি, আকাশ পাতালের সকল জীবজন্তু,

সকল গাছ-বৃক্ষ লতা-পাতা একত্রিত করলে যে সংখ্যা দাঁড়াবে, এই বেহেস্তের ফেরেস্তার সংখ্যা হবে তার দশগুন বেশি। প্রত্যেক ফেরেস্তার চেহারার আলো দুনিয়ার দশটি সূর্যের আলোর সমান। এরা সবসময় আয়াতুল কুরসি পাঠ করেন। যখন এই ফেরেস্তাগণ আয়াতুল কুরসি পাঠ করা বন্ধ করে দিবেন তখন দুনিয়া তার মধ্যাকর্ষণ শক্তি হারিয়ে ফেলবে। এ পর্যন্ত যারা বেহেস্তি হয়েছেন, সকল জিহাদি, আউলিয়া, দরবেশ, গাউস কুতুব সবাই এখানে উপস্থিত। সকলের কপালে প্রজ্বলিত আলোর চন্দ্রটিকা। বেহেস্তটির নাম 'জান্নাতুল ফেরদাউস'। নবিজি জান্নাতুল ফেরদাউসের রূপ দেখে মুগ্ধ হলেন। আরো পাঁচশো হাজার আলোকবর্ষ পথ অতিক্রম করে বোরাক নবিজিকে নিয়ে এলো, সৃষ্টির শেষ সীমানায়, যেখানে অবস্থিত আছে এক বিরাট বৃক্ষ। বৃক্ষটির নাম 'সিদরাতুল মোনতাহা'। গাছের পাতায় পাতায় বসা আছেন সাদা দবদবে খুবই পাতলা সিল্কের শাড়ি পরিহিত হাজার হাজার হুরপরী। গাছের সর্বোচ্চ ডালে বসা হজরত আদম ও মা হাওয়া (আঃ)। গাছটির ডেকোরেটর স্বয়ং আল্লাহ নিজে। ডালপালা পাতা-কুঁড়ি ফলফুল সবকিছু তাঁরই নূরের তৈরি। জিব্রাইল নবিজিকে নিয়ে গাছের ভিতরে ঢুকলেন। সে এক আজগুবি কান্ড। এখানেই আছে সৃষ্টির সকল মেক্যানিজম। আল্লাহর সৃষ্ট মহাবিশ্বের এমন কোনো বস্তু নেই যা এখান থেকে দেখা যায়না। বৃক্ষের ভিতর পরিদর্শন করে জিব্রাইল নবিজিকে নিয়ে বেরিয়ে এসে বললেন- 'নবিজি এবার আমাকে বিদায় দিতে হবে। এই বৃক্ষের অপর পাশে পাঁচশো কোটি পর্দাল আড়ালে আছে আল্লাহর সিংহাসন 'লাওহে মাহফুজ'। অধীর আগ্রহে আল্লাহপাক, আপনার সাথে মোলাকাতের আশায় সেখানে বসে আছেন। একমাত্র আপনি ছাড়া কোন নবি পয়গাম্বর কিংবা ফেরেস্তা কেউ সেখানে যেতে চাইলে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে'। মুহাম্মদ বোরাকের দিকে তাকান, বোরাক কথা কয়না, জিব্রাইলের দিকে তাকান, জিব্রাইল নীরব নিশ্চুপ। রাসুল ভয় পেয়ে গেলেন। নরম পায়ে ধীরে ধীরে তিনি সামনে পা বাড়ালেন। আল্লাহ তার বন্ধুর অবস্থা টের পেলেন। ভয় নিবারণের জন্যে আল্লাহ তাঁর কুদরতি হাতে নবির জিহবায় একটি

আয়ূর্বেদী সঞ্জীবনী ট্যাবলেট ঢুকিয়ে দিলেন, যা ছিল বরফের চেয়েও বেশি ঠান্ডা, মধুর চেয়েও বেশি মিষ্ট।

- দাঁড়ান আয়েশা, আমার একটি কথা আছে।

- কী কথা?

- আপনি বলেছেন, একটি পর্দার ঘনত্ব পাঁচশো হাজার আলোকবর্ষ পথ। সেখানে পর্দা আছে পাঁচশোটি। পাঁচশো হাজার আলোকবর্ষ পথ টাইমস পাঁচশো, এতো লম্বা পথ নবিজি বোরাক ছাড়া অতিক্রম করবেন কীভাবে?

- ঐ ট্যাবলেটের কেরামতি। একই সাথে আল্লাহ মুহাম্মদের ডান কানে একটি ও বাম কানে একটি শীতল ড্রপ ঢেলে দিয়েছিলেন। এখন আর নবি রক্তমাংসের সাধারণ মানুষ নন, বরং এক মহা-শক্তি। মানুষ, জ্বীন ফেরেস্তা যা দেখতে পান না, শুনতে পান না,নবিজি তা দেখতে পান, শুনতেও পান। বোরাকের দরকার নেই শুধু ইচ্ছার প্রয়োজন। যখন যা চাইবেন তা'ই হয়ে যাবে। সপ্তম পর্দায় এসে মুহাম্মদ তাঁর ইচ্ছে ব্যক্ত করলেন-

'খোল খোল দ্বার রাখিওনা আর,
বাহিরে আমায় দাঁড়িয়ে–-

সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিক থেকে গায়েবি আওয়াজ আসলো-

'এসো এসো তুমি
বাহির হয়ে এসো যে আছো অন্তরে–-

নবিজি দেখলেন, তাঁর উপরে আল্লাহ, নিচে আল্লাহ, ডানে আল্লাহ, বামে আল্লাহ, পেছনে আল্লাহ, সামনে আল্লাহ, সর্বত্র আল্লাহ, তাঁর সর্বাঙ্গে আল্লাহ। মুহাম্মদ এবার অনুভব করলেন তিনি তাঁর মানবদেহ-বৈশিষ্ট হারিয়ে ফেলেছেন। তাঁর দেহ, মন, রুহ, আত্মা, অন্তর কিছুই খোঁজে পাচ্ছেন না। আল্লাহ নবির পঞ্চ-ইন্দ্রীয় গোপন জ্ঞান, দয়া, আশির্বাদ ও ভালবাসা দিয়ে পরিপূর্ণ করে তাঁর দেহে সব ফিরিয়ে দিয়ে দুনিয়ায় ফিরে যেতে আদেশ করলেন।

- আয়েশা, আল্লাহ ও মুহাম্মদের মধ্যে প্রাইভেট রুমে কোন্ বিষয় নিয়ে আলোচনা হলো, কী কী আইন কানুন পাস হলো, নবি স্বর্গ-নরক কখন পরিদর্শন করলেন, তা তো কিছু বললেন না?

- সবকিছু বিস্তারিত বলতে গেলে সাতখন্ড রামায়ণেও কুলাবে না। এবার বলুন, মে'রাজের স্টোরিটা কেমন লাগলো?

- ভেরি ইন্টারেস্টিং, কিন্তু নতুন নয়।

- নতুন নয় মা'নে?

- 'আরতা-ভিরাফ' এর নাম শুনেছেন?

- না তো।

- মুহাম্মদের জন্মের ৩৪৮ বছর পূর্বে লেখা এক স্বর্গ-ভ্রমন কাহিনি। সেই কাহিনিতে মুহাম্মদের ভুমিকায় ছিলেন 'আরতা-ভিরাফ' জিব্রাইলের নাম ছিল 'সারস' আল্লাহর নাম ছিল 'ওরমাজদ' আর শয়তানের ভুমিকায় ছিলেন 'আহরিমান'। ঐ কাহিনিতে স্বর্গ-নরক পরিদর্শন তো ছিলই, এমনকি 'সিদরাতুল মুনতাহা' বৃক্ষও ছিল, তবে গাছের নাম ছিল 'হোমাইয়া'।

২য় পর্ব-

- আচ্ছা আয়েশা, আপনার বাবার মতো আপনিও তো অন্ধবিশ্বাসী, তাই না?

- কী রকম?

- জিব্রাইলকে নাকি আপনি স্বশরীরে দেখেছেন?

- আমি এমন কথা কোনদিন বলিনি।

- শুনা যায় জিব্রাইল একরাতে ওহি নিয়ে আপনার বিছানায় এসেছিলেন, যা নবির আর কোন স্ত্রীর ভাগ্যে কোনদিন ঘটেনি?

- ও আচ্ছা সেই ঘটনা! শুনুন, দিনান্তে ক্লান্তি অবসানে একখানি ছোট্ট কম্বলের নিচে আমরা দুজন শুয়ে আছি। হঠাৎ উনি (মুহাম্মদ) বললেন, 'দেখো আয়েশা জিব্রাইল

এসেছেন, তোমাকে সালাম জানিয়েছেন'। আমি বললাম, হুঁ, নবি যা দেখতে পান আমি তা পাইনা। তাঁর প্রতিও আমার সালাম।

- আপনি সরাসরি জিব্রাইলের সালামের জবাব না দিয়ে নবিকে মাধ্যম ধরলেন কেন?

- জিব্রাইল তো সরাসরি আমাকে সালাম দেন নি, তাঁর সালামের আওয়াজও আমি শুনিনি। নবি যেভাবে বলেছেন আমিও সেভাবেই উত্তর দিলাম। নবি তাঁর স্ত্রীদের বিছানায় আসেন বাই-রটেশন। আমার বিছানায় আর আসবেন ১২/১৩ দিন পরে। অলস রাতের এমন আনন্দঘন মুহুর্তে কোন্ নারীর দায় ঠেকেছে, উষ্ণ-কম্বলখানি দূরে সরিয়ে পাশফিরে তাকিয়ে দেখে কে আসলো আর কে গেলো? হায়া শরম ত্যাগ করে কেউ যদি দাঁড়িয়েই থাকে, একজন নারীর তাতে কী' বা আসে আর যায়? আমি ইচ্ছে করলে স্বামীকে জিজ্ঞেস করতে পারতাম, কোথায় জিব্রাইল, আমি তো তার সালাম শুনলাম না, তাকে দেখিওনা।

- কেন জিজ্ঞেস করলেন না?

- কারণ, উত্তরটা যে আমার জানা।

- কী রকম?

- নবি যা দেখতে পান, শুনতে পান, অন্যরা তা দেখতে পায়না, শুনতে পায়না।

- কিন্তু অন্যরা তো দেখেছেন। নবিজি তাঁর সাহাবিদের নিয়ে যখন বসতেন তখন নাকি মাঝে মাঝে মানুষের রূপে জিব্রাইল এসে ঈমান শিক্ষা দিয়ে যেতেন।

- হ্যাঁ, হাদিসে আরো উল্লেখ আছে, খন্দকের যুদ্ধের সময় এক পর্যায়ে জিব্রাইল কাদা-মাটি মাখা গায়ে, দৌড়ে এসে হাপাতে হাপাতে নবিকে বলেছিলেন 'হে আল্লাহর রাসুল, আপনি অস্ত্র ছেড়ে দিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছেন, আর আমি এখনও খোলা তলোয়ার হাতে দৌড়াচ্ছি'।

- আচ্ছা! খন্দকের যুদ্ধে বুঝি জিব্রাইল ফ্রন্টলাইনে ছিলেন? শুনেছি জিব্রাইল নাকি খুব বড় সাইজের ফেরেস্তা?

- হ্যাঁ, তাঁর ছয়শো'টি বিশালাকারের ডানা আছে।

- আশ্চর্য ব্যাপার! এতোবড় ফেরেস্তা আপনার ঘরে আসলেন, আর আপনি দেখলেন না। তবে বিবি মরিয়ম, অর্থাৎ ঈসা নবির মা জিব্রাইলকে দেখেছিলেন তা নিশ্চয়ই সত্য। এতোবড় ফেরেস্তাকে দেখে বিবি মরিয়ম কি ভয় পেয়েছিলেন?

- হ্যাঁ, কোরানে ঈসা নবির জন্ম-কাহিনিতে তা উল্লেখ আছে। তবে মরিয়মও জিব্রাইলকে মানুষরূপেই দেখেছিলেন।

- ও আচ্ছা, মানুষরূপে দেখলে তো ভয়ের কিছু নেই। আয়েশা, আজিকার দিনের মানুষেরা বাবা আদমের পাঁজড় থেকে মা হাওয়ার জন্ম, আর ভায়রজিন মেরির পেট থেকে পিতাহীন ঈসার জন্ম, তা বিশ্বাসই করতে চায়না। আপনি নিশ্চয়ই বিষয়টা ভাল জানেন।

- আমি যেভাবে শুনেছি, আমাকে যেভাবে বলা হয়েছে, আমি সেভাবেই জানি। ঈসা নবিকে পিতাহীন করে সৃষ্টি করার লক্ষ্যে আল্লাহপাক বহু বছর আগে মরিয়মের স্বামী তৈরি করে রেখেছিলেন।

- এ্যাঁ, বলেন কী! মেরির স্বামী ছিলেন?

- এতো উত্তেজিত হলেন কেন সাহেব? এ এক বিরাট লম্বা কাহিনি।

- শর্টকার্ট করে বলা যায়না?

- ঠিক আছে বলবো, তবে এ কাহিনি বলতে গেলে আমার একটি কন্ডিশন আছে।

- কী কন্ডিশন?

- আপনি এভ্যুলুশন থিওরি টেনে আমাকে ডিস্টার্ব করতে পারবেন না। মানুষ কল্পনায় কতোজনকেই দেখে। আজ রাতে আপনি আমাকে দেখেছেন, কাল রাতে যে ডারউইন সাহেবকে দেখবেন না তার কি নিশ্চয়তা আছে?

- আরে না না, আমি সেদিকে মোটেই যাবোনা। বিবর্তনবাদে বিশ্বাসী আমার কিছু বন্ধু বান্ধবই আমার কাছে ওহি পাঠিয়েছেন এই বলে যে, আমি যেন আপনাকে সহজে ছেড়ে না দেই। একরাতে যতটুকু সম্ভব আমি যেন আপনার কাছ থেকে জেনে নিই, এমন রাত আর কোনোদিন না'ও আসতে পারে।

- ওকে। বাট রিমেম্বার, আমি যা বলবো তা আমার মুখের কথা নয়, এসব হাদিস ও তাফসির কিতাব সমুহে পৃথিবীর বহু দেশে, আপনাদের ভাষা সহ বহু ভাষায় লেখা আছে। কাহিনির শুরুটা হয়েছিল এ ভাবে- হঠাৎ একদিন আল্লাহ পাকের মনে ইচ্ছে জাগলো, নূরে মুহাম্মদী সৃষ্টি করার ——

এই তো সমস্যা, আপনি আমার কাছে কাহিনি শুনতে চাইবেন, আবার বিশ্বাসও করবেন না, হাসাহাসি করবেন। আপনি হাসলেন কেন?

- স্যরি আয়েশা, আমরা বিজ্ঞানের যুগের মানুষতো, তাই সব কিছুর পেছনে কারণ খোঁজার অভ্যেস হয়ে গেছে। ঐ যে বললেন, 'হঠাৎ একদিন'- আমার জনতে ইচ্ছে করে, এ কোন্ দিন, কতোদিন আগে, এর আগে আল্লাহর বয়স কতো ছিল বা কতোদিন আল্লাহ একাএকা ছিলেন?

- আপনার এ প্রশ্নের উত্তর জগতের কোন মানুষ কোনোদিন দিতে পারবে? শুনুন, আজেবাজে প্রশ্ন না করে কাহিনিটা মনযোগ দিয়ে শুনুন, – হঠাৎ একদিন আল্লাহ পাকের মনে ইচ্ছে জাগলো, নূরে মুহাম্মদী সৃষ্টি করার। এই নূরে মুহাম্মদী সৃষ্টি করার আগে আল্লাহর আরশ-কুরসি, বেহেস্ত-দোজখ, আকাশ-পাতাল, চন্দ্র-সূর্য, রাত-দিন, গ্রহ-নক্ষত্র, বৃক্ষ-লতা, জীব-জন্তু কোন প্রকারের জলীয়-বায়বীয় বস্তু বা পদার্থের অস্থিত্ব ছিলনা। নূরে মুহাম্মদী সৃষ্টি করে আল্লাহ তাঁর কুদরতি হাতের তালুতে রেখে এক নাগাড়ে চল্লিশ হাজার বৎসর মুহাম্মদ নামের তাসবিহ জপ করলেন। শুরু হলো আশিক আর মাশুকের লুকোচুরি খেলা। একবার আল্লাহ লুকান, মুহাম্মদ আল্লাহকে খুঁজেন আর একবার মুহাম্মদ লুকান, আল্লাহ মুহাম্মদকে খুঁজেন। হঠাৎ একবার মুহাম্মদ চালাকি করে লুকিয়ে গেলেন আল্লাহর পায়ের নিচে। চল্লিশ বছর গত হয়ে যায় আল্লাহ আর মুহাম্মদকে খুঁজে পান না। চল্লিশ বছর পর আল্লাহ নিজের বুকের বাম দিকে একটু বিরহের ব্যথা অনুভব করলেন, আর তখনই তাঁর চোখ থেকে একফুটো জল গাল বেয়ে ঝরে পড়লো। সাথে সাথে নূরে মুহাম্মদীতে ইশকের তুফান শুরু হয়ে যায়। নূরে মুহাম্মদী আল্লাহ নামের জিকির করলো কয়েক হাজার বছর। আল্লাহ খুব খুশি হলেন।

আহ্লাদে খুশিতে আটখানা আল্লাহ এবার মনস্ত করলেন নিজের মালিকানায়, নিজে পরিশ্রম করে কিছু সম্পদ সৃষ্টি করবেন। মাত্র ছয় দিনে তৈরি করলেন সাত আসমান সাত জমিন, ফেরেস্তা, বাগান সহ স্বর্গ, আগুন ভর্তি নরক। বিরাট আকারের এক ফেরেস্তার স্কন্ধে আল্লাহ তাঁর সিংহাসন আরশ তৈরি করলেন। ঐ ফেরেস্তার এক কান থেকে অপর কানের দূরত্ব হলো পাঁচশো বছরের রাস্তা। সাত জমিনের এক জমিনে আল্লাহ বড় বড় পাহাড়ের শক্ত খুঁটি দিলেন, তারপর সেই জমিন স্থাপন করলেন একটি বিগ সাইজের ষাঁড়ের শিঙ্গের উপর। একনাগাড়ে বিরামহীন ছয় দিন পরিশ্রম করে সপ্তম দিনে ক্লান্ত আল্লাহ গিয়ে বসলেন তাঁর সিংহাসনে। পাহাড়ের খুঁটিযুক্ত জমিনের ঠিক মাঝখানের নাম দিলেন মক্কা, আর কিছুদিন বিশ্রামের পর এই মক্কায় একখানা ঘর তৈরি করে তার নাম রাখলেন কা'বা শরিফ। কা'বা ঘর তৈরির চল্লিশ হাজার বৎসর পর আল্লাহর মনে ইচ্ছে জাগলো এই জমিন মানুষ নামের জীব দিয়ে আবাদ করাবেন। সকল ফেরেস্তাদের নিয়ে বৈঠকে আল্লাহ তার প্রস্তাব পেশ করলেন। একবাক্যে সকল ফেরেস্তা আল্লাহর প্রস্তাব রিজেক্ট করে দিলেন। আল্লাহ বললেন, 'আমি যা জানি তোমরা তা জানোনা'। আজরাইল ফেরেস্তাকে মানুষ সৃষ্টির মাটি সংগ্রহের জন্যে দুনিয়ায় পাঠানো হলো। শক্তিধর আজরাইল এক থাবায় তার মুষ্টিতে চল্লিশ মণ মাটি তোলে নিলেন। মানুষের নকশা আল্লাহ আগেই তৈরি করে রেখেছিলেন। নকশা অনুযায়ী ৪০ মণ মাটি দিয়ে ৮০ গজ লম্বা আদম নামের মানুষ সৃষ্টি করে, আরবের শ্যাম দেশের এক প্রান্তে শুইয়ে রাখা হলো ৪০ দিন। ৪০ দিন পর জিব্রাইল ফেরেস্তার ডাক পড়লো। আল্লাহ বললেন, 'হে জিব্রাইল, পৃথিবীতে যাও, আমার আদমকে বেহেস্তে নিয়ে এসো, আমি তার দেহে প্রাণ সঞ্চার করবো'। জিব্রাইল আদমের দেহ দুনিয়া থেকে উঠিয়ে বেহেস্তে নিয়ে আসলেন। কয়েকদিন প্রাণহীন আদমের দেহ আল্লাহর উঠোনে পড়ে রইলো। একদিন জিব্রাইলের হাতে আল্লাহ নিজের রুহ থেকে একটু রুহ দিয়ে বললেন- 'জিব্রাইল, এই রুহ আদমের মাথার তালু দিয়ে ঢুকিয়ে দাও'। একবার দুইবার তিনবার চেষ্টা করেও জিব্রাইল আদমের ভেতরে রুহ ঢুকাতে পারলেন না। রুহ বারবার আদমের

দেহ থেকে বেরিয়ে আসে। আল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন, 'হে রুহ, তুমি আমার নির্দেশ অমান্য করছো কেন'? রুহ উত্তর দিল, 'হে আল্লাহ, হে মালিক আদমের অন্ধকার মাটির খাঁচায় আমার থাকতে ভাল লাগেনা'? আল্লাহ জিব্রাইলকে বললেন, 'জিব্রাইল বেহেস্তের দিকে তাকাও, ঐ দেখো একটি উজ্জল তারকা (নূরে মুহাম্মদী) দেখা যাচ্ছে। ঐ তারকা আদমের কপালে ঘষে দাও'। জিব্রাইল তা'ই করলেন। আবার রুহ ঢুকানো হলো, এবার আদমের দেহ থেকে রুহ আর বেরিয়ে আসলোনা। একটা ঝাকুনি দিয়ে আদম জেগে উঠে নড়ে চড়ে বসলেন, আর সাথেসাথে একটা হাঁচি দিলেন। সেই হাঁচির সাথে আদমের নাক থেকে এক প্রকার তরল পদার্থ বেরিয়ে এলো। আল্লাহ জিব্রাইলকে আদেশ দিলেন, 'জিব্রাইল, আদমের নাক থেকে নিঃসৃত তরল পদার্থ একটি বেহেস্তি পেয়ালায় স্বযতনে ভরে রাখো, আমি তা দিয়ে একদিন ঈসা নবির মাতা মরিয়মের স্বামী বানাবো'।

- আচ্ছা আচ্ছা, এই বুঝি মরিয়মের স্বামী? উহ, আয়েশা আমি তো শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ করে অধীর অপেক্ষায় ছিলাম, আপনি মরিয়মের স্বামী হিসেবে জুসেফের মতো কোনো পুরুষের নাম বলবেন।
- কেন? শুধু ফিমেইল থেকে যে প্রজনন সম্ভব, তা তো আপনাদেরই শিক্ষা। আপনারা যে বলেন, পার্থেনোজেনিসিস (Parthenogenesis) বা asexual reproduction পুরুষ ছাড়াই হয়, তাহলে পিতাহীন ঈসার জন্ম মানতে বাধা কোথায়? তারপর ক্লোনিং করে যদি মানুষ ডলি দ্যা শিপ বানাতে পারে, তাহলে আল্লাহ কেন আদম থেকে হাওয়াকে বানাতে পারবেন না?
- আয়েশা আমাকে নিষেধ করে এবার আপনি নিজেই জীববিজ্ঞান নিয়ে আসলেন? কিন্তু আপনি যে মারাত্বক ভুল করছেন তা কি জানেন? প্রশ্ন যেহেতু করেছেন, সংক্ষেপে বলে দেই, Parthenogenesis বা asexual reproduction কোনটাই মানুষের মাঝে হয়না, আর আদমকে ক্লোনিং করতে হলে হাওয়ার ডিম্বাকোষ আগে তৈরি করে রাখতে

হবে। সেদিকে আমাদের না যাওয়াটাই ভাল কারণ আপনার সমসাময়ীক ইতিহাস থেকে আরো জরুরি বেশ কিছু বিষয় আপনার কাছ থেকে জানার আছে।

- আচ্ছা ঠিক আছে, ইতিহাসে যাওয়ার আগে আদমের কাহিনিটা শেষ করে নিই- একদিন আদম দেখলেন, বেহেস্তের এক কোণে তাঁরই মতো কিন্তু তাঁর চেয়ে সুন্দর একটি মানুষ বসে আছেন। বেহেস্তের আয়নায় নিজেকে দেখে আদমের মনে হিংসা ও দুঃখের উদ্রেক হলো। আদমের মন খারাপ দেখে আল্লাহ পাক তার গালে দাঁড়ির ব্যবস্থা করে দিলেন। আদম তা দেখে বেজায় খুশি হলেন। তাঁর মনে সুন্দর মানুষটিকে ছুঁয়ে দেখার বাসনা জাগ্রত হলো। অমনি আল্লাহর কাছ থেকে নিষেধ আসলো, 'হে আদম, খবরদার হাওয়াকে ছুঁইওনা, হাওয়ার গায়ে হাত দেয়ার আগে মোহরানা আদায় করতে হবে'। আদম বললেন হে প্রভু, এখানে মোহরানা দেয়ার মতো কিছু যে আমার নাই'। আল্লাহ বললেন, 'আদম, বেহেস্তের চারিদিকে চেয়ে দেখো'। আদম বললেন, 'প্রভু দয়াময়, বেহেস্তের চারিদিকে, উপরে নিচে, ডানে বামে, গাছের পাতায় পাতায়, তোরণে তোরণে আপনার নামের পাশে একটা নাম দেখছি, মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ'। আল্লাহ বললেন, 'আদম, ঐ নামে দশবার দরুদ শরিফ পড়ো, তোমার মোহরানা আদায় হয়ে যাবে'। আদম তা'ই করলেন, আদম হাওয়ার বিয়ে হয়ে গেলো। আল্লাহ, আদম ও হাওয়াকে গন্ধম বৃক্ষের নিকটে যেতে নিষেধ করলেন। একদিন ইবলিস শয়তান মা হাওয়াকে বললো, 'দেখো এখান থেকে বহু দূরে আল্লাহ একটি দুনিয়া সৃষ্টি করেছেন, তোমাদেরকে সেখানে পাঠিয়ে দিবেন, সেখানে বেহেস্তের সুযোগ সুবিধে নেই। বেহেস্তে থাকতে হলে তোমাদেরকে গন্ধম বৃক্ষের ফল খেতে হবে'। বেহেস্তে সুখের লোভে বিবি হাওয়া আল্লাহর কথা অমান্য করলেন এবং ধীরে ধীরে নিষিদ্ধ গাছের নিচে এসে দাঁড়ালেন। হাওয়া লক্ষ্য করলেন, ফলগুলো তাঁর হাতের নাগালের সামান্য বাইরে। তিনি দু পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের উপর ভর করে দাঁড়ালেন, অমনি তাঁর পায়ের গোড়ালী থেকে কিছুটা কাপড় উপরে উঠে যায়। হাওয়া মুখ তোলে উপরের দিকে তাকালেন, অমনি তাঁর মুখের ও মাথার কিছুটা কাপড় খোলে যায়। তিনি দুহাত উঁচু করে ফলের দিকে

হাত বাড়ালেন, অমনি হাতের কাপড় কনুই পর্যন্ত অনাবৃত হয়ে যায়। সেদিন মা হাওয়ার শরীরের চার জায়গা অনাবৃত হয়েছিল, এ জন্যে সেদিন থেকে জগতের মানুষের জন্যে ওজুর চার ফরজ নির্ধারিত হয়ে যায়। আল্লাহর আদেশ অমান্য করায় বাবা আদম, মা হাওয়ার উপর ভীষণ রাগান্বিত হলেন এবং হাওয়াকে তাঁর অপরাধের শাস্তি দেয়ার লক্ষ্যে পাশের জয়তুন গাছের একটি ডাল ভেঙ্গে নিয়ে এলেন। এই ভাঙ্গা জয়তুনের ডালটাই ছিল হজরত মুসা নবির হাতের আশা বা লাঠি, যে লাঠি সর্প হয়ে ফেরাউনের ১২ হাজার বিষাক্ত সাপকে একশ্বাসে গ্রাস করেছিল। সেদিন মুসা নবির সেই লাঠি ৪০ মাইল লম্বা অজগর হয়েছিল, যা দেখে ভয়ে ফেরাউন একদিনে ২০০ বার টয়লেট করেছিল। এদিকে যেইমাত্র আদম ও হাওয়া গন্ধম খেলেন, সাথে সাথে তাদের শরীর থেকে বেহেস্তি রেশমি কাপড়গুলো বাতাসে উড়ে যায়। তারা দুজনে বিবস্ত্র হয়ে বেহেস্তের চতুর্দিকে দৌড়াদৌড়ি করতে থাকেন আর বৃক্ষাদির কাছে মিনতি করতে থাকেন 'হে বৃক্ষাদি একটু দয়া করো, কিছু পাতা দাও ইজ্জত ঢাকি'। গাছ উত্তর দেয় 'হে আদম, পাতা দেয়া যাবেনা কারণ তোমরা প্রভুর আদেশ অমান্য করেছো'। আল্লাহ জিব্রাইলকে ডেকে বলেন 'হে জিব্রাইল, তাড়াতাড়ি এসো, আমার আদম বিপদে পড়ে গেছে, শীঘ্র জয়তুন গাছ থেকে ৮ টি পাতা আমার আদমের কাছে নিয়ে যাও। ৫ টি পাতা হাওয়াকে দিও আর ৩ টি পাতা আদমকে'। সেদিন থেকে পৃথিবীর মানুষের মৃত্যুর পর মহিলাদের জন্যে কাফনের ৫ কাপড় আর পুরুষের জন্যে ৩ কাপড় নির্ধারিত হয়ে যায়। আল্লাহর আদেশ অমান্য করার অপরাধের শাস্তি স্বরুপ আদম-হাওয়াকে আল্লাহ বেহেস্ত থেকে তাড়িয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। জিব্রাইলকে অর্ডার দেয়া হলো তাদেরকে দুনিয়ায় নিয়ে যেতে। জিব্রাইল বললেন, 'হে প্রভু, আদম-হাওয়াকে পৃথিবীর কোন জায়গায় রেখে আসবো'? আল্লাহ বললেন, 'হাওয়াকে মক্কা থেকে ৪০ মাইল দূরে জেদ্দা নদীর পাড়ে পূর্ব-মূখী করে, আর আদমকে আরবের সীমানা থেকে ৬০০ মাইল পূর্বদিকে সড়ং-দ্বীপের কিনারে পশ্চিম-মূখী করে রেখে আসবে'। হাওয়া, আদমের সন্ধানে হাটতে শুরু করলেন পূর্বদিকে আর আদম, হাওয়ার সন্ধানে পশ্চিম দিকে। একনাগাড়ে ৩৬০ বৎসর

একা একা কেঁদে কেঁদে হাটতে হাটতে জিলহাজ মাসের ৯ তারিখ শুক্রবার আরাফাতের মাঠে বাবা আদম ও মা হাওয়ার পুনর্মিলন হয়। দুনিয়ায় বাবা আদম ১ হাজার বছর হায়াত পেয়েছিলেন। মা হাওয়া ১৪০ বার হামেলা (গর্ভবতী) হয়ে প্রতিবারই জোড়ায় জোড়ায় একটি ছেলে ও একটি মেয়ে সন্তান প্রসব করেছিলেন। ১৪১ বার এর সময় একটিমাত্র ছেলে সন্তান জন্ম দেন, তিনিই জগতের দ্বিতীয় নবি হজরত শিষ (আঃ)। এভাবে নূরে মুহাম্মদী বাবা আদমের কপাল বেয়ে বেয়ে দুই লক্ষ তেইশ হাজার নয় শো নিরান্নবইজন নবির পর যেদিন আব্দুল্লাহর কপাল থেকে মা আমেনার গর্ভে চলে আসে, সেদিন থেকে শয়তানের জন্যে আকাশের সাতটি দরজা বন্ধ হয়ে যায়। ঐ দিন থেকে শয়তান আর প্রথম আকশের উপরে উঠতে পারেনা।

এই হলো বাবা আদম, মা হাওয়া আর ঈসা নবির জন্ম বৃত্তান্ত। এবার বলুন ইতিহাস থেকে কী জানতে চাইছিলেন?

- মা হাওয়াকে কীভাবে ক্লোন করা হলো তা তো বললেন না। আচ্ছা থাক, আপনার কাছ থেকে এবার জানতে চাইবো, একজন বুদ্ধিমতি নারী হয়ে আপনি হজরত আলীর বিরোদ্ধে অস্ত্রধারণ করলেন কেন? কমপক্ষে দশ হাজার নিরপরাধ মুসলমানের গলা কাটা হলো, কতো অসহায় নারী জানলোইনা কেন তারা বিধবা হলো, পিতৃহারা শিশুরা বুঝলোইনা কেন তাদের বাবা গৃহে ফিরলোনা।

- আমি জেনে বুঝে আরো অন্যান্য গন্য-মান্য সাহাবিদের সাথে আলাপ আলোচনা করেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। ভুল হয়েছিল সেদিন আলীর খেলাফত অস্বীকার করে নতুন রাজনৈতিক দল গঠন না করা। ইসলাম রক্ষা ও প্রচারে আমার দুই দুলাভাই সাহাবি হজরত তালহা (রাঃ) ও হজরত জুবায়ের (রাঃ) এর অবদান কেউ অস্বীকার করতে পারবেনা। তারা সহ বেশিরভাগ মুসলমান আমার পক্ষেই ছিলেন। প্রমাণ, জামাল যুদ্ধে আমার সৈন্য-সংখ্যা ছিল ত্রিশ হাজার আর আলীর পক্ষে ছিল বিশ হাজার।

- কিন্তু আয়েশা, বোন হয়ে ভাইয়ের বিরোদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছেন এমন ঘটনা ইতিহাসে বিরল। আপনার ভাই মুহাম্মদ তো আলীর পক্ষে ছিলেন। ঠিক না?
- হ্যাঁ তা ঠিক। যুদ্ধের কৌশলগত কারণে আরো কিছুটা সময় নেয়া আমার উচিৎ ছিল। শুধু আমার ভাই নয়, আমার আরো কিছু আপনজন না বুঝে সেদিন আমার বিপক্ষে গিয়েছিলেন।
- শুনা যায় হজরত আলী পত্র মারফত আপনার সাথে সমঝোতা করতে চেয়েছিলেন?
- কিসের সমঝোতা? ক্ষমতা আর সমঝোতা একসাথে চলতে পারেনা। আলী, সাহাবি উসমানকে হত্যা করায়ে জোর পূর্বক অগণতান্ত্রীক ভাবে ক্ষমতা দখল করেছিলেন।
- আলী তো খলিফা উসমানকে হত্যা করেন নি, করেছিলেন আপনার ভাই মুহাম্মদ। এর শাস্তি হিসেবে মুয়াবিয়া আপনার ভাইকে বস্তায় পুরে, তাতে আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মেরেছিলেন। কিন্তু এজন্যে আপনি নবির স্ত্রী উম্মে হাবিবাকে ‘বেশ্যা নারীর মেয়ে’ বলাটা কি ঠিক হলো?
- বলেছি তো। আবু সুফিয়ানের সন্তানদের বাবার কোন ঠায়-ঠিকানা আছে? মুয়াবিয়া নিজেই জানতেন না, তার বাবা কয়জন। মুয়াবিয়া আমার ভাইকে খুন করার পর তার বোন উম্মে হাবিবা আমাকে একটা আস্ত ছাগল ভুনে পাঠিয়ে দিয়ে খবর দিলেন, ‘আয়েশাকে বলো এ তার ভাইয়ের সদকা’। উম্মে হাবিবা আমার কাঁটা গায়ে লবন ছিটাবেন আর আমি মুখ বন্ধ করে থাকবো, তা তো হয়না।

- আয়েশা, উম্মে হাবিবার ভাই মুয়াবিয়া আপনার ভাই মুহাম্মদকে খুন করেছিলেন, আপনি তা মেনে নিতে পারছেন না, আর উম্মে হাবিবার ভাই হানজালাকে যখন খুন করা হয় তখন আপনি আর আপনার বাবা কী করছিলেন?
- বদরের যুদ্ধের কথা বলছেন?
- হ্যাঁ, শুনা যায় বদরের যুদ্ধের কারণেই উম্মে হাবিবা তার ভাই মুয়াবিয়া, বাবা আবু সুফিয়ান তারা কোনদিনই আবুবকর পরিবারকে ক্ষমা করতে পারেন নি।

- জানি, আমি তখন খুব ছোট ছিলাম। পরে শুনেছি আবু সুফিয়ান সারা জীবন আমার বাবাকে হত্যার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি সফল হতে পারেন নি,বৃদ্ধ বয়সে তার সুপুত্র মুয়াবিয়াকে তার মতোই সন্ত্রাসী বানিয়ে বদর যুদ্ধের প্রতিশোধ নিতে বলে গিয়েছিলেন। আমাদের প্রতি এতোই যদি শত্রুতা, আমার উপর, আমার বাবার উপর তাদের এতোই যদি দুঃখ ছিল, তাহলে যে ঘরে আমি আছি সেই ঘরে উম্মে হাবিবা বউ হয়ে আসার কী দরকার ছিল? মদিনায় কি পুরুষের—-

- আয়েশা, আপনাকে থামাতে হচ্ছে এ জন্যে যে, বদরের যুদ্ধের সময়ে যেহেতু আপনার বয়স কম ছিল, সম্ভবত দশ/এগারো হবে তাই না?

- জ্বী, এ রকমই হবে।

- আচ্ছা, আমাদের সময় স্বল্পতার কারণে এবং তখনকার সময়ে যেহেতু আপনার বয়স কম ছিল আমরা সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনায় যাচ্ছিনা। টুকটাক ইম্পোর্টেন্ট কিছু বিষয় জেনে নিয়ে আমরা কোরান বিষয়ে চলে যেতে চাই। তো আপনি বলছিলেন, হজরত আলী জোরপূর্বক অগণতান্ত্রিক ভাবে ক্ষমতা দখল করেছিলেন, আপনার কাছে এর প্রমাণ আছে?

- প্রমাণ সাহাবি হজরত তালহা (রাঃ) ও হজরত জুবায়ের (রাঃ)। আলী যখন এই দুই সাহাবিকে ডেকে নিয়ে তার খেলাফত মেনে নিতে প্রস্তাব করেন, আলীর সেনাপতি মালিক আশতার তখন খোলা তলোয়ার নিয়ে তাদের মাথার উপর দন্ডায়মান ছিলেন। হজরত জুবায়ের (রাঃ) আলীর প্রস্তাবে সম্মতি জানাতে যখন দেরি করছিলেন, সেনাপতি আশতার তখন হুংকার দিয়ে বলেছিলেন- 'আলী, জুবায়ারকে একবার আমার কাছে আসতে দাও, আমি এককোপে তার মস্তক দ্বিখন্ডিত করে দেই'। বসোরা থেকে তদন্ত কমিটি পাঠিয়ে আমরা তার প্রমাণ পেয়েছি। শুধু তালহা (রাঃ) ও জুবায়েরই (রাঃ) নয়, আলী আরো অনেককেই জোরপূর্বক তার খেলাফত মানতে বাধ্য করেছিলেন। এমনকি জামাল যুদ্ধে হজরত তালহার (রাঃ) খুনের হুকুমদায়ীও এই আলীই ছিলেন।

- আয়েশা ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, ইসলামের চার খলিফার সকলেই অগণতান্ত্রিকভাবে ক্ষমতা দখল করেছিলেন, সকলেই মৃত্যুর আগ পর্যন্ত অন্য কারো হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন নি, আর চার জনের তিনজনই মুসলমানের হাতে খুন হয়েছিলেন। আপনার বাবাও তো আলীর মতো একই পন্থায় ক্ষমতা দখল করেছিলেন, তিনিও খুনের দায়ী হতেন, যদি না তখন নবির মেয়ে হজরত ফাতিমা (রাঃ) জীবিত থাকতেন।

- আপনার কাছে এর কী প্রমাণ আছে?

- আপনার বাবাকে হজরত আলী এবং ফাতিমা খলিফা মানতে অস্বীকার করায়, আপনার বাবা হজরত ওমরকে (রাঃ) রাতের অন্ধকারে ফাতিমার ঘরে পাঠিয়েছিলেন। আর ওমর মানুষ সহ ফাতিমার ঘর আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়ার হুমকি দিয়েছিলেন, এই ঘটনাটা কি সত্য নয়?

- আলী ও ফাতিমা রাষ্ট্রদ্রোহী ছিলেন। প্রত্যেকদিন সন্ধ্যার পরেই ফাতিমার ঘরে বিদ্রোহীদের বৈঠক বসতো। ফাতিমার ঘরে বসে খলিফার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হতো। বাবা ইচ্ছে করলে তাদের উপর রাষ্ট্রদ্রোহীতার অভিযোগ এনে তাদেরকে বন্দী করতে পারতেন। আমার বাবাকে নবি নিজেই খলিফা মনোনীত করে গিয়েছিলেন। আলী জানেন, একমাত্র আমার বাবাই নবির জীবদ্দশায় ইমামতি করতে পেরেছিলেন। আলী ও ফাতিমা বাবাকে খলিফা না মানার আরো বহু কারণ আছে। বাবার সাথে তাদের মনোমালিন্য হয় নবির মালিকানায় কিছু জায়গার অংশীদারিত্ব নিয়ে। নবির মেয়ে হিসেবে ফাতিমা এসে বাবার কাছে ভাতা দাবি করতেন, অথচ আমি নবির স্ত্রী হিসেবে ভাতা দাবি করলে ফাতিমা বাধা দিতেন। আমার উপর কথিপয় লোকে যখন অসতীর অপবাদ এনেছিল, আলী এসে নবিকে পরামর্শ দিয়েছিলেন- 'নবিজি অসতী আয়েশাকে আপনি তালাক দিয়ে দিন'। সে অনেক লম্বা দুঃখের কাহিনি।

- এ সকল দুঃখের কাহিনিই কি জামাল যুদ্ধের প্রক্ষাপট তৈরি করে রেখেছিল? আচ্ছা আয়েশা, আপনি কি চান নি আপনার দুই দুলা ভাই সাহাবি হজরত তালহা (রাঃ) ও হজরত জুবায়ের (রাঃ) থেকে যে কোন একজন উসমান পরবর্তি মদিনার খলিফা হোন?

- হ্যাঁ, চেয়েছিলাম। আমার এই চাওয়াটা অযৌক্তিক ছিলনা।

– আপনি কি খলিফা উসমানকে প্রস্তাব করেছিলেন, আপনার ভাই মুহাম্মদকে মিশরের গভর্ণর বানাতে?

- হ্যাঁ, করেছিলাম।

- উসমান রাজী হয়েছিলেন?

- জ্বী না।

- আপনার ভাই মুহাম্মদকে হত্যা করার জন্যে খলিফা উসমান গুপ্তচরের মাধ্যমে মিশরের গভর্ণরের কাছে চিঠি দিয়েছিলেন, কথাটা কি সত্য?

- জ্বী সত্য।

- অনেকেই মনে করেন, খলিফা উসমান হত্যার সময় আপনি ইচ্ছে করেই নীরবতা অবলম্বন করেছিলেন, এমনকি উসমান হত্যার পেছনে আপনার পরোক্ষ সমর্থনও ছিল। কারণ উসমানকে আপনিও ভাল চোখে দেখতেন না। বিদ্রোহীরা উসমানকে হত্যা করার জন্যে উসমানের ঘর অবরোধ করেছে জেনেও আপনি মদিনা ছেড়ে চলে এসেছিলেন, এর অনেক প্রমাণ আছে। আচ্ছা রাজনীতি ছেড়ে চলুন আমরা এবার কোরান থেকে কিছু আলোচনা করি। নবির মৃত্যুর পর নবির বিধবা পত্নীগণের পুনঃবিবাহ নিষিদ্ধ, নারীর জন্যে পর্দা করা এবং নারীকে গৃহে অবরোধ রাখা, এই আইন তিনটির মূল কারণ না কি খাদিজা পরবর্তি নবির স্ত্রীগণ, বিশেষ করে আপনি? আপনাদের পূর্বে অর্থাৎ খাদিজার আমলে এই আইনগুলো ছিলনা। কোরানের তিনটি সুরা, অর্থাৎ সুরা নূর, সুরা আহজাব, ও সুরা তাহরিম যেন তিনটি নারী কেলেংকারী কাহিনি। সুরা নূর তো শুধু আপনারই কারণে নাজিল হয়েছিল, ঠিক না?

- তাই তো বলছিলাম, সে অনেক লম্বা দুঃখের কাহিনি। দেখুন আমি খুবই আত্মসচেতন স্পষ্টবাদী মানুষ। নীরবে অন্যায় সহ্য করতে পারিনা। অনেকে আমাকে অহংকারীর অপবাদ দেন। আসলে নবিরজির অনেক লোভাতুর, পরশ্রীকাতর সাহাবি ও আত্বীয়স্বজন আমার রূপ ও মেধায় সাংঘাতিক হিংসাপরায়ণ ছিলেন। তেরো সতীনের ঘরে আমিই

একমাত্র মহিলা, যার নবিজির সাথে বিয়ের আগে অন্য কারো সাথে বিয়ে হয়নি। আমার সংসার ছিল সকল বিধবা তালাক প্রাপ্তা নারীদের আস্তানা। হাফসার মতো মানুষ, মাত্র আটারো বছর বয়স, ছাপ্পান্ন বছরের মানুষের ঘর করতে এলো, আমার সাথে রাত ভাগাভাগি করতে। অবশ্য সে ইচ্ছে করে আসেনি, তাকে জোর করে নবির কাছে বিয়ে দেয়া হয়েছিল। তাদের পরিবারটাই ছিল সন্ত্রাসী টাইপের। ঝগড়া বিবাদ সব সময় লেগেই থাকতো। হাফসার পিতা ওমর জানেন, আমি আবুবকরের মেয়ে নবি মুহাম্মদের স্ত্রী, তারপরও কোন্ বিবেকে হাফসাকে নিয়ে এলেন আমার বাবার কাছে বিয়ে দিতে? বাবা রাজী হলেন না, হাফসাকে নিয়ে গেলেন উসমানের কাছে, উসমান রাজী হলেন না, নিয়ে এলেন আমার স্বামীর কাছে। কেন, মদিনায় কি যুবক পুরুষের আকাল পড়েছিল? হাফসাকে তিন সতীনের ঘরে দিয়ে ওমর বলে গেলেন- 'মা হাফসা, রূপের গরবিনী আয়েশার ব্যবহারে তুমি মনে দুঃখ নিওনা'। কেন? আমি ওমরের কী ক্ষতিটা করেছিলাম? আমার রূপে তাঁর এতো ঈর্ষা কেন?

– আয়েশা একটা মিনিট দাঁড়ান, এখানে কিছু কথা আছে। ওমর কিন্তু হাফসাকে আপনার স্বামী মুহাম্মদের কাছে নিয়ে যান নি। মুহাম্মদ নিজেই হাফসাকে বিয়ে করার বাসনা আপনার পিতা ও উসমানের কাছে আগেই ব্যক্ত করেছিলেন, যা ওমর জানতেন না।

- তাতে কী হয়েছে? ওমরের বিবেক বুদ্ধি নাই?

- হ্যাঁ হ্যাঁ কথাটা ঠিক, কিন্তু যেখানে আল্লাহর নবি স্বয়ং–-আচ্ছা যাক, আপনি রাগ করবেন না। আপনাকে রাগান্বিত করার কোনো অভিপ্রায় আমার নেই। তা কি যেন বলছিলেন? না থাক, এবার পর্দার ব্যাপারে কিছু বলুন, এই পর্দা নিয়ে আজকাল সারা দুনিয়া জুড়ে যে হুলুস্থুল হচ্ছে তার শুরুটা কোথায়?

- ওটাও ঐ হাফসার বাবা ওমরের নারীর প্রতি ঘৃণার ফসল। বাড়ির পাহারাদার চতুষ্পদ জন্তুটিও মাঝে মাঝে ঘুমায়, কিন্তু উনি ঘুমাতেন না। নিশাচরের মতো সারা রাত বাড়িবাড়ি চষে বেড়াতেন আর দেখতেন, কে কোথায় হাগা মুতা করলো। মোটা সাইজের

৫৪ বছর বয়সের আমার এক পেটলী সতীন ছিলেন, নাম তাঁর সওদা। আমি তাঁকে মাঝে মাঝে জৌক করে ফাট-কাও ডাকতাম। বয়সে তাঁর চেয়ে অনেক ছোট ছিলাম বিধায় তিনি মাইন্ড করতেন না। আমার কিশোরসুলভ ব্যবহারে তিনি বিরক্ত হতেন না বরং মুচকি মুচকি হাসতেন। তিনি আমার প্রতি খুব দরদী ছিলেন এবং আমার চোখের ভাষা বুঝতেন। একদিন স্বামীকে বললেন- ‘নবিজি, আমার বিছানায় আপনার রাত কাটাবার দরকার নেই, আপনাকে আমার চেয়ে আয়েশার বেশি প্রয়োজন, আমার রাত আমি আয়েশাকে দান করে দিলাম’। আনন্দে আমার চোখে জল আসলো আর আমার সতীনদের গায়ে লাগলো আগুন। প্রসঙ্গত এখানে একটা ঘটনার কথা বলি- ঘটনাটা একদিকে আমার জন্যে যেমন গৌরবের তেমনি লজ্জার ব্যাপার। আমার স্বামী, যে রাত আমার ঘরে থাকতেন, ঐ রাতে নবির বন্ধু-বান্ধবগণ আমার জন্যে উপহার পাঠাতেন। শুনতে খারাপ লাগছে, সাত গেরামের মানুষকে জানিয়ে ঢাকঢোল বাজিয়ে কেউ তা করেনা, তাই না? কিন্তু আপনাদের যুগে যত খারাপ লাগুক, আমাদের যুগে তত খারাপ মনে হতোনা। সে যুগের নারী আর এ যুগের নারী তো আর সমান নয়। দশ বারোজন সতীনের ঘর করার মানসিকতা আপনাদের যুগের কয়জন নারীর আছে? সে যাক, আমার কয়েকজন হিংসুক সতীন উম্মে সালমার ঘরে বসে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, তারা নবিকে বলবেন, রাত্রি বন্টনের সাথে যেন উপহার বন্টনও সমভাবে হয়। একটা বিশ্রী কারবার না? এর অর্থ হলো সারা দুনিয়া জেনে রাখুক নবি কোন্ রাতে কোন্ স্ত্রীর সাথে ঘুমাচ্ছেন। সে অনুসারে নবির বন্ধু-বান্ধবগণকে সঠিক স্ত্রীর ঘরে উপহার পাঠাতে হবে। লজ্জা শরমের মাথা খেয়ে আমার সতীনগণ সত্যি সত্যিই তাদের দাবি নবিকে জানিয়ে দিলেন। এর আগেও তারা আমার সাথে রাত ভাগাভাগি নিয়ে নবিকে বিরক্ত করেছিলেন। সেই সময় নবি তাদেরকে বুঝিয়েছিলেন যে, পরিবারে অবিবাহিত নারী আর তালাক প্রাপ্তা বা বিধবা নারীর অধিকার সমান নয়। সতীনদের দাবি শুনে নবি একটু বেকায়দায় পড়ে গেলেন। আকাশে জরুরি মিটিং ডাকা হলো, জিব্রাইল ইমার্জেন্সি ফ্লাইটে সমাধান পত্র হাতে নিয়ে রাসুলের সামনে এসে হাজির হলেন। নবিজি আমার

সতীনদেরকে শুনিয়ে দিলেন- 'তোমরা আয়েশার কথা বলে আমাকে বারবার বিরক্ত করোনা, আল্লাহর কাছে আয়েশার মর্যাদা তোমাদের সকলের চেয়ে বেশি। একমাত্র আয়েশার বিছানায় জিব্রাইল ওহি নিয়ে আসেন, আর কারো নয়'। ব্যস,তাদের মুখ চিরদিনের জন্যে বন্ধ করে দেয়া হলো। সে যা'ই হউক, আমার ঐ রিসপেক্টেবল ফাট-লেডি সওদা বেগম একরাতে পেশাব করতে বাইরে গেলেন। আমাদের সময়ে টয়লেট ইন্ডাষ্ট্রি উন্নতমানের ছিলনা, আমরা মুক্ত খোলা আকাশের নিচে বসে বাহ্য-মুত্র ত্যাগ করতাম। সওদা বেগমের বটগাছ মার্কা দেহ হজরত ওমরের দৃষ্টি এড়াতে পারলোনা। বিড়ালের চোখের চেয়েও অধিক পাওয়ারফুল ছিল ওমরের চোখ। ওমর হাক দিয়ে বলেন- 'হে, সওদা, পেশাব করার আর জায়গা পেলিনা একেবারে চোখের সামনে এসে বসে গেলি'? বেচারী সওদা কোনরকম শরীরটাকে টেনে টেনে হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরে ফিরে গেলেন। পরের দিন সাত সকালে ঘুম থেকে উঠেই ওমর নবীপত্নীগণের সামনে এসে বলে গেলেন- 'রাত-বিয়ালে নবির স্ত্রীগণ যেন ঘোমটা ঘামটা দিয়ে পেশাব পায়খানা করেন'। আকাশে ইমার্জেন্সি মিটিং ডাকা হলো আর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে পর্দার আইন পাস হয়ে গেলো।

- আয়েশা আপনি বলেছেন, তেরো সতীনের ঘরে আপনিই একমাত্র মহিলা, যার নবিজির সাথে বিয়ের আগে অন্য কারো সাথে বিয়ে হয়নি। কোরানের আত-তাহরিম সুরাটি যার কারণে রচনা করা হলো, তাঁকে আপনি নিশ্চয়ই চিনেন।

- কে? সেই ক্রীতদাসীর কথা বলছেন? ওর নাম শুনলে আমার গা ঘিনঘিন করে। একটা কেনা বাঁদী। দাসী হয়ে কোরায়েশ বংশের বউ হওয়ার সাধ জেগেছিল।

- তার নামটা কি ছিল?

- ম্যারিয়া কিবতিয়া। মিশরের বাদশাহর একজন খ্রিস্টান দাসী।

- তিনিও কি আপনার মতো সতী, অবিবাহিত ছিলেন, বিধবা কিংবা তালাক প্রাপ্তা ছিলেন না?

- ওর আবার সতী-অসতীর কী আছে? ওরা তো যার কাছে বিক্রী হয় তারই সম্পদ। ম্যারিয়া খুবই অহংকারী ছিল, বলতো- তার কুঁকড়ো চুলের মতো সুন্দর চুল নাকি আর কারো নেই। ১৮ বছর বয়সে এসেছিল ৬০ বছরের মানুষের ঘর করতে। হাফসার মুখ থেকে তার কেলেংকারী ঘটনা শুনার পর বমি করতে ইচ্ছে হয়। আমি হলে তো আত্মহত্যা করতাম। সংসারে এসে একটা বাচ্চাও দিয়ে দিল।

- আয়েশা, এখানে ম্যারিয়ার কী দোষ? বেচারী ম্যারিয়া একজন ক্রীতদাসী, তার তো কিছু করার ক্ষমতা নেই। আপনি খামোখাই তার উপর রাগ করছেন।

- তো, আমি কি আল্লাহ, আল্লাহর রাসুলের উপর রাগ করবো? আল্লাহ, আল্লাহর রাসুলকে দোষারুপ করবো?

- না, না, তওবাহ, তওবাহ, নায়ুজুবিল্লাহ, তা করবেন কেন? আচ্ছা বলুন, তাঁর মধ্যে এমন কী বিশেষ ব্যক্তিত্ব ছিল যে তাঁকে নিয়ে আল্লাহকে কোরানের পাতায় দু-কলম লিখতে হলো?

- আল্লাহর মুখ থেকে শুনতে চান, না আমার কাছ থেকে?

- আল্লাহর মুখ থেকেই শুনা যাক।

- কোরানের ৬৬ নং সুরা আত-তাহরিমের ১ থেকে ৫ পর্যন্ত আয়াতগুলো দেখুন- (আয়াত ১)- হে নবি, আপনি কেন তা হারাম মনে করবেন, যা আল্লাহ আপনার জন্যে হালাল করে দিয়েছেন, আপনি কেন আপনার স্ত্রীগনকে খুশি রাখতে চান? আর আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়াময়।

- বুঝলাম না, এই আয়াতের সাথে ম্যারিয়ার কী সম্পর্ক? এখানে বলা হচ্ছে, নবিজি প্রথমে একটা হারাম জিনিসকে হারামই মনে করেছিলেন, শেষে আল্লাহর কথায় মাইন্ড চেইঞ্জ করেছেন।

- প্রথমে হারাম মনে করেছিলেন আমাদের প্রতিবাদে।

- কিন্তু বস্তুটা কী? নবি মনে করেন হারাম, আর আল্লাহ মনে করেন হালাল, সে জিনিসটা কী? আর আপনারাই বা কিসের প্রতিবাদ করেন?

- জিনিসটা ঐ দাসী ম্যারিয়া কিবতিয়া।

- তো, এখানে হালাল হারামের কী আছে?

- ম্যারিয়ার সাথে নবিজির সম্পর্ক হালাল না হারাম তা দেখতে হবে না? আল্লাহ এসে এ সম্পর্ক হালাল না করে দিলে তো আমরা কোন সময়ই চুপ থাকতাম না।

- আচ্ছা, শেষ পর্যন্ত আপনারা তাদের সম্পর্ক মেনে নিয়েছিলেন বুঝি?

- নাহ। আমি মানি নাই। শুধু আমি নয় নবির সকল স্ত্রীগনের সম্মিলিত প্রতিবাদের মুখে নবি বাধ্য হয়েছিলেন ম্যারিয়াকে অন্যত্র সরিয়ে নিতে। লোকমুখে রটনা আছে সেই জায়গার সাথে তার বাচ্চা জন্ম দেয়ার সম্পর্ক আছে।

- কী ছিল বাচ্চাটার নাম?

- ইব্রাহিম।

- আচ্ছা বাচ্চাটার কথা পরে শুনবো, আগে বলুন তারপর কী হলো?

- দেখুন (আয়াত ২)- আল্লাহ নির্ধারণ করে রেখেছেন তোমাদের জন্যে শপথ থেকে মুক্তির উপায়, আর আল্লাহ তোমাদের রক্ষাকারী আর তিনি সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়।

- 'শপথ থেকে মুক্তি' কথাটার শানে নুজুল কী? কিসের শপথ আর কার সাথে শপথ ভাঙ্গাভাঙ্গি?

- হ্যাঁ, এখানেই তো আসল ঘটনা। পরের আয়াতগুলো পড়ে নিন, তখন ঘটনা বুঝতে সুবিধে হবে। (আয়াত ৩)-নবি যখন তাঁর এক স্ত্রীকে গোপনে একটি কথা বললেন, আর সে নবির গোপন কথা অন্যকে বলে দিল, আল্লাহ নবিকে সে কথা জানিয়ে দিলেন। নবি তার স্ত্রীকে সে কথার কিছু বললেন আর কিছু গোপন রাখলেন। স্ত্রী বললো আপনাকে কে বলেছে, নবি বললেন, তিনি বলেছেন যিনি সর্বজ্ঞ, সবজান্তা।

- নবি কার কাছে গোপন কথা বললেন, সে'ই বা কার কাছে কী বলে দিল, কোনো নাম ধাম নাই কেন? আর গোপন কথাটাই বা কী? আয়েশা এখনো ঘটনার কিছুই তো বুঝলাম না।

- নবি যার কাছে গোপন কথা বলেছিলেন, তার নাম হাফসা। হাফসা যার কাছে নবির গোপন কথা বলে দিয়েছিলেন, সে আমি আয়েশা। আর গোপন কথাটা হলো দ্বিতীয় আয়াতে উল্লেখিত শপথ। এক কাজ করুন, বাকি দুটো আয়াত একসাথে পড়ে নিন। কোরান পড়ে আপনি এভাবে ঘটনা বুঝবেন না, কারণ আপনি তো আর ঘটনার সময় উপস্থিত ছিলেন না। আর কোরানে ব্যক্তির নাম, ঘটনার স্থান, সময় সাধারণত উল্লেখ থাকেনা। আমি পরে আপনাকে সবগুলো আয়াতের তাফসির বলে দেবো। পড়ুন (আয়াত ৪)-তোমরা দুজনে ইতোমধ্যে অন্যায় করে ফেলেছো, যদি তওবাহ করে সংশোধন হয়ে যাও তবে ভাল, আর যদি তোমরা নবির বিরুদ্ধাচরণ করো, নবির বিরুদ্ধে কুৎসা রটনায় একে অপরকে সাহায্য করো, তবে মনে রেখো নবির সাহায্যকারী আছেন আল্লাহ, মুমিনগণ, জিব্রাইল ও আসমানের সকল ফেরেস্তা। (আয়াত ৫)- আজ যদি নবি তোমাদেরকে তালাক দেন, কাল হয়তো আল্লাহ নবিকে তোমাদের চেয়ে উৎকৃষ্ট, আত্মসমর্পিতা, বিশ্বাসিনী, অনুতাপকারিণী, বিনয়বণিতা, উপাসনাকারিণী, আজ্ঞাবহ, বিবাহিতা কিংবা কুমারী নারী দিবেন।

- আয়েশা, শেষের আয়াত পড়ে আমার মনে হচ্ছে ঘটনাটা তো মারাত্বক। আল্লাহ আপনাকে অন্যায়কারী বললেন? পরে একেবারে তালাক দেয়ার হুমকি, আমার তো ভয় লাগছে, বিষয়টা কী?

- সম্পূর্ণ ঘটনাটাই তাহলে শুনুন- আমার স্বামী মুহাম্মদ মাঝেমাঝে বিভিন্ন দেশের বাদশাহ বা শাসনকর্তার কাছে ইসলাম গ্রহনের দাওয়াতপত্র পাঠাতেন। এমনি একখানি পত্র, হাতেব বিন আবি বালতাহ' র মারফত মিশরের বাদশাহ আল্ মোকাকাস এর কাছে পাঠালেন। বাদশাহ পত্র উত্তরে জানালেন যে, তাদের নিজস্ব ধর্ম আছে, আপাতত অন্য কোনো ধর্ম গ্রহন করার ইচ্ছে নেই তবে পরে বিবেচনা করা যেতে পারে। দাওয়াত-নামার সৌজন্য স্বরুপ বাদশাহ মোকাকাস,নবিকে অল্প বয়সী সুন্দরী যুবতি দুই সহোদর বোন ক্রীতদাসী উপহার দিলেন। একজনের নাম ম্যারিয়া অপরজন শিরীন। ম্যারিয়া ছিল শিরীনের চেয়ে অপেক্ষাকৃত সুন্দরী। শিরীনকে নবিজি তাঁর ফেভারেইট কবি হাসান

বিন তাহবিত আল্ আনসারীকে দিয়ে দিলেন আর ম্যারিয়াকে রাখলেন নিজের জন্যে। প্রথমে দাসী ম্যারিয়াকে নবিজি ঘরে না তুলে হারিতা বিন আল্ নোমানের ঘরে রেখেছিলেন। সেই ঘরে নবিজির ঘন ঘন যাওয়া আসা যে, আমার গাত্রদাহের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে আমি তা সকলকে জানিয়ে দিয়েছিলাম। একদিন নবি হাফসাকে বললেন যে, তার বাবা ওমর নাকি তার সাথে দেখা করতে চেয়েছেন। হাফসা তার বাবার সাথে দেখা করতে বাপের বাড়ি চলে গেলেন, আর ঐ দিন ম্যারিয়া হাফসার ঘরে আসে। হাফসা বাপের বাড়ি গিয়ে জানতে পারেন, তার পিতা তার সাথে সাক্ষাতের আশা করেন নি এবং তিনি বাড়িতেও নেই। হাফসা ততক্ষনাৎ নিজ ঘরে ফিরে আসেন। উল্লেখ্য, ঐ দিন রাতে নবিকে হাফসার ঘরে রাত কাটানোর তারিখ ছিল। ঘরে ফিরে হাফসা ম্যারিয়াকে তার বিছানায় দেখতে পান। নবিজি দরজার সামনে বেরিয়ে এলেন। হাফসার মাথায় ততক্ষণে আগুন চড়ে গেছে। চিৎকার করে নবিকে ধমক দিয়ে হাফসা বলেন, 'আমার বিছানায় এ সব হচ্ছেটা কী'? নবিজি হাফসাকে শান্ত থাকার অনুরুধ করে বলেন, 'হাফসা তুমি যদি ঘটনা কারো কাছে প্রকাশ না করো, তাহলে আমি শপথ নিলাম এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি আর হবেনা'। হাফসা সবকিছু বিস্তারিত আমার কাছে বলে দেন। ঘটনার এখানেই সমাপ্তি হয়ে যেতো, কিন্তু পরে শুনা গেলো কুঁকড়ো চুলি অত্যাধিক ফর্সা রঙ্গের ম্যারিয়াকে আল্লাহর পছন্দ লেগে গেছে। আল্লাহ নবিকে শপথ ভাঙ্গার আদেশ দিলেন। তারপর যা হবার তা'ই হলো। আমাদেরকে অন্যায়কারী বলা হলো, তালাকের ধমক দেয়া হলো। এই হলো হারাম হালাল ও শপথ ভাঙ্গাভাঙ্গির শানে নুজুল।

- এতো তাড়াতাড়ি একটা হারাম জিনিস হালাল হয়ে গেলো, আর আপনি কিছু বললেন না?

- আমার সেই বয়সে, সেই সময়ের বাস্তবতায়, সেই অবরোদ্ধ পরিবেশে, সেই সীমাবদ্ধতায় আমার কতোটুকু করারই ছিল? তবুও বলেছি, 'নবিজি আপনাকে খুশি করতে দেখছি আকাশ থেকে আপনার আল্লাহর ওহি পাঠাতে খুব একটা দেরি হয়না'।

- অথচ আপনার ব্যাপারে আল্লাহর ওহি পাঠাতে কতোই না দেরি হলো।

- আমার ব্যাপারে মা'নে?

- ঐ যে, লোকে আপনাকে অসতীর অপবাদ দিয়েছিল। থাক, আমরা তা নিয়ে একটু পরে আলোচনা করবো। ম্যারিয়ার বিষয়ে আরেকটু জানার বাকি রয়ে গেছে। আয়েশা, আপনি বলেছিলেন, আপনাদের প্রতিবাদের মুখে ম্যারিয়াকে নবিজি অন্যত্র সরিয়ে নিয়েছিলেন এবং লোকমুখে রটনা আছে যে, সেই জায়গার সাথে তার বাচ্চার জন্মের সম্পর্ক আছে। বিষয়টা একটু খোলাসা করবেন?

- শুনা যায় ম্যারিয়ার এক ক্রীতদাস বয়ফ্রেন্ড ছিল। ম্যারিয়া যে জায়গায় থাকতো, ক্রীতদাস যুবকটাও সে জায়গায় যাওয়া আসা করতো। খবরটা যখন নবিজির কানে পৌছুলো, তিনি তাঁর জামাতা আলীকে নির্দেশ দিলেন ঐ যুবককে মেরে ফেলতে। আদেশ পেয়ে আলী তলোয়ার হাতে ঐ জায়গায় উপস্থিত হলেন। আলীকে দেখে যুবকটি একটি খেজুর বৃক্ষের উপরে উঠে যায়। সে পরনের কাপড় উপরে উঠিয়ে আলীকে তার লিঙ্গ দেখায়ে ইশারায় বলে যে, সে নপুংষক। তা দেখে আলী তাকে ক্ষমা করে দেন।

- সর্বনাশ! এ তো দেখি আরেক গুরুতর অবস্থা। তাহলে নবির একমাত্র ছেলে ইব্রাহিমের পিতা নিয়ে মানুষের সন্দেহ ছিল? এখানে একটা পারসোন্যাল প্রশ্ন করি আয়েশা, মনে কিছু নিবেন না। বিবি খাদিজার পরে কমপক্ষে বারোজন নারী নবির সংসারে এসেছিলেন। আপনার কি মনে হয় তারা সকলেই বন্ধ্যা বা সন্তান জন্ম দানে অক্ষম ছিলেন?

- না, তাদের অনেকেরই একাধিক সন্তান ছিল।

- আচ্ছা ম্যারিয়ার বয়ফ্রেন্ড ঐ যুবক বুঝলো কীভাবে যে, আলী তাকে হত্যা করতে আসছেন? আলীই বা কীভাবে খেজুর গাছের উপরে বসা তার লিঙ্গ দেখে বুঝলেন যে সে নপুংষক? আর কোনো কারণ ছাড়া নবিজি যুবকটাকে হত্যার আদেশ দিবেন কেন?

- আপনার এ সকল প্রশ্নের উত্তর দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমরা শুনেছি, নবি বলেছেন, একদিন জিব্রাইল এসে নবিকে এভাবে সম্বোধন করেছিলেন- ‘আসসালামু

আলাইকুম ইয়া আবি ইব্রাহিম 'ইব্রাহিমের বাবা, আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হউক'। এর চেয়ে ভাল বার্থ সার্টিফিকেট আর কী হতে পারে?

- আয়েশা, আপনি এক্রোমগালী (Acromegaly) বা Hormonal disorder রোগের নাম শুনেছেন?

- না তো। ওটা কী?

- আমার মনে হয় আপনার স্বামী মুহাম্মদ, খাদিজা পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ শেষ বয়সে ঐ রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন।

- আমাদের সময়ে তো চিকিৎসা বিজ্ঞান এতো অগ্রসর হয়নি। আমরা তা পরীক্ষা করতাম কী ভাবে?

- ঠিকই বলেছেন। আয়েশা এবার আমরা কোরানের সুরা আহজাব নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো।

- বিবি জয়নাবের কাহিনি?

- জ্বী, আপনার বাবার মতো জ্ঞাণী গুণী বুদ্ধিমান পুরুষ নবিজির জীবনে এবং ইসলামের ইতিহাসে অনেক অনেক খ্যাতিমান পুরুষ এসেছেন, কারো নাম কোরানে স্থান পায়নি। জয়নাবের স্বামী জায়েদের নাম আল্লাহর পাক মুখে উচ্চারিত হলো কোরানে, এর কোন নির্দিষ্ট কারণ কি আছে?

- মালিক সাহেব, জেনে শুনে মাঝে মাঝে এমন সব প্রশ্ন করেন, যার উত্তর আমার জানা নেই, অথবা জানা থাকলেও মুখে বলা যায়না।

- আই এম স্যরি আয়েশা। আপনাকে কোনো প্রকার বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতিতে ফেলার বা কোনো ব্যাপারে অভিযুক্ত করার ইচ্ছে আমার মোটেই নেই। আমি বুঝি আপনার আর আমার মাঝে সময়ের ব্যবধান অনেক যুগ। তো, আমি জানতে চেয়েছিলাম, ইসলামের জন্যে এতোসব নিবেদিত প্রাণ, যারা ইসলামের জন্যে নিজের জীবন দিলেন, ঘর-বাড়ি, স্ত্রী-পুত্র ধন-সম্পদ উজাড় করে দিলেন, যারা সারা জীবন কোরান নিজ হাতে

লিখে আল্লাহ ও নবিকে সাহায্য করলেন, তাদের কারো নাম কোরানে স্থান পেলোনা আর জয়নবের স্বামী জায়েদের নাম পেলো, কারণটা কী?

- কোরান আমি লিখিও নাই, আমার উপর কোরান নাজিলও হয় নাই। আর যখন নবিজি তাঁর পুত্রবধু জয়নবকে বিয়ে করেন, ইসলাম তখন একটি শক্তিশালী রাস্ট্রের নাম, এক পরিপূর্ণ জীবন বিধান। সে সময় আল্লাহ এবং নবির কোনো সিদ্ধান্তের উপর প্রশ্ন করার সাহস খুব কম মানুষেরই ছিল। সুরা আহ্জাব যার কারণে লেখা হয়েছিল, লাল ওয়ার্নিংটা সেখানেই লেখা আছে- 'আল্লাহ ও তাঁর রসূল কোনো সিদ্ধান্ত নিলে, কো্নো ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন মত প্রকাশের ক্ষমতা নেই, যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সিদ্ধান্ত অমান্য করে সে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়। (সুরা আহজাব আয়াত ৩৬)

- আচ্ছা আয়েশা, সুরা আহজাবে যাওয়ার আগে প্রাসঙ্গিক হিসেবে একটা প্রশ্ন করি। জয়নবের ঘরে নবির মধু খাওয়া নিয়ে যে ঘটনা ঘটেছিল, তার সাথে সুরা আত-তাহরিমে বর্ণীত ম্যারিয়ার কি কোন সম্পর্ক আছে?

- কোথায় সুরা আহ্জাব আর কোথায় সুরা আত্ তাহরিম, কোথায় জয়নব আর কোথায় ম্যারিয়া। ভেবে আশচর্য হই, আপনারা এসব তাফসির কোথায় পান? হাফসার বেডরুমে যারা মধু খাওয়ার ঘটনা আবিষ্কার করতে পারেন, তারা বোধ হয় আপনাদের ভাষায় কুড়ালকে খ্যাতা বলেন। এক সময় নবিজি যখন আমার প্রতি বেশি মনযোগী ছিলেন, আমার সতীনগণ তাতে ঈর্ষান্নিত হতেন, জয়নবকে বিয়ে করে নবিজি যখন তার প্রতি বেশি মনযোগী হলেন তখন আমিও ঈর্ষান্নিত হই, ম্যারিয়ার সময়েও একই ঘটনা ঘটে। এ শুধু সতীনদের মধ্যে সাধারণ নারীসুলভ প্রতিক্রীয়া ছাড়া আর কিছু নয়। জয়নবের ঘরে মধু খাওয়া নিয়ে আমরা সকলে মিলে নবিজির সাথে হাসিঠাট্টা করেছি, এ ঘটনা নবির সকল স্ত্রীগন জানতেন। কিন্তু হাফসার ঘরে ম্যারিয়ার ঘটনা আমি আর হাফসা ছাড়া কেউ জানতোনা। তুচ্ছ মধু খাওয়া নিয়ে নবিজি কেন কসম খাবেন, আবার কাউকে বলতে নিষেধ করবেন, আবার আল্লাহর কথায় কসম ভাঙ্গবেন, আবার এই কসমের

কথা একজনের কাছে কিছু গোপন রাখবেন আর অন্যজনের কাছে কিছু প্রকাশ করবেন? এসমস্ত জগাখিছুড়ি মার্কা তাফসির আমাদের যুগে ছিলনা। তারপর সুরা আহজাব ও সুরা তাহরিম নাজিলের সময়-কাল, এবং জয়নব ও ম্যারিয়ার বিয়ের সময়-কালের ব্যবধান কতো, তা লক্ষ্য করলেই আসল সত্যটা বেরিয়ে আসে, ঠিক না?

- থ্যাঙ্ক ইউ আয়েশা, বিষয়টা ক্লিয়ার করার জন্যে। তবে আমি একটা কথা এখানে যোগ করি- ম্যারিয়া যখন নবিজির জীবনে আসেন, ততক্ষণে জয়নবের মধু শুকিয়ে যাওয়ার কথা, কী বলেন?

- তা আপনি বলতে পারেন, আমিতো বলতে পারিনা।

- আচ্ছা,জায়েদ মানুষটা কেমন ছিলেন?

- আয়ানকে তো আপনি নিশ্চয়ই চিনেন?

- আয়ান! কোন্ আয়ান?

- কমলাবতীর মেয়ের স্বামী আয়ান।

- কমলাবতীকেও তো চিনলাম না।

– মথুরা কোথায় জানেন?

– জ্বী জানি।

– বৃন্দাবন?

– কোনোদিন যাই নাই তবে নাম শুনেছি।

– শ্রীমতি রাধিকার স্বামীর নাম আয়ান।

– বলেন কি! আয়েশা আপনি ভুল করছেন। আমি জানি গোপীকুলের সুন্দরী রাধা রাণীর স্বামীর নাম ভগবান শ্রী কৃষ্ণ।

– হায়, হায়, হায়, আপনি আসলেই বুদ্ধু।

– তা কি আর বলতে হয় আয়েশা? তো, আয়ান তার সুন্দরী স্ত্রী রাধাকে তালাক দিল কেন?

– বলবোনা। কৃষ্ণলীলা শিখে আসুন তারপর বলবো।

– তো, এখন আমি কার কাছ থেকে জানবো?

– সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসা করুন।

– দরকার নাই আমার কৃষ্ণলীলা শেখার।

– আচ্ছা মালিক সাহেব, আমরা যে রাতের শেষ প্রহরে চলে এসেছি তা খেয়াল করেছেন? আপনি বলেছিলেন সুরা আহজাব নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবেন। লেটস মুভ অন।

- আচ্ছা ঠিক আছে। এবার বলুন জয়নবকে আপনি কতটুকু চেনেন।

- উবায়দুল্লাহ বিন জাহসের বোন জয়নব বিনতে জাহস সাংঘাতিক অহংকারী মহিলা ছিলেন। উবায়দুল্লাহ তার স্ত্রী উম্মে হাবিবাকে (মুয়াবিয়ার বোন) নিয়ে আবিসিনিয়ায় যাওয়ার পর ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে খৃষ্ট ধর্ম গ্রহন করেন এবং সেখানেই মারা যান। এই উম্মে হাবিবাই পরবর্তীতে আমার সতীন হয়ে, একদিন আমার ঘরে আস্ত বকরি রান্না করে পাঠিয়ে দিয়ে ব্যঙ্গ করেছিলেন।

- আচ্ছা আচ্ছা, উম্মে হাবিবা এক সময় জয়নবের ভাবী ছিলেন? নবির স্ত্রীগণ কি জায়েদকে পুত্রতুল্য মনে করতেন?

- অবশ্যই। সমাজে তার পরিচয় ছিল জায়েদ ইবনে মুহাম্মদ। সুরা আহজাব নাজিল হওয়ার আগ পর্যন্ত সকলেই জাযেদকে, জায়েদ ইবনে মুহাম্মদ বলে ডাকতেন। সুতরাং জায়েদের স্ত্রী জয়নব, নবি পত্নীগণকে মা হিসেবে দেখবেন এটাইতো স্বাভাবিক। জয়নব এ ঘরের বৌ-মা হয়ে এসেছিলেন। বিশেষ করে বিবি খাদিজাকে তো জায়েদ তার আসল মায়ের চেয়েও বেশি সম্মান করতো।

- কি আশচর্য আল্লাহর লীলা খেলা। মা, বৌ-মা, ভাবী-ননদ, সবাই এক ঘরে! জয়নবের আর কোনো বোন ছিলেন না?

- ছিল, এক নাগিনী।

- নাগিনী কেন? তার কোন নাম নাই?

- হাম্মানাহ। সব সময় মানুষের গিবত খুঁজে বেড়াতো। হিংসা পরনিন্দা ছাড়া তার আর কোনো কাজ ছিলনা। তার নামটা মনে রাখবেন পরে আলোচনায় আসতে পারে। কারণ আমি জানি, আপনি ঘুরে ফিরে একবার ঐ জায়গায় আমাকে নিয়ে যাবেন।

- কোন্ জায়গায়?

- এখন বলবোনা।

- জ্বী আচ্ছা। এবার সুরা আহজাব থেকে জয়নবের সাথে নবির বিয়ে সংক্রান্ত বিষয়ের আয়াতগুলো তেলাওত করে একটু শুনান প্লিজ।

- পড়ুন (সুরা আহজাব আয়াত ৩৬) আল্লাহ ও তাঁর রসূল কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিলে কোন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন মত প্রকাশের ক্ষমতা নেই যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আদেশ অমান্য করে সে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়। (আয়াত ৩৭) আল্লাহ যাকে অনুগ্রহ করেছেন; আপনিও যাকে অনুগ্রহ করেছেন; তাকে যখন আপনি বলেছিলেন, তোমার স্ত্রীকে তোমার কাছেই থাকতে দাও এবং আল্লাহকে ভয় কর। আপনি অন্তরে এমন বিষয় গোপন করছিলেন, যা আল্লাহ পাক প্রকাশ করে দেবেন, আপনি লোকনিন্দার ভয় করেছিলেন অথচ আল্লাহকেই অধিক ভয় করা উচিত। অতঃপর জায়েদ যখন জয়নবের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলো, তখন আমি তাকে আপনার সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করলাম যাতে মুমিনদের পোষ্যপুত্ররা তাদের স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলে সে সব স্ত্রীকে বিবাহ করার ব্যাপারে মুমিনদের কোনো অসুবিধা না থাকে। আল্লাহর নির্দেশ কার্যে পরিণত হয়েই থাকে।

- আয়েশা এখানে একটু তাফসিরের প্রয়োজন আছে। নবি একদিকে জায়েদকে বললেন 'তোমার স্ত্রীকে তোমার কাছেই থাকতে দাও এবং আল্লাহকে ভয় কর' অপর দিকে নবি অন্তরে একটা জিনিস গোপন করছিলেন, যা তিনি লোক নিন্দার ভয়ে প্রকাশ করছিলেন না। আপনি একটু দাঁড়ান আমি তাফসিরে জালালাইন খুলে এই জায়গাটা একটু দেখে নিই। 'When you said to him, 'Retain your wife for yourself and fear God', before divorcing her. But you had hidden in your heart what

God was to disclose, [what] He was to manifest of your love for her and of [the fact] that should Zayd part with her you would marry her, and you feared people, would say, ‘He has married his son’s wife!’, though God is worthier that you should fear Him, in all things, so take her in marriage and do not be concerned with what people say. Zayd subsequently divorced her and her [obligatory] waiting period was completed. God, exalted be He, says: So when Zayd had fulfilled whatever need he had of her, We joined her in marriage to you — the Prophet consummated his marriage with her without [the customary] permission [from her legal guardian] and gratified the Muslims with [a feast of] bread and meat — so that there may not be any restriction for the believers in respect of the wives of their adopted sons, when the latter have fulfilled whatever wish they have of them. And God’s commandment, that which He has decreed, is bound to be realised. এখানে তো দেখা যায় জয়নবের প্রতি আগ্রহ বা জয়নবকে পেতে নবির মনে বাসনা জেগেছিল আয়াত নাজিল হওয়ার আগে। আপনারা সতীনদের কথা না হয় বাদই দিলাম, কম্যুনিটির মানুষ তথা নবির সাহাবিগণও কি এ বিয়েকে মেনে নিতে রাজী ছিলেন না?

- কানাঘুসা চলছিল সর্বত্রই। কারণ জায়েদ একজন ক্রীতদাস হলেও অত্যন্ত সুপরিচিত ব্যক্তি ছিল। আট বৎসর বয়স থেকে এই পরিবারে বড় হয়েছে। তার মা বাবা যখন তাকে ফেরত নিতে এসেছিলেন তখন নবিজি লোকের সামনে তাকে পালক পুত্র হিসেবে ঘোষণা দিয়ে গ্রহন করেছিলেন।

- তো এতোদিন যাবত মানুষ যে জায়েদকে, জায়েদ ইবনে মুহাম্মদ বলে ডেকে আসছিল, আর জায়েদ যে নবিকে বাবা বলে সম্বোধন করলেন, নবি কি কোনোদিন অবজেকশন করেছিলেন?

- না, তবে জয়নবকে বিয়ে করার পরে ওহির মাধ্যমে তা নিষেধ করে দেয়া হয়, যেমন- 'মুহাম্মদ তোমাদের কোনো ব্যক্তির পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবি। আল্লাহ সব বিষয়ে জ্ঞাত'। (সুরা আহজাব, আয়াত ৪০)

- কিন্তু আয়েশা, এর বহু পরে ম্যারিয়ার গর্ভে যখন মুহাম্মদের পুত্র সন্তান জন্ম নিল, আর জিব্রাইল এসে নবিকে ডাকলেন- 'ইয়া আবি ইব্রাহিম' তখন কি নবি জিব্রাইলকে নিষেধ করেছিলেন তাকে ইব্রাহিমের বাবা না ডাকার জন্যে?

- না।

- তাহলে তো জিব্রাইল এবং নবি উভয়েই কোরান অমান্য করলেন। আচ্ছা থাক সে কথা। আয়েশা আমার কাছে সহিহ মুসলিম শরিফ আছে, জয়নবের বিয়ের বিষয়টা আরেকটু ভালভাবে বুঝার জন্যে হজরত আনাসের (রাঃ) বর্ণীত একটা হাদিস আমরা দেখে নিই- When the 'Iddah (ঋতুস্রাব) of Zainab was over, Allah's Messenger said to Zaid to make a mention to her about him (Muhammed). Zaid went on until he came to her (Zainab) and she was fermenting her flour. He (Zaid) said: As I saw her I felt in my heart an idea of her greatness so much so that I could not see towards her (simply for the fact) that Allah's Messenger had made a mention of her. So I turned my back towards her, and I turned upon my heels, and said: Zainab, Allah's Messenger has sent (me) with a message to you. She said: I do not do anything until I solicit the will of my Lord. So she stood at her place of worship and the (verse of) the Qur'an (pertaining to her marriage) was revealed, and

Allah’s Messenger came to her without permission... (Sahih Muslim, Book 008, Number 3330) তাহলে কি আমরা বুঝে নিব যে, বিয়ের প্রস্তাবটা আসলে নবিজি জায়েদের মাধ্যমে জয়নবের কাছে পাঠিয়েছিলেন? জয়নব কেন বললেন যে তিনি আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া কিছু করেন না? তিনি কি জায়েদকে বিশ্বাস করেন নাই, না কি জয়নব জানতেন, শীঘ্রই আল্লাহর আদেশ হয়ে বিয়ের প্রস্তাব তৈরি হচ্ছে?

- প্রস্তাবটা যখন তৈরি হয় তখন আমি সামনেই ছিলাম। ঘটনাটা তাবারি সাহেব তার বইয়ে লিখে রেখেছেন, দেখুন- “Zayd left her, and she became free. While the Messenger of Allah was talking with Aisha, a fainting overcame him. When he was released from it, he smiled and said, ‘Who will go to Zaynab to tell her the good news? Allah has married her to me.’ Then the Prophet recited [Qur’an 33] to the end of the passage. Aisha said, ‘I became very uneasy because of what we heard about her beauty and another thing, the loftiest of matters, what Allah had done for her by personally giving her to him in marriage. I said that she would boast of it over us.'” (Tabari VIII:3) অহংকারী জয়নব বিয়ের পরে বারবার বলেছেন যে,আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুলের কাছে তার সম্মান নবিপত্নীগণের সকলের চেয়ে বেশি, কারণ একমাত্র তারই বিয়ের প্রস্তাব কোরানে ডকুমেন্টেড করা আছে।

- আয়েশা আপনি যেহেতু তাবারির নামটা উল্লেখ করেছেন, তিনি এ ব্যাপারে আর কিছু কি লিখে রেখেছেন?

- হ্যাঁ, এই অংশটুকু দেখতে পারেন- “One day Muhammad went out looking for Zayd. Now there was a covering of haircloth over the doorway, but the wind had lifted the covering so that the doorway was

uncovered. Zaynab was in her chamber, undressed, and admiration for her entered the heart of the Prophet. After that Allah made her unattractive to Zayd.'" (Tabari VIII:4)

- জয়নব'কে নবিজি আনড্রেসড অবস্থায় দেখেছিলেন? যাক, আয়েশা এবার আমরা জয়নব পর্ব ছেড়ে দিয়ে এই সুরায় বর্ণীত অন্য প্রসঙ্গে চলে যাবো। নিন্দুকেরা বলে, এই সুরায় নাকি আল্লাহ নবিজিকে বিয়ের ফ্রি লাইসেন্স দিয়ে দিয়েছেন, কোন্ সে আয়াতটা?

- ফ্রি লাইসেন্স কিনা বলতে পারবোনা তবে যে আয়াতটার দিকে ইঙ্গিত করা হয় তা হলো- 'হে নবি! আপনার জন্য আপনার স্ত্রীগণকে হালাল করেছি, যাদেরকে আপনি মোহরানা প্রদান করেন। আর দাসীদেরকে হালাল করেছি, যাদেরকে আল্লাহ আপনার করায়ত্ব করে দেন এবং বিবাহের জন্য বৈধ করেছি আপনার চাচাতো ভগ্নি, ফুফাতো ভগ্নি, মামাতো ভগ্নি, খালাতো ভগ্নিকে যারা আপনার সাথে হিজরত করেছে। কোন মুমিন নারী যদি নিজেকে নবির কাছে সমর্পন করে, নবি তাকে বিবাহ করতে চাইলে সেও হালাল। এটা বিশেষ করে আপনারই জন্য-অন্য মুমিনদের জন্য নয়। আপনার অসুবিধা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে। মুমিনগণের স্ত্রী ও দাসীদের ব্যাপারে যা নির্ধারিত করেছি আমার জানা আছে। আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু'। (আয়াত ৫০)

- এতো স্ত্রীগণ মিলেও নবির অসুবিধা আপনারা দূর করতে পারলেন না, যার জন্য আল্লাহকে বলতে হল- 'আপনার অসুবিধা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে'। আপনারা যদি নবির চাহিদা মেটাতে না পারেন তাহলে আল্লাহকে তো একটা ব্যবস্থা করতেই হবে, তাই না?

- এই সুরায় এসে আল্লাহ নবি পত্নীগণের প্রতি এক্সট্রিম পজিশনে চলে যান। বেশ কিছু কড়াকড়া আইন আমাদের জন্যে তৈরি হয়। আমাদের অন্তরে কী আছে তা তো আল্লাহ জানেনই তাই বলেছেন- 'আপনি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা দূরে রাখতে পারেন এবং যাকে ইচ্ছা কাছে রাখতে পারেন। আপনি যাকে দূরে রেখেছেন, তাকে কামনা করলে তাতে আপনার কোন দোষ নেই। এতে অধিক সম্ভাবনা আছে যে, তাদের চক্ষু শীতল থাকবে; তারা দুঃখ পাবে না এবং আপনি যা দেন, তাতে তারা সকলেই সন্তুষ্ট থাকবে। তোমাদের অন্তরে যা আছে, আল্লাহ জানেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সহনশীল'। (আয়াত ৫১)

- 'আপনি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা দূরে রাখতে পারেন এবং যাকে ইচ্ছা কাছে রাখতে পারেন। আপনি যাকে দূরে রেখেছেন, তাকে কামনা করলে তাতে আপনার কোন দোষ নেই,' এই যদি হয় আল্লাহর আইন তাহলে আপনাদের আর কী বা করার আছে? আপনাদের কোনো চয়েস, সুবিধা অসুবিধা, চাওয়া না চাওয়ার তো দেখি কো্নো মুল্য নাই। আচ্ছা আয়েশা আমরা সুরা আত-তাহরিম আর সুরা আল-আহজাব থেকে আলোচনা করে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানতে পারলাম। এবার আমরা আলোচনা করবো আপনার জন্যে যে সুরাটি নাজিল হয়েছিল অর্থাৎ সুরা আল নূর নিয়ে।

- আমি বলছিলাম না, আপনি একবার ঘুরে ফিরে এই জায়গায় আসবেন?
- আচ্ছা! এই জায়গা কি সেই জায়গা যেখানে জয়নবের বোন হাম্মানার সাক্ষাৎ মিলবে? আয়েশা, আপনি দেখি আমার মাইন্ড রিড করতে জানেন।
- আপনার মাইন্ড রিড করতে সাইকিক হতে হয় না কি?

- আয়েশা, আমরা কোরানের সুরা আত্-তাহরিমে ম্যারিয়া, সুরা আল্-আহজাবে জয়নব আর সুরা আল্-নূরে আপনাকে দেখতে পাই । অথচ আপনাদের কারো নাম কোরানে উল্লেখ নেই। এই যে জগতের কোটি কোটি মুসলমান নিত্যদিন প্রাতঃকালে ঘুম থেকে

জেগে উঠে কোরান পাঠ করেন, নামাজে দাঁড়িয়ে তারা যে তিনটা নারী কেলেংকারী ঘটনা পড়ছেন, তা তারা জানবেন কীভাবে?
- 'নারী কেলেংকারী ঘটনা' কি না তা পাঠকের উপর ছেড়ে দেয়াই ভাল, তবে সংক্ষেপে উত্তরটা হলো কোরান পড়ে জানার কোনো উপায় নেই। আর যারা জানতে চেষ্টা করেছেন বা ঘটনা লিখে রেখেছিলেন তাদের হাজার ধরনের সাক্ষী, মন্তব্য, ধারণা, স্টেইটমেন্ট তাদেরকেই হাজার দলে বিভক্ত করে দিয়েছে।

- আয়েশা, আপনার ব্যক্তিগত কাহিনি শুনার আগে, আমি আমার একটা ব্যক্তিগত ঘটনা আপনাকে বলি- মাদ্রাসায় থাকতে একদিন আমরা এশার নামাজে দাঁড়িয়েছি। নামাজ পড়াচ্ছিলেন হিফজের হুজুর। দ্বিতীয় রাকাতে হুজুর সুরা তাহরিমের সেই আয়াতটি তেলাওত করলেন, 'তোমরা উভয়েই অন্যায় করে ফেলেছো'। আচ্ছা আয়েশা আমি এই বাক্যের শুরুতে যদি আপনার ও হাফসার নাম লাগিয়ে দেই, তাহলে কি অন্যায় হবে? তাত্ত্বিক ভাবে তখন বাক্যটির বাংলা অর্থ দাঁড়ায় এরকম- '(আয়েশা ও হাফসা) তোমরা উভয়েই অন্যায় করে ফেলেছো'। সাধারণত হিফজের হুজুর কখনো আয়াত ভুলেন না, কিন্তু কেন জানি ঐ রাতে (হয়তো অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলেন) আয়াতের বাকি অংশটুকু আর মনে করতে পারছিলেন না। হুজুর তিনবার পড়লেন- 'তোমরা উভয়েই অন্যায় করে ফেলেছো'। চতুর্থবারে পড়লেন- 'তোমরা উভয়েই অন্যায় করে ফেলেছো, আল্লাহু আকবর'। আমরা রুকুতে চলে গেলাম। এই আয়াতে যদি আপনাদের নাম উল্লেখ থাকতো, তাহলে হুজুর তিন বার বলতেন ''আয়েশা ও হাফসা তোমরা উভয়েই অন্যায় করে ফেলেছো'। কেমন লাগতো ব্যাপারটা? আমার তো হাসতে হাসতে মাটিতে পড়ে যাওয়ার অবস্থা।--আয়েশা আপনি হাসছেন! যাক আপনাকে হাসাতে পেরে আমার ভাল লাগছে। আপনি যেমন সুন্দর, আপনার হাসিও তেমন সুন্দর। আপনার কথা বলার ভংগীটাও সুন্দর। বলুন আপনার সম্মানার্থে কোন্ গানটা শুনাবো? চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙ্গেছে–? নাকি, -মেরে ঘর আয়া এক–-পরী?

- বিদায়ক্ষণে বুঝি আপনার মনে পড়লো গান শুনাবার? আমার হাতে সেই সময় যে আর নেই। তবে আমার জানতে ইচ্ছে করে আপনি বাকি দুই রাকাত নামাজ পড়েছিলেন কি না?

- হুম, বুঝেছি। আপনি সব সময় আমার মাইন্ড রিড করতে পারেন না। থাক ওসব, চলুন আমরা আমাদের আলোচ্য বিষয়ে চলে যাই। এতক্ষণ আমরা আপনার কাছ থেকে ম্যারিয়া ও জয়নবের কাহিনি শুনছিলাম, এবার আপনার কাহিনিতে যাওয়ার আগে সুরা নূর নাজিল হওয়ার প্রেক্ষাপট শুনতে চাইবো।

- অসুবিধে নেই। সুরা নূর নাজিল হওয়ার প্রেক্ষাপট জানলেই ঘটনা পরিষ্কার হয়ে যাবে। – তখন ৬ষ্ঠ হিজরির শাবান মাসের কৃষ্ণপক্ষের এক ঘন কালো রাত্রি। বনি মুসতালিক গোত্রকে আক্রমন করা হবে। নবিজি যুদ্ধে যাওয়ার আগে লটারির মাধ্যমে সিলেক্ট করতেন, তার কোন্ স্ত্রীকে সঙ্গে নিবেন। লটারিতে বেশিরভাগ সময়েই আমার নাম উঠতো, এবারেও আমার নামই উঠলো। নবিজি কমান্ডার ইন চিফ, আমি তাঁর সাথে। যুদ্ধের প্রয়োজন হলোনা, অন্ধকার নিশীত রাতের অতর্কিত হামলা প্রতিরোধ করার সুযোগ বনি মুসতালিক গোত্রকে দেয়া হয় নাই। তারা ঘুম থেকে উঠে দেখলো, তাদের ঘর-বাড়ি, জায়গা-জমি সহায়-সম্পত্তি মুসলমানদের দখলে চলে গেছে। বনি মুসতালিক গোত্রের সকল যুবক-শিশু, নারী পুরুষকে বন্দী করে, গনিমতের মালপত্র নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে, মদিনার অদূরে ‘মুরাইসি’ নামক এক জায়গায় আমরা বিরতি নিলাম। এখানে পানি উত্তোলন নিয়ে ওমরের এক ভৃত্যের সাথে মদিনার আনসারি কিছু লোকের ঝগড়া হয়। ঝগড়া এমন পর্যায়ে পৌছিল যে, মদিনার প্রভাবশালী নেতা আব্দুল্লাহ বিন উবেহ বলতে শুরু করলেন- ‘মদিনাবাসী, দেখো শরণার্থীদের আশ্রয় দেয়ার পরিণতি। তোমরা খাল কেটে কুমীর এনেছো, আদর করে অকৃতজ্ঞ জাতীকে মাথায় তুলেছো, তোমাদের সহায় সম্পত্তিতে অংশীদারিত্ব দিয়েছো, এখন তারা তোমাদের উপর কর্তৃত্ব করতে চায়। এবার বাড়ি গিয়ে এই নীচমনাদেরকে তাড়াতে হবে’। আব্দুল্লাহ বিন উবেহ রিতিমত মদিনার স্বাধীনতা ঘোষণা করে দিলেন। নবিজি

কোনরকম বিষয়টা সামাল দিয়ে, সকলকে নিয়ে মদিনার পথে রওয়ানা হয়ে যান। রওয়ানার প্রস্তুতিকালে আমি প্রশ্রাব করার উদ্দেশ্যে তাবুর বাইরে গিয়েছিলাম। ফিরে এসে দেখি আমার গলার হারটি কোথায় পড়ে গেছে। হারের সন্ধানে আমি আবার বেরিয়ে যাই। আমার মালপত্র আমার উটের উপর তোলা হলো কিন্তু কেউ লক্ষ্যই করলেন না যে, আমি উটের উপরে নেই। তারা একসময় আমার খুঁজে এখানে আসবেন এই আশায়, আমি আমার চাদরখানা গায়ে জড়িয়ে বসে থাকি। একসময় ঘুমিয়ে পড়ি। ভোরবেলা সৈনিক সাফওয়ান বিন মো' তাল সোলাইমি এই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমাকে তিনি ঘুমন্ত অবস্থায় চিনতে পারলেন। তিনি এর আগেও আমাকে বহুবার দেখেছেন। চিৎকার করে বললেন- 'আহারে সবাই নবির স্ত্রীকে ফেলে চলে গেল'। তার চিৎকারে আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়। তাড়াতাড়ি ঘোমটা টেনে আমি উঠে বসি। সাফওয়ান আমার সাথে কোনো কথা না বলে তার উটটাকে আমার সামনে নত করে দেন। আমিও তার সাথে কোন কথা না বলে উটের উপর আরোহন করি। প্রায় দুপুর সময় আমরা আমাদের মূল দলকে অতিক্রম করে মদিনায় পৌছে যাই। কেউ ঘুনাক্ষরেও অনুমান করতে পারেন নি, আমি যে এতক্ষণ তাদের সাথে ছিলাম না। শেষে শুনা যায় আমার দেরীতে ফেরা নিয়ে সেদিন দলের মধ্যে তুলকালাম কান্ড হয়েছিল। আব্দুল্লাহ বিন উবেহ নাকি দলের সামনে চিৎকার করে বলেছিলেন- 'দেখো দেখো নবির স্ত্রীর কান্ড দেখো। সারা রাত সাফওয়ানের সাথে কাটিয়ে তারই সাথে ফিরে এসেছে। আল্লাহর কসম এই মহিলা আর সতী হতে পারেনা'। মদিনায় পৌছে আমি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ি। পুরো একমাস বিছানায় পড়ে রইলাম। হঠাৎ আমার মনে হলো নবিজি যেন আগের মতো আমার কাছে আসেন না। আমার রোগ শুনেও ঘরের ভেতরে না ঢুকে মানুষকে আমার অবস্থা জিজ্ঞেস করেন। আমার সাথে কথা বলেন না। আমার মনে সন্দেহ জাগলো বিষয়টা কী? এর পর রুগ্ন শরীর নিয়ে আমি আমার মায়ের কাছে চলে যাই। মায়ের কাছে থাকাকালীন সময়ে একরাতে মিসতাহর মায়ের সাথে প্রকৃতির ডাকে বাইরে গিয়েছিলাম। ফিরে আসার পথে হঠাৎ মিসতাহর মা হোঁচট খেয়ে মাটিতে পড়ে যান

আর উচ্চস্বরে বলে উঠেন- ‘মিসতাহ তোর উপর আল্লাহর গজব বর্ষিত হউক’। আমি বললাম, ‘তুমি এ কেমন মা, নিজের ছেলেকে অভিশাপ দিচ্ছো’? তিনি বললেন ‘ওমা, তুমি কি জানোনা মিসতাহ আরো অন্যান্যদের নিয়ে তোমার উপর কেমন কেলেংকারী রটনা করছে’? শুনে আমার তো আকাশ ভেঙ্গে মাথায় যেন বজ্রপাত হলো। দৌড়ে মায়ের ঘরে গিয়ে সারারাত কাঁদলাম। ভোরে ঘুম উঠে খোঁজ খবর নিয়ে জানতে পারলাম, কেলেংকারী রটনায় প্রধান ভুমিকায় আছেন, নবির এককালের পুত্রবধু আমার সতীন জয়নবের বোন হাম্মানাহ, নবির বিশ্বস্ত বিখ্যাত কবি হাসান বিন তাহবিত, বদর যুদ্ধের বীর সৈ্নিক সাহাবি মিসতাহ, মদিনার প্রতাপশালী নেতা আব্দুল্লাহ বিন উবেহ ও অন্যান্য মুসলমাগণ। আমার অনুপস্থিতিতে আমার স্বামী, হজরত উসমান বিন যায়েদ ও আলীর পরামর্শ নিলেন। উসমান বললেন ‘আয়েশাকে আমরা বিশ্বাস করি, তিনি চরিত্রবান মহিলা বলে আমরা জানি’। আলী পরামর্শ দিলেন ‘আব্বাজান প্রয়োজন হলে আরেকটা বিয়ে করুন, এই মহিলাকে তালাক দিয়ে দিন, সে আপনার জীবন অতিষ্ঠ করে তোলবে’। এর মধ্যে আমার দাসীকেও এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয়। বাধ্য হয়ে আমি নবিজিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম’ ‘আপনি কি আমাকে বিশ্বাস করেন না’? নবি আমার প্রশ্নের সরাসরি উত্তর না দিয়ে বললেন ‘তুমি যদি অন্যায় করে থাকো স্বীকার করে নাও, আর ধৈর্য্য ধরো হয়তো আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করে দিতে পারেন’। এ ব্যাপারে একমাস পর মসজিদের সামনে সকলকে সমেবেত করে নবিজি যে ভাষন দিয়েছিলেন তা'ই সুরা নূর।

- আয়েশা আপনার এই স্টেইটমেন্টের কপি আমার কাছে আছে। প্রায় হুবহু বর্ণনা পাই পাক ভারত উপমহাদেশের বিখ্যাত তাফসিরকারক মৌলানা মওদুদীর তাফহিমুল কোরানে। আমি কিছু কথা যোগ করতে চাই, যা আপনি আপনার স্টেইটমেন্টে উল্লেখ করেন নাই। নবিজি যখন সুরা নূর আবৃত্তি করেন তখন মসজিদের ভিতরেই নবির সামনে মদিনার খাজরাজ ও উসায়েদ নামের দুই দল মুসলমান মানুষের মধ্যে তুমুল হট্টগোল শুরু হয়েছিল। এরই পরিণতিতে সাফওয়ান তার তরবারি দিয়ে কবি হাসানকে

আঘাত করে জখম করেছিলেন আর বলেছিলেন- 'আমার নামে ব্যাঙ্গাত্বক কবিতা লিখার বিনিময়ে আমি কবিতা লিখিনা, তরবারির আঘাত উপহার দেই'। পরবর্তিতে এই কবিকে আপনার স্বামী কোন্ স্বার্থে ম্যারিয়ার বোন শিরীন উপহার দিয়েছিলেন, তা অবশ্য অন্য প্রসঙ্গ, এখানে আলোচনা করার প্রয়োজন নেই। আরো একটা কথা আপনি উল্লেখ করেন নাই, যা হজরত তাবারি সাহেব আপনার দেয়া স্টেইটমেন্টে লিখে রেখেছেন। আপনি নাকি বলেছেন সৈনিক সাফওয়ান, খোজা বা নপুংসক Eunuch. (a castrated male) ছিলেন। নিন্দুকেরা প্রশ্ন করে, সাফওয়ান যে খোজা বা নপুংসক ছিলেন আয়েশা তা বুঝলেন কীভাবে? আর আল্লাহ বিগত এক মাসেরও বেশি সময় করছিলেনটা কী? তিনি কি আয়েশার পরবর্তি মাসের ঋতুস্রাবের অপেক্ষায় ছিলেন? নবিই বা কেন আল্লাহর পরামর্শ না নিয়ে আয়েশার দাসী, আলী, ও উসমান বিন জায়েদের পরামর্শ নিলেন? আপনার নিন্দুকেরা আরো বলে- নবি পরিবারে আপনিই একমাত্র সাহসী মহিলা যিনি নবিকে একদিন বলেছিলেন, 'আপনি নবি না হয়েও নবির ভান করেন'। আপনার পিতার সামনে কোনো এক ঘটনায় আপনি নবিকে বলেছিলেন, 'যাহা বলিবেন সত্য বলিবেন'। আর তা শুনে আবুবকর আপনার গালে স্বজোরে আঘাত করেছিলেন যার ফলে আপনার মুখ থেকে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছিল। নবিজি যখন ম্যারিয়ার গর্ভের সন্তান ইব্রাহিমকে কোলে নিয়ে আপনার কাছে এসে বলেছিলেন, 'দেখো আয়েশা ছেলেটার চেহারা ঠিক যেন আমারই চেহারা'। আপনি বলেছিলেন, 'ছেলের মাঝে আপনার চেহারার আমি কিছুই দেখিনা'। নবিজি বলেছিলেন, 'দেখো বাচ্চাটার কি সুন্দর দুটো গাল, কেমন গোলগাল'। আপনি বলেছিলেন 'পৃথিবীর সকল শিশুরই এই বয়সে এরকম (Chubby) গাল হয়'। সে যাক, নিন্দুকের মুখে ছাই পড়ুক, চলুন আমরা দেখি সংশ্লিষ্ট ঘটনার ব্যাপারে সুরা নূরে কী বলা হয়েছে।

- সময় স্বল্পতার কারণে আমি উল্লেখিত আয়াতগুলো শুধু পড়ে শুনাবো, কোনো প্রকার ব্যাখ্যা তাফসিরের সময় বোধ হয় আর নেই। দেখুন সুরা নূর (আয়াত ১১)- যারা মিথ্যা অপবাদ রটনা করেছে, তারা তোমাদেরই একটি দল। তোমরা একে নিজেদের জন্যে

খারাপ মনে করো না; বরং এটা তোমাদের জন্যে মঙ্গলজনক। তাদের প্রত্যেকের জন্যে ততটুকু আছে যতটুকু সে গোনাহ করেছে এবং তাদের মধ্যে যে এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে, তার জন্যে রয়েছে বিরাট শাস্তি। (আয়াত ১২)- তোমরা যখন একথা শুনলে, তখন ঈমানদার পুরুষ ও নারীগণ কেন নিজেদের লোক সম্পর্কে উত্তম ধারণা করনি এবং বলনি যে, এটা তো নির্জলা অপবাদ? (আয়াত ১৩)- তারা কেন এ ব্যাপারে চার জন সাক্ষী উপস্থিত করেনি; অতঃপর যখন তারা সাক্ষী উপস্থিত করেনি, তখন তারাই আল্লাহর কাছে মিথ্যাবাদী। (আয়াত ১৪)- যদি ইহকালে ও পরকালে তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকত, তবে তোমরা যা চর্চা করছিলে, তজ্জন্যে তোমাদেরকে গুরুতর আযাব স্পর্শ করত। (আয়াত ১৫)- যখন তোমরা একে মুখে মুখে ছড়াচ্ছিলে এবং মুখে এমন বিষয় উচ্চারণ করছিলে, যার কোন জ্ঞান তোমাদের ছিল না। তোমরা একে তুচ্ছ মনে করছিলে, অথচ এটা আল্লাহর কাছে গুরুতর ব্যাপার ছিল। (আয়াত ২৩)- যারা সতী-সাধ্বী, নিরীহ ঈমানদার নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারা ইহকালে ও পরকালে ধিকৃত এবং তাদের জন্যে রয়েছে গুরুতর শাস্তি।

- ঠিক আছে আয়েশা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের দরকার নেই, তবে আমি দৃঢ়কণ্ঠেই বলবো, উল্লেখিত আয়াত বা বাক্য গুলো কোনোভাবেই আল্লাহর নয়। আয়েশা, বিদায়বেলা আমাদের জন্যে, জগতের মুসলিম নারী সমাজের প্রতি আপনার পরামর্শ, আপনার উপদেশ কামনা করছি।

- সম্পূর্ণ সাক্ষাৎকারে আমরা যা কিছু আলোচনা করেছি তা, আমাদের সময়ের অর্থাৎ ১৪ শত বছর পূর্বের সমাজ বাস্তবতা দিয়ে বিচার করতে হবে। রাস্ট্র থেকে ধর্মকে আলাদা করে রাখুন। রাস্ট্র হচ্ছে সকল ধর্মের মানুষের, রাস্ট্রের নিজস্ব কোনো ধর্ম থাকতে পারেনা। মানুষকে তার ধর্ম পালন করতে দিন, সে যেভাবে চায় সেই ভাবে। নারীকে তার সকল প্রকার বৈষয়িক, নাগরিক, মানবিক সমান অধিকার দিয়ে দিন, এতে দেশ ও জাতির মঙ্গল নিহিত।

- আয়েশা আমাদের সাথে এতক্ষণ সময় দেয়ার জন্যে, আপনাকে আমার ও সকল পাঠকবৃন্দের পক্ষ থেকে অশেষ ধন্যবাদ।

তথ্য সুত্র-

Tabaqat v. 8 p. 223 Ibn Sa'd Publisher Entesharat-e Farhang va Andisheh Tehran 1382 solar h (2003) Translator Dr. Mohammad Mahdavi Damghani]
Tabaqat Volume 1 page 368
The History of Al-Tabari: The Victory of Islam, translated by Michael Fishbein [State University of New York Press, Albany, 1997], Volume VIII, pp. 2-3
History of al-Tabari, English version, v15, p235
History of al-Tabari, English version, v15, pp 238-239
The History of Al-Tabari: The Last years of the prophet, translated and annotated by Ismail K. Poonawala [State University of New York Press, Albany, 1990], Volume IX p.147
- History of Ibn Athir, v3, p206
– Lisan al-Arab, v14, p141
– al-Iqd al-Farid, v4, p290
– Sharh Ibn Abi al-Hadid, v16, pp 220-223
Ihya Ulum-id-din by Imam Ghazzali, Volume 2 page 36, Chapter
"The secrets of marriage" – English translation by Maulana Fazlul Karim

Sahih Bukhari Volume 1, Book 6, Number 299
Understanding Muhammad. – Ali Sina
তাফহিমুল কোরান -মৌলানা মউদুদী

পাঠকের মন্তব্য

সম্ভবত বাংলা ব্লগ জগতে এই প্রথম কোন ব্লগারের আত্মজীবনীমূলক বই এটি। যদিও এটিকে পুরোপুরি আত্মজীবনী বলা যাবে না। **আকাশ মালিক** এই বইতে তাঁর ছেলেবেলা থেকে পূর্ণ বয়সে তার অবিশ্বাসী হওয়ার কাহিনি বলেছেন। আবার একই সঙ্গে ব্যক্তি জীবনের নানা সময়ে দেশ, আদর্শ, আশাবাদ, আশাভঙ্গের অভিজ্ঞতা শেয়ার করেছেন। সঙ্গে কিছু ফিকশনও স্থান পেয়েছে। লেখকের ছেলেবেলা পড়তে পড়তে শরৎচন্দ্রের কখনো 'লালু' আবার কখনো শ্রীকান্তের ইন্দ্রের কথা মনে পড়ে যায়। কি দুর্দান্ত শৈশব! ...আবার ম্যারিয়া নামী এক বিদেশিনীর সংক্ষিপ্ত উপস্থিতি তবু তার অকালপ্রয়াণ আমাদের মন খারাপ করিয়ে দেয়। **আকাশ মালিক** মাদ্রাসায় পড়েছেন ছোটবেলায়। সেই সূত্রে বেরিয়ে এসেছে মাদ্রাসার শিক্ষাক্রম ও মধ্যযুগীয় শিক্ষা ব্যবস্থার নিষ্ঠুরতা। এসেছে বাংলাদেশের রাজনীতি, ধর্মের বেসাতি, ব্লগার কিলিংসহ তাঁর মনের অনেকটা অংশ জুড়ে থাকা প্রিয় মুক্তমনা ব্লগ প্রসঙ্গ…।

লেখকের সঙ্গে একমত না হাওয়া পাঠকও শেষ পর্যন্ত পড়া ছেড়ে উঠতে পারেন না কারণ অসম্ভব আকর্ষণীয় একটা ভাষায় তিনি লিখেন যা তার একান্তই নিজস্ব। ধর্মীয় চরিত্র নিয়ে বিশেষত ইসলাম ধর্মের কোন নবি পত্মীকে নিয়ে গল্প রচনা সম্ভবত এটাই প্রথম। 'হযরত আয়েশার (রা:) সাথে এক রজনী' তেমনি একটি অসাধারণ সাহিত্য সমৃদ্ধ রচনা। মন্ত্রমুগ্ধের মত পাঠক ভ্রমণ করবেন ইসলামের সবচেয়ে আলোচিত চরিত্র হজরত আয়েশা'র সঙ্গে পুরো একটি রাত! ইতিহাসের কচকচানি নয়, হাদিস আর তাফিসিরের একঘেয়ে বর্ণনার বদলে আয়েশা আপনাকে শুনাবেন হাজার বছর আগের তার ঘরকন্নার গল্প। পুরো বইটিতে অজানা এমনি অনেক তথ্য ও ঘটনা পাঠক পাঠ করবেন কোনো রকম রেফারেন্সের রসকষহীন ভাষার বদলে আকাশ মালিকের জাদুকরী ভাষার ছন্দে। **আকাশ মালিক** *'যে সত্য বলা হয়নি'* নামের একটি বই লিখেছেন

আগেই। যে বইটি বাংলা ভাষায় ধর্মীয় বইয়ের ইতিহাসে অন্যতম একটি সংযোজন। নিঃসন্দেহে *'আমার না বলা কিছু কথা'* তেমনই এক সংযোগ হলো বলে আমার বিশ্বাস।

সুষুপ্ত পাঠক

অনলাইন লেখক ও ব্লগার।

আকাশ মালিক-এর আত্মজৈবনিক বই *'আমার না বলা কিছু কথা'।* লেখার ভাষা খুবই সাবলিল, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বইটি পড়া হয় ঢাকা-চট্টগ্রাম ট্রেন জার্নির সময়। সত্যি বলতে হারিয়ে গিয়েছিলাম তাঁর লেখায়। পড়তে যেয়ে বারবার নিজের অজান্তেই **আকাশ মালিক**-এর চোখে তার জীবনের বাস্তবতা দেখেছি, তার জায়গায় নিজেকে বসিয়েছি। আমার বিশ্বাস বইটি পড়তে যেয়ে পাঠকেরও একই উপলব্ধি হবে, পাঠক হারিয়ে যাবেন লেখকের যাপিত জীবনের সুরে। জীবনের বাঁকে বাঁকে ধর্ম, মহাজাগতিক চিন্তার যে চিরায়িত প্রশ্ন মানুষের মনে জাগে, সেসবের উপলব্ধি তিনি তাঁর যাপিত জীবনের বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। তিনি সত্যের সন্ধান পেয়েছিলেন, বুঝতে পেরেছিলেন ইশ্বর-ধর্ম সবই কাল্পনিক বিষয়; সমাজে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে, নিজের মত করে সমাজ সাজাতে একশ্রেণীর মানুষ হাজার বছর ধরে এসব কল্পকথাকে পুঁজি করেছে, এখনো করে যাচ্ছে। আমার কাছে বইটি মনে হয়েছে একটি ভ্রমণের মত, একজন মানুষের জীবন ভ্রমণ, যিনি মাধুকরী হয়ে জীবনের নানান দ্বারে ঘুরে বেড়িয়েছেন, আবিষ্কার করেছেন আত্মজকে, উপলব্ধি করেছেন জীবনের চিরায়িত সত্যকে।

সাব্বির হোসাইন

পরিচালক,

মুক্তিযুদ্ধ ই-আর্কাইভ ট্রাস্ট।



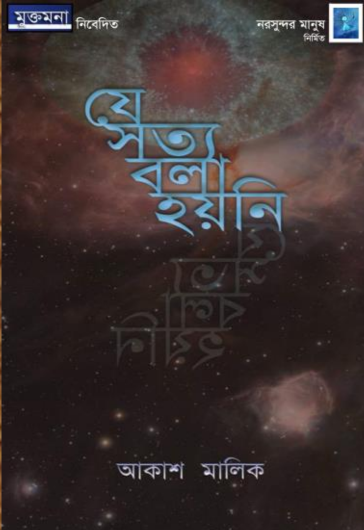
সম্ভবত বাংলা ব্লগ জগতে এই প্রথম কোন ব্লগারের আত্মজীবনীমূলক বই এটি। যদিও এটিকে পুরোপুরি আত্মজীবনী বলা যাবে না। **আকাশ মালিক** এই বইতে ছেলেবেলা থেকে পূর্ণ বয়সে তার অবিশ্বাসী হওয়ার কাহিনি বলেছেন। আবার একই সঙ্গে ব্যক্তি জীবনের নানা সময়ে দেশ, আদর্শ, আশাবাদ, আশাভঙ্গের অভিজ্ঞতা শেয়ার করেছেন।

সুষুপ্ত পাঠক
অনলাইন লেখক ও ব্লগার

জীবনের বাঁকে বাঁকে ধর্ম, মহাজাগতিক চিন্তার যে চিরায়িত প্রশ্ন মানুষের মনে জাগে, সেসবের উপলব্ধি **আকাশ মালিক** তাঁর যাপিত জীবনের বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন।

সাব্বির হোসাইন
পরিচালক,
মুক্তিযুদ্ধ ই-আর্কাইভ ট্রাস্ট।

www.istishon.com



'যে সত্য বলা হয়নি' **সংগ্রহ করুন আজই**